রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মার্চ ২০২০

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ
বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১
[মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত]

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব:
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ অলংকরণ ও শব্দ বিন্যাস
ড. শামসুল আলম
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

গ্রন্থ স্বত্ব © সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০২০

এই সংস্করণের নোট
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক **"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১"** দলিলটি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ অনুমোদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের www.plancomm.gov.bd শীর্ষক ওয়েবসাইটে এই দলিলটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

মুদ্রাকরঃ
টার্টল
০১৯২৫-৮৬৫৩৬৪
৬৭/ডি, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ একদিন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ২০১৯ সালে চতুর্থবারের মত সরকার গঠনের সময় দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করতে চাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ আর মিথ নয়। এ স্বপ্ন পূরণের 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে আমরা ২০ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর জন্মশত বর্ষে দেশবাসীকে 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' উপহার দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

দেশ যখন অনুন্নয়ন আর অপরাজনীতির অধ:পতনে, তখন ২০০৯ সালে আমরা দিনবদলের সনদ গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনা, দারিদ্র্য মোকাবেলা, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে আসীন করা। আওয়ামী লীগের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' প্রণয়ন করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন অগ্রাধিকার চিহ্নিত করেছিলাম। ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার হতে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সকল মানদন্ড পূরণ করতে পেরেছে, ২০১৫ সালের এমডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনসহ নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে এবং দশকব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হয়েছে।

'রূপকল্প ২০২১' এর সাফল্যের ধারাবহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর স্বপ্নের উন্নয়নের পথে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা চাই ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের সোপানে উত্তরণ, এদেশ হতে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে। বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে আমরা প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেব, আমার গ্রাম প্রকৃতই হবে আমার শহর।

'রূপকল্প ২০৪১' কে নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ একটি উন্নয়ন কৌশলে রূপান্তরের জন্য এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ দলিল মূলত ২০৪১ সালের মধ্যে এক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ অর্জনে সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের একটি কৌশলগত বিবৃতি এবং তা বাস্তবায়নের পথ-নকশা। চারটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, যেমন- সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এ পরিকল্পনার সুফলভোগী হবে জনগণ এবং এরাই হবে প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি।

'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' প্রণয়নে সময়ানুগ আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার ও সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। সমৃদ্ধশালী এক বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার পথে আমাদের সহযাত্রী হতে সকলের নিকট উদাত্ত আহবান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

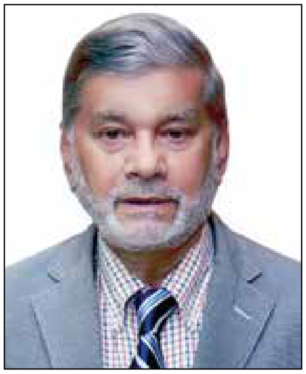

এম.এ. মান্নান, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিলটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত।

বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়নের দশ বছর অতিবাহিত হতে চললো। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবো এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর রূপান্তর ঘটাবো। আমরা এমন সময়ে এই দলিলটি প্রণয়ন করেছি যখন সমগ্র দেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতি আজ তার সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথের সন্ধান পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ আগামী ২০ বছরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্য আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের সারিতে উন্নীত হবে। আমি স্বীকার করি যে আমাদের সামনে চলার পথ মসৃণ নয়, তবে আমরা যদি মুক্তি সংগ্রামের চেতনা নিয়ে একত্রে কাজ করি তাহলে সে লক্ষ্য অর্জন অসাধ্য হবে না।

গত দশকে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই। বিশ্ব এখন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু দেশ আমাদের চেয়ে ভালো করছে। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানের বিকল্প নেই। গত এক দশকে আমাদের সরকার সরকারি সেবা প্রদানের প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি খাতে সেবা প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

বৈশ্বিক এজেন্ডা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য আমাদের বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে । আগামী দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সক্ষম হব বলে আশা করি। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিনিময়, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও সহযোগিতা ছাড়া আমাদের একার পক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবে।

এই দলিলের খসড়া প্রস্তুত ও চূড়ান্তকরণের জন্য আমি সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। এই দলিল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও অনুপ্রেরণা যোগানের পাশাপাশি রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এম.এ. মান্নান, এমপি

ড. শামসুল আলম
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাক কথা

"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রুপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" শীর্ষক দলিলটি প্রকাশিত হচ্ছে এর জন্য আমি খুবই আনন্দিত। আগামী দুই দশকে বাংলাদেশের যে রূপান্তর হবে তা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় তুলে ধরা ইতিহাসের একটা অংশ বটে। তাতে সামিল হতে পেরে আমি আপ্লুত।

এগার বছর আগে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য হিসেবে আমি যোগদান করি। সে সময়ে আমার দায়িত্ব ছিলো রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে "বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনাঃ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ণ" প্রণয়ন করা। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ছিলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটানো। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে রূপান্তরের জন্য ১৪ টি অভীষ্ট ছিলো। দশ বছর পর সেগুলোর অধিকাংশ অর্জিত হয়েছে বা লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে গত এগার বছরের যাত্রায় সরকার আমার উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে, সেজন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যমান মনে করি। অতীতের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় গত এক দশকে আমার নেতৃত্বে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ তথা পরিকল্পনা কমিশন ভিন্ন আঙ্গিকে মনে হয় কিছুটা তার পুরনো রূপে ফিরতে পেরেছে। স্বাধীনতা লাভের পর গঠিত পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজ ছিলো বাংলাদেশ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া। পুনর্গঠনের সময় থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে রূপান্তরের যুগে প্রবেশ করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটও সেভাবে বদল হয়েছে। আমরা নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করেছি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৪ সালে তা কার্যকর হবে। আমরা এমডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছি। এই মুহূর্তে এসডিজি'র সময়ে আমাদের দরকার ত্বরিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বমূলক সমৃদ্ধির জন্য টেকসই রূপান্তর।

"রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১" হলো বিশ্ব ব্যাংকের মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকারের স্থিরলক্ষ্য অভীষ্ট। অন্য অভীষ্টের মধ্যে রয়েছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নিরসন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শূন্য দারিদ্র্যে নামিয়ে আনা। এই পরিকল্পনার কৌশলগত অভীষ্ট ও মাইলফলকগুলো হলো- রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং কাঠামোগত রূপান্তর, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষি খাতে মৌলিক পরিবর্তন, ভবিষ্যতের সেবা খাত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে প্রাথমিকভাবে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সেতুবন্ধন রচনা, একটি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা কৌশলের অপরিহার্য অংশ হবে নগরের বিস্তার, যা "আমার গ্রাম, আমার শহর" প্রত্যয় দ্বারা অনুপ্রাণিত, একটি অনুকূল পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হবে দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, যা দ্রুত, দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে; জলবায়ু পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ; একটি দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশকে জ্ঞানভান্ডার দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। গত অক্টোবর ২০১৫ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়নের কাজ শুরুর বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত পরিকল্পনা দলিলের জন্য দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ ও গবেষকদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠিত হয়। একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এই দলিলটি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে দলিলের উপর মতামত চাওয়া হয়। এ দূরদর্শী পরিকল্পনা দলিলটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উপর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদের সাথে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একটি বর্ধিত পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতসমূহ খসড়া পরিকল্পনা দলিলে যৌক্তিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, দলিলটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার এটি একটি ভিশন দলিল, এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে সবকিছু আশা করা ঠিক হবে না। এটি একটি দিকনির্দেশনামূলক দলিল এবং এর উপর ভিত্তি করে চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সেখানে বিস্তারিতভাবে কৌশলসমুহের উল্লেখ থাকবে। দুটি কারণে দলিলটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রথমত: যদি বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের শর্ত পূরণ করে তবে ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিক উত্তরণ সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত: ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন। এ প্রসঙ্গে আরো বলতে চাই যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) তৈরিতে সহয়তা করার জন্য আমাদের স্বপ্ন পূরণের এই দলিল (২০২১-২০৪১) নির্ধারিত সময়ের এক বছর পূর্বে প্রণয়ন করতে হয়েছে। কারণ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িতব্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে এটাই হবে প্রথম। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদে অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

এই ভিশন দলিলটির ১২ টি অধ্যায় রয়েছে-যার মধ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো: সুশাসন, মানব উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ। এর মধ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো আছে যাতে প্রতি অর্থ বছরে অর্থনীতির সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা বিস্তারিতভাবে দেয়া আছে। আমি আশা রাখবো এই দলিলের আলোকে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

পরিশেষে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই আগামী প্রজন্মের জন্য আমাকে এই ঐতিহাসিক কাজের সুযোগ দেয়ার জন্য। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলো বিশেষভাবে সামষ্টিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়কে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। আমি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাছে কৃতজ্ঞ তাদের মতামত ও সহযোগিতার জন্য।

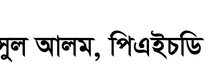

শামসুল আলম, পিএইচডি
মার্চ ২০২০, ঢাকা।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

রূপকল্প ২০৪১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার হতে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল মানদন্ড পূরণ করতে পেরেছে। ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণীভুক্ত হয়েছে এবং দশক ব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হয়েছে। সাফল্যের এই ধারায় উজ্জীবিত হয়ে বর্তমান সরকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। স্বপ্নের সেই দেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত সাম্য ও ন্যায়ের সমৃদ্ধ এক দেশ, যেখানে উন্নয়নের অংশীদার হবে সকলে। মূলতঃ রূপকল্প ২০২১- এর সাফল্যের ধারাবহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে স্বপ্নের উন্নয়ন পথে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই সরকার "রূপকল্প ২০৪১" গ্রহণ করেছে। এই রূপকল্পের প্রধান অভীষ্ট হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। রূপকল্প ২০৪১ কে একটি উন্নয়ন কৌশলে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ এই দলিলটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'। বস্তুত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সাফল্যের ওপর গড়ে উঠেছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম ও উচ্চ-আয়ের দেশ যে-উন্নয়ন পথ পাড়ি দিয়েছে, তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে চায় বাংলাদেশ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মূল উপাদানসমূহ

পরবর্তী দু'দশকে বাংলাদেশ দ্রুত গতির রূপান্তরধর্মী এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। এই পরিবর্তন আসবে কৃষিতে, শিল্প ও বাণিজ্যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায়, পরিবহন ও যোগাযোগে, কর্মপদ্ধতি আর ব্যবসা পরিচালনায়। বাস্তবধর্মী এসব পরিবর্তনের সাথে আমাদের মানিয়ে চলতে হবে। ভারসাম্যমূলক দ্রুতগতির এ প্রবৃদ্ধির সুফল পাবে সকলে, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠী। এই সুফল যথাযথভাবে বন্টনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে । এই সকল লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ঠভাবে কাজ করার পাশাপাশি প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন- ভূমি, পানি, বন, প্রাকৃতিক আবাস ও বায়ু ব্যবহারের সময় এগুলোর নির্বিচার ধ্বংসসাধন ও অবক্ষয় যেন এড়ানো যায় সরকার তা নিশ্চিত করবে ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট: (ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, (খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী জ্ঞান, অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে এমন একটি দ্রুতগতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব। নিচের সারণিতে সংক্ষেপে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হলো।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য অভীষ্ট

নির্দেশক	ভিত্তি বছর ২০২০	অভীষ্ট ২০৩১	অভীষ্ট ২০৪১
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৮.২	৯.০	৯.৯
দারিদ্র্য সূচক			
চরম দারিদ্র্য (%)	৯.৪	২.৩	<১.০
দারিদ্র্য (%)	১৮.৮	৭.০	<৩.০

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো ব্যাপক, ঝুঁকিও প্রচুর। কোন দীর্ঘ অভিযাত্রার মতো এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কিছু উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের পথ-নকশা হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। এখন প্রয়োজন এই পথ-নকশা বাস্তবায়নে সকল বাধাবিঘ্ন মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে অবিচলভাবে এগিয়ে চলা। এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির সুফল জনগণের মাঝে যথাযথভাবে বন্টনের জন্য দরকার পরস্পর নির্ভরশীল নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন খাতের কর্মসূচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। সুতরাং, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিষয় ও খাতভিত্তিক কৌশলগুলো বলিষ্ঠ ও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধশালী, উন্নত এবং দারিদ্র্যশূন্য দেশে রূপান্তরের নিমিত্ত প্রধান কাজ হবে সরকারের নেতৃত্বে নীতি প্রণেতা, বেসরকারি খাত, বিদ্যুৎ সমাজ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অভিযোজনক্ষম একটি জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে সমগ্র-সমাজভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অভিযোজনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলা।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস এর মতো চূড়ান্ত ফলাফল অর্জনের মূলে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এর জন্য প্রয়োজন পরিবহন, বাণিজ্য ও জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এছড়াও, ফলপ্রসূ কর ব্যবস্থা ও সরকারি ব্যয় নীতি এবং সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমে এসব খাতে বর্ধিত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কৃষি থেকে শিল্পে অভিযাত্রা এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন যখন বাকঘুরাণো লগ্নে উপনীত হয় এবং শ্রম বাজার সংকুচিত হয়ে আসে, তখন বিশ্বায়নের ডিজিটাল যুগে কর্মসৃজনশীল রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের প্রয়োজন হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন হবে একবিংশ শতাব্দীতে পণ্য ও সেবার আন্তঃসীমান্ত আদান-প্রদানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাণিজ্য ও শিল্প নীতিমালা। কৃষি খাত অবদানের দিক থেকে হ্রাসমান হলেও, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিধানের জন্য আগামী দিনগুলোতেও কেন্দ্রীয় খাত হয়ে থাকবে। সুতরাং, উচ্চ উৎপাদনশীল আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজন হবে আন্তঃখাত নীতিমালা সংস্কার। আধুনিক কৃষি হবে বহুমুখী এবং দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু সহিষ্ণু। আগামী দু'দশকের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে উদ্ভাবনমুখী জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্ত মানব পুঁজিতে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ হলো আন্তঃখাত ও বহুমাত্রিক নীতিমালা এবং কর্মকৌশলের সমন্বয়ে প্রণীত একটি ২০ বছর মেয়াদি পথ-নকশা, যা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি থেকে এটি স্পষ্ট যে, সমাজের দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সর্বদাই শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। সুতরাং, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের ওপর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ জোর দেয়া হয়েছে। বাজার ব্যবস্থা সচল রাখার পিছনে সক্রিয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এখন নীতিপ্রণেতাগণ গভীরভাবে অনুধাবন করেন। ইতিহাস ও গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, কেননা এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই সমাজের মূল অর্থনৈতিক কুশীলবেরা প্রয়োজনীয় প্রণোদনা পেয়ে থাকেন। বিশেষ করে, এরাই প্রাকৃতিক ও মানব পুঁজিতে বিনিয়োগ প্রভাবিত করে, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির অগ্রগতি লালন করে, উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত প্রদান করে। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সুফলভোগী হবে জনগণ এবং এরাই হবে প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি। এ পরিকল্পনা চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো হচ্ছে: (১) সুশাসন; (২) গণতন্ত্রায়ণ; (৩) বিকেন্দ্রীকরণ এবং (৪) সক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্তুত: এই চারটি ভিত্তির ওপর নির্ভর করবে উন্নত জাতি হিসেবে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মূল লক্ষ্য অংশগ্রহণমূলক সমৃদ্ধি, যা শাসন ব্যবস্থার কার্যকর প্রতিষ্ঠান, যেমন বিচার ব্যবস্থা, গণমুখী জনপ্রশাসন, দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হবে। রূপকল্প ২০৪১ এর দ্বিতীয় স্তম্ভ গণতন্ত্রায়ণ। বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন পুরোপুরি বহুত্ববাদী গণতন্ত্র যেখানে সকল নীতি ও কৌশলে প্রতিফলিত হবে গুরুত্বপূর্ণ সব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। বিকেন্দ্রীকরণ হলো এর তৃতীয় স্তম্ভ। তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনিক, আর্থিক (রাজস্বসহ) ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করা দুরূহ হবে। বিকেন্দ্রীভূত সরকার ও প্রশাসনের শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলো

শক্তিশালী করতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ হলো চতুর্থ স্তম্ভ। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো রূপান্তরশীল অর্থনীতির সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গতি বিধান এবং এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কৌশলগত সম্পর্ক, সম্পদ উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন পদ্ধতি।

ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এমন সময়ে প্রণীত হয়েছে যখন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য গৃহীত শক্তিশালী জাতীয় নীতিমালার কারণে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। এই প্রবৃদ্ধির মূল নিহিত রয়েছে দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়, যার প্রতিফলন ঘটে নিম্ন মূল্যস্ফীতি, নিম্ন রাজস্ব ঘাটতি, স্বস্তিদায়ক লেনদেনের ভারসাম্য এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সরকারি ঋণের নিম্ন দায়ে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এই সুষ্ঠু ধারা বজায় রাখা হবে।

আর্থিক পরিচালন কৌশল: বাংলাদেশের দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম অর্জন হলো বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ও বৈদেশিক উৎস হতে লভ্য সম্পদ ও দেশীয় উৎস হতে কম ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পাওয়া মোট সম্পদের পরিসীমার মধ্যে সরকারি ব্যয় সীমিত রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়। ফলে, বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫% এর মধ্যেই সীমিত থাকে এবং সরকারের ঋণের দায় গ্রহণযোগ্য মাত্রায় থাকে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নকালে এই দূরদর্শী আর্থিক নীতির দৃষ্টান্ত বজায় রাখা হবে। তবে সরকারের জন্য একটি কঠিন আর্থিক চ্যালেঞ্জ হলো জিডিপির তুলনায় করের নিম্ন অনুপাত। এটি জিডিপির প্রায় ৯%, যা বিশ্বে নিম্নতম রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে রাজস্বনীতি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ হবে কর-জিডিপির অনুপাত জিডিপির ২০% এ উন্নীত করা। অবকাঠামো ও অন্যান্য সরকারি সেবায় বিনিয়োগের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের কৌশল অবলম্বনসহ বাণিজ্য করের ওপর একান্ত নির্ভরতার কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তন করে প্রত্যক্ষ কর (আয়কর ও কর্পোরেট কর) এবং মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)-এর ওপর জোর দিতে হবে। অন্য যে বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে তন্মধ্যে রয়েছে, সরকারি ব্যয় আরো দরিদ্রমুখী, লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও পরিবেশ-বান্ধব করা; সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা ও গুণগত মান আরো উন্নত করা; এবং সরকারি ব্যয়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রবৃদ্ধি লালনে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশ সাধারণভাবে যুক্তিগ্রাহ্য মাত্রায় মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সফলকাম হয়েছে। যদিও এটি কাম্য মাত্রার চেয়ে এখনো সামান্য বেশি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি সরাসরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানে। তাই ভবিষ্যতের লক্ষ্য হবে মূল্যস্ফীতির কাঙ্ক্ষিত হার বছরে প্রায় ৪-৫ শতাংশে আটকে রাখা। সুসমন্বিত মুদ্রা ও আর্থিক নীতিমালা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্ব প্রদানসহ সরবরাহ বৃদ্ধিতে জোর দেয়া, অবকাঠামোতে সরকারি খাতের বর্ধিত ভূমিকা এবং বাংলাদেশে বিনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিতে শক্তিশালী প্রতিযোগিতার নীতিমালা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হবে।

টেকসই লেনদেনের ভারসাম্য: রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বলিষ্ঠ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উদ্দিষ্ট। পরিকল্পনা মেয়াদের বেশিরভাগ সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে, যদিও রপ্তানি বহুমুখীকরণ কৌশল বাস্তবায়নের শুরু থেকেই নতুন ধরনের বহুমুখী রপ্তানি পণ্যের আবির্ভাব ঘটবে। ঘরে ব্যবহার্য বস্ত্র, পাট ও পাটজাত পণ্য, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য পরবর্তী প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে বেরিয়ে আসতে পারে। এর পরের ধাপে সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, হালকা প্রকৌশল ও ইলেকট্রনিক পণ্য। ভবিষ্যতে রপ্তানি কৌশল হবে দ্বিমুখী: (ক) তৈরি পোশাকের মতোই তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানি পণ্যে একই সুবিধা (শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি) প্রদান করার নীতি গ্রহণ; এবং (খ) সরকারি নীতিতে রপ্তানিবিরোধী প্রবণতা পরিহার করার লক্ষ্যে শুল্ক ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত করা। প্রবাসী-আয় বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ১০% বজায় থাকলে চলতি হিসাবের ভারসাম্য স্বস্তিদায়ক হবে। ফলে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় আমদানিতে সক্ষম হবে।

মূলধনী হিসাবের ক্ষেত্রে অবকাঠামো ও ম্যানুফ্যাকচারিং বিনিয়োগে অর্থায়নের জন্য অধিক প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে 'ব্যবসায় সহজীকরণ' সুবিধাদি বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে। এটি প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজতর করবে। অতীতের

মতো বিদেশি ঋণ গ্রহণে সতর্ক কৌশল অনুসরণ করা হবে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ পরবর্তী দুই দশকে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের খতিয়ানে বিশেষ রেয়াতযুক্ত বহুপাক্ষিক ঋণের অংশ কমতে শুরু করবে এবং রেয়াতবিহীন ঋণের অংশ বাড়তে শুরু করবে। বেসরকারি খাত বিদেশের পুঁজিবাজার থেকে যখন ঋণ সংগ্রহ করে, তখন প্রত্যাশিতভাবেই সার্বিক ঋণভার ও ঋণের ব্যবহার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। তবে, অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির উচ্চতর মাত্রায় উপনীত হলে তা কিছুটা উচ্চতর সুদ ব্যয়ের সাথে উচ্চতর ঋণভার মোটামুটিভাবে বহন করতে সক্ষম হবে।

বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা: সরকার একটি নমনীয় বাজারভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করে থাকে, যা রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান ছাড়াও বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক এবং একই সঙ্গে বিগত জুন ২০১৯ পযর্ন্ত ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তুলতে অবদান রেখেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নকালে এই নীতি বজায় রাখা হবে। বিনিময় হার নীতির মূল উদ্দেশ্য হবে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার না বাড়িয়ে রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখা। বৈদেশিক খাতের স্বস্তিদায়ক অবস্থা পর্যায়ক্রমে চলতি এবং মূলধনী হিসাবের কিছু প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থায় এ ধরনের পর্যায়ক্রমিক উদারীকরণের ফলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে, যা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা এফডিআই প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রবৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়-বিনিয়োগ সংযোগ: অতীতের মতোই উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হবে বিনিয়োগ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদকালে গড় বিনিয়োগ জিডিপির ৪০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তবে এর জন্য উৎপাদনের ভিত্তি এবং সহায়ক ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে উচ্চতর হারে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে প্রক্ষেপিত বিনিয়োগের উর্ধ্বগতিতে বর্ধিত হারে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, প্রবাসী-আয় প্রবাহ ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। বৈদেশিক ঋণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে বড় বড় অবকাঠামোর অর্থায়নে।

দারিদ্র্যশূন্য দেশ

দারিদ্র্যশূন্য দেশ গড়তে প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সাথে সঙ্গতি রেখে দারিদ্র্য নিরসনের অভীষ্ট হল: ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে (৩% বা এর নিচে) নিয়ে আসা। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা হবে। কর্মসন্ধানী নাগরিকদের কাজ থেকে আয়ের ব্যবস্থা এবং বয়স ও দৈহিক কারণে কর্মক্ষম নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রদান করা হবে। বেকারত্ব অতীতের বিষয় বলে গণ্য হবে। অন্যান্য উচ্চ আয়ের অর্থনীতির মতো দারিদ্র্য হয়ে পড়বে একটি আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। এ রকম পরিস্থিতিতে যারা দরিদ্র বিবেচিত হবে তাদেরও অন্তত খাদ্য চাহিদা মেটানোর পর জীবনধারণের ন্যূনতম সামগ্রী কেনার মতো পর্যাপ্ত আয় থাকবে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ আয় বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য একটি সংযত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি পরিমাপের জন্য পালমা রেশিও বা অনুপাত ব্যবহৃত হবে। বৈষম্য পরিমাপের সূচক হিসেবে এটি সনাতনী 'গিনি সহগে'র তুলনায় উন্নততর। নীতির প্রশ্নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা প্রয়োজন হবে। প্রথমত, জিডিপি ও কর্মসংস্থানে কৃষি খাতের অবদান সংকুচিত হয়ে এলেও দারিদ্র্য নিরসনে আগামী দিনগুলোতেও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়ত, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত (কৃষিভিত্তিক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বা এসএমইস) হতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ আসা প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশের জন্য শ্রমঘন রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়ত, এসএমই থেকে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া গেলেও এই খাতে গতিশীলতার অভাব রয়েছে। তাছাড়া এই খাত নিম্ন উৎপাদনশীলতা, স্বল্প বিনিয়োগ, নিম্ন মানের দক্ষতা ও নিম্ন মানের প্রযুক্তিসহ নানা সমস্যায় আকীর্ণ। এই সমস্যাগুলোর আশু সমাধান দরকার।

টেকসই দারিদ্র্য নিরসনের জন্য দরিদ্রদের মানব সম্পদের ভিত্তি শক্তিশালী করা জরুরি। দারিদ্র্য নিরসনের অতীত অভিজ্ঞতা হতে মানব পুঁজির ইতিবাচক ভূমিকার কথা ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে এসেছে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ এটি আরো বেশি প্রাধান্য পাবে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশকে যে সকল নীতি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ। এর জন্যে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত

তহবিল যা দরিদ্রদের নানান সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণসহ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও মানসম্মত শিক্ষার মতো সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী নিশ্চিত করবে। দারিদ্র্য নিরসনের জন্য অর্থায়ন লভ্যতার গুরুত্ব বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের অতীত অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। সরকারি নীতির সহায়তাপুষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলনের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতা সামনে রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নকালে এই ধারা আরো এগিয়ে নেয়া হবে। সমাজের সবচেয়ে অরক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক, সমাজ বহির্ভূত মানুষকে সহায়তা প্রদানে সরকারি উদ্যোগ আরো জোরদার করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতলভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে। এছাড়া জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী, দলিত, বেদে, বস্তি এবং চরাঞ্চলবাসী, পথ শিশু, যৌন কর্মীদের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মানব উন্নয়ন: জনমিতিক লভ্যাংশের সদ্ব্যবহার

একটি সুস্থ ও দক্ষ শ্রমশক্তির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এই উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর সহায়তার উপায় হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য প্রায় সর্বাংশে দূরীকরণসহ উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট সামনে রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মানব উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হবে। বিশেষ করে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা; (২) জনসংখ্যার শতভাগ সাক্ষরতা; (৩) ১২-বছর পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা; (৪) কর্মভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে আগ্রহীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা; (৫) সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য বিমা স্কিমে সর্বজনীন অভিগম্যতা; (৬) সংগঠিত খাতে সকল কর্মীকে শতভাগ কর্মকালীন দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা; এবং (৭) সাশ্রয়ী ব্যয়ে সকলের জন্য চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা।

২০৪১ সালের জন্য জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশল: স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত করা হবে। সরকারের স্বাস্থ্যনীতির প্রধান উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন জোরদার করা, স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা এবং মান বৃদ্ধি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতের কৌশল হবে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য গৃহীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অভীষ্ট, সরকারি নীতিকে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। বড় চ্যালেঞ্জ হবে চলমান জনমিতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মক্ষম জনসংখ্যা (১৫-৬৪ বছর বয়সী) বৃদ্ধি থেকে উন্নয়ন লভ্যাংশ আদায় করা। একটি সতর্ক কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষা ও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণে যথোপযুক্ত বিনিয়োগ ও প্রণোদনার মাধ্যমে এই বয়সী জনগোষ্ঠীকে একটি সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করা হবে। সরবরাহ সক্ষমতা ও অর্থায়ন উভয় দিক থেকেই সরকারি খাতের পক্ষে এককভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন হবে সমন্বিত বিনিয়োগ ও সহায়ক নীতিমালার আওতায় একটি শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা। এই অংশীদারিত্ব হবে কৌশলগত, যেখানে শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বেসরকারি খাত, পক্ষান্তরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ শিক্ষায় সমতা বিধান নিশ্চিতকরণে সরকারি খাতের প্রাধান্য থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই গুণগত মানের বিষয়টিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রশিক্ষণ কৌশলের লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষতা নিশ্চিত করা যা সেবা সরবরাহকারীর ইচ্ছামাফিক হবে না।

পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই কৃষি

কৃষি (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ) এবং গ্রামীণ অ-কৃষি কার্যক্রম দারিদ্র্য নিরসনে অধিক প্রভাব-বিস্তারী অর্থনৈতিক খাতগুলোর অন্যতম। অর্থনীতির উন্নয়ন ধারায় কাঠামোগত পরিবর্তনের বাস্তব ধারাবাহিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ ক্রমশ নিম্নগামী, যা ১৯৭০ এর দশকের আগে ৬০% থেকে নেমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাত্র ১৩% এ এসে দাঁড়িয়েছে। তবে স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রথম দুই দশকে গড় বার্ষিক কৃষি প্রবৃদ্ধি ছিল ২% এর নিচে। অথচ ২০০১-২০১৮ সময় পরিধিতে বার্ষিক গড় ৩.৯% হারে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এক সময় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু

হয়েছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে জনগণের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হতো। অথচ সরকারের কার্যকর নীতিমালার কারণে বাংলাদেশের পরিশ্রমী কৃষক সমাজ আজ সেই কঠিন পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের ব্যাপক চাষাবাদ, সেচ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে বোরো ধান চাষে প্রাধান্য এদেশে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছে যার ফলে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। চালের উৎপাদন ১৯৭০ এর দশকের ১০ মিলিয়ন মেট্রিক ট্রন (এমএমটি) থেকে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ৩৬ এমএমটি'তে উন্নীত হয়। এর সাথে আলু, ভুট্টা, গম, সবজি, ফলমূলের মতো ধানবহির্ভূত শস্য, মাছ ও পোল্ট্রি পণ্য উৎপাদন উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং চাল উৎপাদনে প্রায় স্বয়ম্ভরতা অর্জনে এগুলো বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হয়। ফলে খামারের আয় বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে বাড়ে প্রকৃত কৃষি মজুরি, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে প্রভূত অবদান রাখে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও গতিশীল খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে এক ধরনের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশবান্ধব নতুন নতুন মৎস্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসারের মাধ্যমে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট সুফল প্রদায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বখাদ্য সংস্থার ২০১৮ সালের বিশ্ব মৎস্য ও মৎস্য চাষের অবস্থা শীর্ষক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং মাছ চাষে অবস্থান পঞ্চম। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষভাবে এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত রয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাত উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। এছাড়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এই খাত খাদ্যে অধিগম্যতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের কৃষিতে এক মৌলিক রূপান্তর ঘটে চলেছে, যা ২০৪০-এর দশকেও অব্যাহত থাকবে। আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদার কাঠামোয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, মানুষ উন্নত পুষ্টিমানযুক্ত খাবারের দিকে ঝুঁকছে। নানা রকমের খাদ্য গ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথাপিছু চালের ব্যবহার কমছে, এবং শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, ভোজ্য তেল ছাড়াও মাংস, মাছ, ডিম ও দুধের মতো পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের হার বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ধানভিত্তিক কৃষি থেকে ধান-বহির্ভূত শস্যের বর্ধিত উৎপাদন সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে বহুমুখী করার মাধ্যেমে পরিবর্তিত খাদ্য চাহিদার যোগান দিচ্ছে। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও উদ্যান শস্যের মতো অ-শস্য কৃষির প্রবৃদ্ধি শস্যভিত্তক কৃষির প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। এই প্রবৃদ্ধি অ-শস্য উৎপাদন ও খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বর্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়তা পাচ্ছে তবে এর আরো বিস্তৃতি ঘটানো দরকার, সেই সাথে প্রয়োজন পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখা। চাহিদার ধরনে পরিবর্তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান কৃষির বহুমুখীকরণে উৎসাহিত করে ফলে সস্য-শস্যজাতীয় ফসল বিন্যাস থেকে কৃষি সরে আসছে খাদ্যশস্যও খাদ্যশস্য-বহির্ভূত উচ্চমূল্য ফসল বিন্যাসসহ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের দিকে, উদ্যানভিত্তিক ডাল জাতীয় শস্য ও তৈলবীজ শস্য-চাষ বিস্তারের দিকে। প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ বর্তমানে কৃষির সবচাইতে দ্রুত বিকাশমান উপখাত চাহিদা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে এই দুই উপখাতের বিকাশের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা হবে বা তা আরো বেগবান করা হবে।

অতীত অগ্রগতি ও চলমান ব্যবস্থা সত্ত্বেও, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা কৃষিতে আরেকটি মাত্রা যুক্ত করে এটি খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বেড়ে চলা ঝুঁকির সাথে মানিয়ে চলতে কতিপয় অতিরিক্ত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে আনে। এ জন্যে ছয়টি কৌশলগত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে: (ক) বৈরী কৃষি পরিবেশগত ব্যবস্থাকে উৎপাদনশীল টেকসই কৃষি পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা; (খ) মাটির গুণাগুণ বজায় রেখে উৎপাদনশীল কৃষি জমিতে শস্য চাষাবাদের নিবিড়ায়ন; (গ) টেকসই উপায়ে নিবিড় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার; (ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি; (ঙ) কৃষিজ উৎপাদন ও জীবিকার বহুমুখীকরণ এবং আরো বেশি সংখ্যক শস্য জাত বা প্রাণি জাতসহ খামার-বহির্ভূত কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো; এবং (চ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অভিযোজন কার্যক্রমের ধরণ ও আকার নির্ধারণে অনিশ্চয়তার সাথে মানিয়ে চলা। টেকসই কৃষির ভবিষ্যতের জন্য মূল অগ্রাধিকারে যা অন্তর্ভুক্ত হবে তা হলো: স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজন দক্ষতা শক্তিশালী করার জন্য সরকারি পণ্য ও সেবা প্রদান, যেমন জলবায়ু সংশ্লিষ্ট উন্নততর তথ্য, জলবায়ু উপযোগী উৎপাদন প্রযুক্তিসহ তাপসহিষ্ণু ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু শস্য জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা, দক্ষ পানিসঞ্চয়ী সেচ-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নত আগাম আবহাওয়া

বার্তা/পূর্বাভাস ব্যবস্থা জোরদার করা। পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংরক্ষণ কৃষি (সিএ), সমন্বিত শস্য পুষ্টি ব্যবস্থা (আইপিএনএস), সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) প্রভৃতির মতো উত্তম চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করে সমন্বিত খামার ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে। পানিসম্পদের ক্ষেত্রে পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান উত্তম পদ্ধতিসমূহের ব্যাপক বিস্তারসহ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রম, বন্যা বিষয়ে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সেচ চাহিদার নিয়ন্ত্রণ। বন উপখাতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে পুনঃবনায়ন ও বনায়নের জন্য কার্যকর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাস্তবায়নের ওপর। টেকসই কৃষির এই দিকগুলো বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় (বিডিপি ২১০০) যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যেই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আগামী দুই দশকে কৃষির বাণিজ্যীকরণের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের সাথে ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি

শিল্প ও বাণিজ্যের গতিশীলতার ওপর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির ত্বরান্বিতকরণ নির্ভরশীল। আমাদের প্রতিযোগ-দক্ষতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে উন্নত আয় ও মানসম্মত কর্ম-সৃজনে বহির্মুখী শিল্পায়নেই রয়েছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। বাংলাদেশের জিডিপি ইতোমধ্যেই বার্ষিক ৮% এর অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা আরও বাড়িয়ে ৯-১০% হারে উন্নীত করার উচ্চাকাঙ্খা রয়েছে। এই প্রচেষ্টায় বিশাল বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাণিজ্য সম্পৃক্তির যে অনন্য সম্ভাবনা রয়েছে, বাংলাদেশ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে শিল্প খাত হবে প্রধান চালিকাশক্তি।

পরবর্তী সিকি শতাব্দীর বেশির ভাগ সময় জুড়ে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সিংহভাগই হবে বহুমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে, যা বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগ-দক্ষ, রপ্তানিমুখী, এবং বিশ্বের উন্নত অর্থনীতিতে বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি নিত্য নতুন বাজার দখলের সাহসী উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। বাণিজ্য ও শিল্পনীতি পারস্পরিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও স্ব-শক্তিতে বলীয়ান। বাণিজ্য উদারীকরণ তাই উন্নয়নের আরেকটি সোপান, যাকে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মূলধারায় পুরোপুরিভাবে যুক্ত করতে হবে । আগামী অন্তত আরো এক দশক বাংলাদেশে সস্তা শ্রমের সুযোগ গ্রহণ করে তৈরি পোশাক ছাড়াও শ্রমঘন পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্ততপক্ষে মধ্য-মেয়াদের জন্য তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য তৈরি পোশাক-বহির্ভূত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে স্বস্তা শ্রমের ব্যবহার বাংলাদেশের রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা দক্ষতার অন্যতম উৎস হিসেবে বজায় থাকবে। তবে নীতিপ্রণেতা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাজারে সংঘটিত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির খোঁজখবর নিতে হবে এবং সেগুলো গ্রহণের প্রস্তুতি থাকতে হবে, যা দেশের রপ্তানিতে টেকসইভাবে প্রতিযোগ- দক্ষতার সুযোগ কাজে লাগানো নিশ্চিত করবে। উন্নয়ন ধারার অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশ এমন একটা অবস্থানে আসবে যখন দ্রুত রূপান্তরশীল বিশ্ব ম্যানুফ্যাকচারিং বাজার থেকে পূর্ণ সুবিধা পেতে বাংলাদেশ তার প্রযুক্তি, পুঁজি ও নিবিড় উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। অনুমান করা যেতে পারে যে, আগে না হলেও অন্তত ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে কোরিয়া, তাইওয়ান ও মালয়েশিয়ার মতো প্রযুক্তিঘন রপ্তানির দিকে যেতে হবে এবং এজন্য বাংলাদেশি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ প্রতিযোগ-দক্ষতার সুযোগ নিশ্চিত করতে লজিস্টিক্সসহ লাগসই দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের কাজ এখনই শুরু করতে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং প্রতিযোগিতামূলক ডিজিটাল বিশ্বে বাণিজ্য: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (শিল্প ৪.০) ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশ তাতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার বৈশ্বিক প্রবাহের সবকিছুতেই রূপান্তর ঘটাচ্ছে। পণ্য, সেবা, অর্থ এবং মানুষ-পরিবর্তনের ছোঁয়া সর্বত্র এই রূপান্তর এখনো প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পখাত ধীরে ধীরে সর্বশেষ প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করছে, যদিও এখনো ব্যয় বিবেচনায় শ্রমঘন উৎপাদন আকর্ষণীয়। ধারণা করা হয় যে, প্রযুক্তিঘন উল্লম্ফনময় উদ্ভাবনার মতো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধারার সাথে যুক্ত হতে বাংলাদেশের আরো বহু বছর লাগবে। এসব পরিবর্তন, বিশেষ করে যান্ত্রিকায়নের ফলে শ্রমিকদের কাজ হারানোর মতো ঝুঁকি আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। এর ফলে সস্তা শ্রম সুবিধা বাধাগ্রস্ত হবে, অথচ বাংলাদেশ এতকাল ধরে একান্তভাবে এই সুবিধা ভোগের ওপর নির্ভর করে টিকে আছে। আমাদের দেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনমিতিক বৈশিষ্ট্য হলো যুব শ্রমশক্তির দ্রুত উত্থান। বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই তরুণ-তরুণীরা ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উদ্ভাবনের বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী হয়ে থাকে। একটি দেশে যুব শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধিকে জনমিতিক লভ্যাংশের সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ বিবেচনা করা হয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি ইতিবাচক উপাদান হতে পারে।

এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও বাণিজ্য পরিবর্তনের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ধারার মধ্য দিয়ে যাবে, যা এদেশের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এগুলো হচ্ছে: (ক) বাণিজ্য উদারীকরণ অব্যাহত থাকবে; (খ) বাণিজ্য সহায়ক সেবা বাণিজ্যের ব্যয়হ্রাস ও গতি বৃদ্ধি করবে; (গ) বৈশ্বিক মূল্য শিকল বিকশিত ও সংহত হবে; (ঘ) শিল্প ও বাণিজ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবনা দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগ-দক্ষতা বাড়াবে; (ঙ) ক্ষুদ্র বহুজাতিক উদ্যোগের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটবে। সুতরাং, উচ্চ মধ্য-আয় ও উচ্চআয়ের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা পরবর্তী ২০ বছর প্রধানত নির্ভর করবে অধিকতর সফল রপ্তানি খাতের ওপর যা একটি অতি উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থায় টিকে থাকার মত প্রতিযোগ-দক্ষতাসম্পন্ন।

প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাবলি শক্তিশালীকরণ: সস্তা শ্রমের ওপর গড়ে ওঠা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার ভিত্তি স্থায়ী হতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার আধুনিক তত্ত্বের শুরুতেই ধরে নেয়া হয় যে, এই সুবিধা হলো গতিশীল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিকাশোন্মুখ ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশকে কতিপয় অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে একটি সমন্বয়ধর্মী সরকারি-বেসরকারি প্রয়াস গড়ে তুলতে হবে। এগুলো হচ্ছে: অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ; শ্রমশক্তির মানোন্নয়ন; উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে উদ্ভাবন বাড়াতে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ; ব্যবসার পরিবেশ উন্নতকরণ ও ব্যবসার পরিচালন ব্যয়হ্রাসকরণ; ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য বিশাল অংকের অর্থায়ন সমাবেশ; বৈশ্বিক মূল্য শিকলের সাথে সম্পৃক্তি; এবং টেকসই পরিবেশ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা নিশ্চিতকরণ।

রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য বাণিজ্য ব্যবস্থা: এটি প্রত্যাশিত যে, শিল্প খাত হবে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। তাই আমাদের শিল্পখাত উন্নয়ন ও রপ্তানি অধিকতর বহুমুখী করণে শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে। রপ্তানি বহুমুখীকরণে দুটি সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়: ক) বাণিজ্য অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট সমস্যা এবং খ) বাণিজ্য নীতি ও প্রণোদনা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সমস্যা। বাণিজ্য অবকাঠামো, যেমন বন্দর, পরিবহন অবকাঠামো, শুল্ক প্রশাসন-এর দুর্বলতা সুবিদিত, এবং তা সকল ধরনের রপ্তানিতে প্রভাব ফেলে। শুল্কায়ন পদ্ধতির তুলনামূলক অদক্ষতা এবং প্রতিযোগিদের তুলনায় অবকাঠামো সেবার মূল্য বেশি হওয়ায় রপ্তানি প্রতিযোগ-দক্ষতা ব্যাপকভাবেহ্রাস পায়। অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থা পরিবর্তনের কৌশল অবলম্বন করা হবে। তবে বিরাজমান বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থাই রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রধান অন্তরায়। রপ্তানির তুলনায় দেশীয় বাজারে বিক্রয়ার্থে উৎপাদিত পণ্যের অনুকূলে প্রণোদনা ব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব বেশি। বিরাজমান বাণিজ্য ব্যবস্থার এই রপ্তানি-বিরোধী প্রবণতা বহুমুখীকরণ সম্ভাবনা দমিয়ে রাখছে। তৈরি পোশাক শিল্পে অর্জিত সাফল্যের আলোকে এমন একটি রপ্তানি বহুমুখীকরণ কৌশল গ্রহণ করতে হবে যেখানে তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানিকারকগণ তৈরি পোশাকের মতো একই সুবিধা পাবে, যার সর্বাগ্রে থাকবে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা।

আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য যেমন, সবজি, ফলমূল, আলু, সুগন্ধি চাল, চিংড়ি প্রভৃতির মতো উচ্চমূল্যের পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি উৎসাহিত করতে সঠিক প্যাকেজিং, স্বাস্থ্য ও পরিছন্নতার মানসহ সার্বিক গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। তদুপরি, উচ্চতর মূল্য সংযোজনকারী খাদ্যপণ্যের রপ্তানি মান নিশ্চিতকল্পে উন্নততর প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিল্প উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হবে। পণ্যের নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান বিষয়ে বিদেশী ক্রেতাদের আস্থা অর্জনসহ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাত করা এবং বিতরণের প্রতিটি পর্যায়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করা হবে। এছাড়া, বহুমুখী কৃষি রপ্তানি বাড়াতে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন শক্তিশালী করা হবে।

পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণে জোর দেয়ার পাশাপাশি জাহাজীকরণ, বিমান পরিবহন, আইসিটি ও পর্যটন শিল্পসহ সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হবে। বিশেষ করে পর্যটনশিল্প থেকে আয় বাড়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে, যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়ক হবে।

ভবিষ্যৎ বাণিজ্য নীতি: রপ্তানি-চালিত প্রবৃদ্ধির তত্ত্বে একটি প্রণোদনা কাঠামো স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়, যা বিদ্যমান নীতিসংশ্লিষ্ট গুরুতর রপ্তানি-বৈরী প্রবণতার সমস্যা হতে উত্তরণে সহায়ক হয়। সুতরাং, রপ্তানি-বৈরী প্রবণতার দূরীকরণ বহুলাংশে প্রণোদনা কাঠামো সংশোধনের ওপর নির্ভরশীল, যাতে তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে রপ্তানি ও রপ্তানি-বহির্ভূত খাতের মধ্যে সম্পদ বন্টন সম্ভব হয়। মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট বা এমএফএ সহায়তা বিশ্ব বাজারে আমাদের প্রবেশ অবারিত করেছে। এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুবিধা নিতে স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসিসহ তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রণীত নীতিমালা একটি উচ্চ হারের শুল্ক ব্যবস্থার রপ্তানি-বৈরী প্রবণতার সুষ্ঠু প্রশমনে সক্ষম হয়েছে।

তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে যতদিন তৈরি পোশাক খাতে উচ্চ শুল্ক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকবে। অর্থনীতি যখন উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশের চৌকাঠ পেরিয়ে উচ্চ-আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাবে তখন আমদানি-রপ্তানির অখন্ড প্রবাহ বাড়াতে স্বল্প ও সমরূপ শুল্ক আরোপসহ বাণিজ্য নীতিকে আরো খোলামেলা হতে হবে।

একথা সত্য যে, দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কারণে দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারেরও দ্রুত বিস্তার ঘটছে। সময়ের সাথে, ভবিষ্যতের বাণিজ্য নীতিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে এক ধরনের নিরপেক্ষ অবস্থানের আবশ্যকতা রয়েছে, যদিও রপ্তানির দিকে খানিকটা পক্ষপাত থাকবে।

এলডিসি অবস্থান থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জঃ ২০২৪ সালের মধ্যে এলডিসি অবস্থান থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ সময় প্রধান বাজারগুলোতে বড় ধরনের অগ্রাধিকার সুবিধা হারানোর কারণে আমাদের রপ্তানির ওপর চাপ পড়বে। ভবিষ্যৎ-চিত্র প্রক্ষেপণের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, ২০২৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত ও চীনের বাজারে সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি বছরে ১১% হারে হ্রাস পেতে পারে, যার পরিমাণ প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বেশ কিছু ছাড় ২০২৪ সালের পরে আর পাওয়া যাবে না। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর আওতায় পড়বে না, যেখানে ইবিএ সুবিধায় ২০২৭ সাল পর্যন্ত তিন বছরের প্রস্তুতিকালীন সময় পাওয়া যাবে। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সামলে ওঠার জন্য আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

কর্মসংস্থান সমস্যা ও কৌশলঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সকলের মাঝে বন্টন নিশ্চিত করার জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও সমস্যার প্রশ্নে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ২০৪১ সাল পর্যন্ত সময় পরিধিকে মোটামুটিভাবে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ ২০৩১ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ২০৩১ সালের পরে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জনমিতিক বৈশিষ্ট্য এই যে, বিগত বছরগুলোতে কর্মক্ষম বয়সী জনসংখ্যার অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে "জনমিতিক লভ্যাংশ" আহরণের এক অনন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে এ সুগোগ কাজে লাগাতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে তাদের সঠিকভাবে নিয়োজিত রাখা দরকার। পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে প্রথম পর্যায়ে বেশী জোর দেয়া হবে, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি কাজের গুণগত মানোন্নয়ন প্রাধান্য পাবে। তদনুযায়ী, প্রথম মেয়াদে জোর দেয়া হবে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর - বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং এর উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও এ খাতে বাড়তি শ্রমিকদের কর্মসংস্থান এবং এ ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেকারত্ব কমিয়ে এনে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এর পাশাপাশি কাজের পরিবেশ উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে, এবং এজন্য কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানসহ কর্মের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অর্থনীতি বিকশিত হলে এর গুণগত দিকগুলিতে, যেমন পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানসহ সবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে শোভন কাজের নিশ্চিত করার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেয়া হবে।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত থাকবে, তবে ভবিষ্যেত অধিকতর দক্ষতা নির্ভর কর্মসংস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে । এজন্যে গন্তব্য দেশসমূহের দক্ষকর্মীর চাহিদার ধরণ বিবেচনায় রেখে গৃহীত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আলোকে একটি সুপরিকল্পিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রকৃত চাহিদার বিপরীতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত কিনা তা নির্ধারণে প্রশিক্ষণ দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রতিটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় জন্য দক্ষতার ন্যূনতম মান স্থির করে প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি সনদের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা হবে। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক নিয়োগসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুললোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া, মাঝে মাঝে প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উপকরণের জন্য অর্থের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রবৃদ্ধিও বেগবান হবে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার বর্তমান ৩৩% হতে ৪৫% এ উন্নীত করা হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অতিরিক্ত বাড়বে শতকরা এক ভাগ। নারীদের অধিকহারে শ্রম শক্তিতে নিয়ে আসার জন্য সমন্বিতভাবে বেশ

কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারীদের কর্মসংস্থানের প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে যে সকল খাতে তাদের কাজের তুলনামূলক সুবিধা বেশি এমন খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি (যেমন- পোশাক শিল্প, পাদুকা শিল্প, ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতির মতো শ্রমঘন শিল্প), কাজের পরিবেশ উন্নত করতে অবকাঠামো স্থাপন, মাতৃত্বকালীণ ছুটি ও শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থাসহ নানান ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান কৌশল প্রণয়নে শিল্প বিপ্লব ৪.০ এর আওতায় অটোমেশনের সম্ভাবনা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয়ও বিবেচনায় নিতে হবে। একটি উন্নত ও বিকশিত অর্থনীতির মর্যাদা লাভের অভিমুখে এই অভিযাত্রায় নীতিপ্রণেতাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও শ্রম বাজারে এর প্রভাবের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তবে কর্মসংস্থানে ধ্বসের ভীতি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ না করে নতুন ও উন্নত ধরনের কাজের ইতিবাচক দিকগুলো থেকে লাভবান হওয়ার জন্য কর্মমুখী নীতি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, যাতে অর্থনীতি তথা শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা কর্মসংস্থানে ধ্বসের অসহায় শিকারে পরিণত না হয়ে এর ইতিবাচক দিকগুলো থেকে সুবিধা পেতে পারে।

টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

ত্বরান্বিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে জ্বালানি চাহিদা যখন দ্রুত বেড়ে চলেছিল এমন একটি প্রেক্ষাপটে জ্বালানি সরবরাহে মন্থর গতির ফলে ২০০৯-পরবর্তী বাংলাদেশ এক তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি হয়। এই সংকট হতে উত্তরণপূর্বক দেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণসহ এর দক্ষতা উন্নয়ন, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়, যা ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বার্ষিক গড় ১৩.৪% হারে বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট থেকে ২২,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি এসে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ সংযোগ বৃদ্ধির বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় যে, ২০২১ সালের মধ্যে তা ১০০% এ গিয়ে পৌঁছবে। সকলের জন্য বিদ্যুৎ ছিল ২০২১ সালের লক্ষ্য। ২০১০ সালে ৫০% এরও কম মানুষের বিদ্যুৎ সুবিধা থাকার কথা বিবেচনায় নিলে অগ্রগতির এই ধারাবাহিকতাকে অসামান্য বলা যায়।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির টেকসই পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই খাতের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও নীতিমালার মূল উপাদানসমূহ নিম্নরূপ: (১) নিম্নতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পন্থা অনুসরণ; (২) স্বল্পমূল্যে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে উৎসাহ প্রদান; (৩) প্রাথমিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; (৪) উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মধ্যে বিনিয়োগ ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ; (৫) বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার দক্ষ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান; (৬) জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা; (৭) বিদ্যুৎ বাণিজ্যের অধিকতর প্রসার; (৮) জ্বালানির উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ নীতি নিশ্চিতকরণ; এবং (৯) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কৌশলের মূল লক্ষ্য হবে নতুন চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদ্যমান চাহিদা ঘাটতি দূর করা। বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) প্রণয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনা ২০১৬-এর আলোকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর একটি বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতি ৫ বছর অন্তর এই কৌশল হালনাগাদ করা হবে।

বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যমাত্রা তখনই অর্জন হবে যখন এদেশের সকল মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুফল ভোগ করতে পারবে। তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে সঞ্চালন ও বিতরণে উপযুক্ত বিনিয়োগ করতে হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ এই বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে যাতে বিদ্যুতের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় বন্ধ এবং জেলা পর্যায়ের উন্নয়নে বিদ্যুৎ সঙ্কটের চূড়ান্ত অবসান ঘটানো যায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও, তিনটি প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রতিযোগিতামূলক দরে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে। ভুটান ও নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানি বাড়ালে তা এদেশে কোন সংঘাত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে

অনিশ্চয়তার ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আগামী ২০ বছরে, ২০২১ হতে ২০৪১ অর্থবছরের মধ্যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছর গড়ে ৩১০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধির মাধ্যমে ৬২ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর কৌশলে পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে।

উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতির বিনির্মাণ

বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সস্তা শ্রমের সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রবৃদ্ধির চাকা সামনে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন সময় এসেছে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সুবিধাবলি ব্যবহার করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য-আয়ের মর্যাদায় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত অর্থনীতির মর্যাদায় আসীন করার।

ডিজিটাল সুবিধাবলি ও উদ্ভাবন: ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ উভয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: (১) একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদ উন্নয়ন; (২) সবচেয়ে অর্থবহ উপায়ে নাগরিকদের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন; (৩) জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া; এবং (৪) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বাজার ব্যবস্থা অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতা সক্ষম রূপে গড়ে তোলা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও থ্রি-ডি প্রিন্টিং-এর মতো প্রযুক্তি বর্তমানে কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং, স্বাস্থ্য পরিচর্যা থেকে শুরু করে সবকিছুর ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে রোবোটিক্স ও অটোমেশন কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যতে কাজের ধরনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছে। রূপান্তরধর্মী এই প্রযুক্তিগুলোকে কর্মসুযোগ হ্রাসের বিপরীতে অধিকতর লাভজনক কর্মসৃজনে ব্যবহার করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগ-দক্ষতা শক্তিশালীকরণসহ উচ্চ আয়ের নতুন ধরনের কর্মসৃজন বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উন্নত স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অবিরাম কাজের সুযোগ কমতে থাকবে। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সম্ভাবনা দেখে অনুমান করা যায় যে, তৈরি পোশক খাতে অধিকাংশ কায়িক শ্রমই স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদনের ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব ঝুঁকির নেতিবাচক দিক মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগানোর নিমিত্ত নীতি ও শাসন পদ্ধতিতে উদ্ভাবনমূলক অভিনব কর্মপদ্ধতি ডিজাইন এবং পরীক্ষামূলক ব্যবহার চালু করার জন্য সরকার, বড় বড় কোম্পানি, নাগরিক সমাজ, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, রাজনীতিবিদ, নবীন-উদ্যোগ (স্টার্ট-আপ) এবং সমাজের সকল স্তরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত সুফল যেন সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে ৫০% বেশি হয়, সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। শিল্প কারখানার যে পরিমাণ কাজের সুযোগ নষ্ট হবে তার চেয়ে অধিক কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে বিগ ডেটা, ডেটা এনালিটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অটোমেশনের সমন্বিত ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন। গতিময় এইসব পরিবর্তনের বাস্তবতার সাথে তাল মেলাতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে।

উপকরণনির্ভর স্তর থেকে উদ্ভাবন-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে যাত্রা হবে বাংলাদেশের রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধি চালিকাশক্তির এক যুগ পরিবর্তন । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা (টিএফপি)-এর অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ও গুণগত মান পরিশীলিত করার কাজ এগিয়ে নেবার জন্য সরল পণ্যের পুনরুৎপাদন ও অনুকরণ থেকে উদ্ভাবনের দিকে উৎপাদন অগ্রাধিকার পরিবর্তনের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে টিএফপি'র অবদান বর্তমান ০.৩ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনভিত্তিক অর্থনীতি গঠনের কৌশল নির্ধারণে বাংলাদেশের সামনে বেশ বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এজন্য একটি ত্রি-মুখী কৌশলের প্রয়োজন হবে: (১) নতুন নতুন সফটওয়্যার ও কাজের প্রণালি উদ্ভাবন এবং সেবা সরবরাহে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার; (২) বিজ্ঞান ও উচ্চ-প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে শ্রম সুবিধার সংমিশ্রণ এবং (৩) প্রতিযোগিতা-দক্ষতা বৃদ্ধি ও নিম্ন -কার্বন অর্থনীতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং চৌকস যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এগিয়ে নেয়া। এছাড়াও, সরকার ক্রমশ সরাসরি সেবা প্রদান হতে সরে গিয়ে আরও ব্যাপকভাবে ডিজিটাল প্লাটফর্ম এবং অবকাঠামো তৈরিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যেন বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষিত সমাজকে অংশীদার করা এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত আধুনিক সেবার চাহিদা পূরণ করা যায়।

জাতীয়ভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগকে পরিণত অবস্থার দিকে নিয়ে যাবার গতি বৃদ্ধির জন্য যা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা হলো:

১) সেবাপ্রদানকারী দপ্তরগুলো তাদের প্রয়োজনে একে অপরের সাথে কথা বলা (সেবার আন্ত:পরিচালনযোগ্যতা);

২) ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের সাথে নির্বিঘ্নে বিভিন্ন প্রকার লেনদেন সম্পাদন;

৩) ভৌত এবং অভৌত অভিগম্যতার স্থানসমূহ সুবিধাবঞ্চিত প্রতিটি নাগরিকের (একীভূত অভিগম্যতা) নাগালের মধ্যে আনা; এবং

৪) সকল সেবা প্রদানকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ধরনের অস্পষ্টতা ছাড়াই প্রতিটি নাগরিককে (একক পরিচয় পত্র দ্বারা) চিহ্নিত করা।

সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ কাজের গতি বাড়াবে। এছাড়া ক্রয়-কার্য, দক্ষতা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মানোন্নয়ন কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী ও ডিজিটাল প্রযুক্তির গ্রহণে একটি সুগঠিত এবং বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে।

উন্নয়ন অগ্রগতি পরিমাপ, উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা এবং সুবিধা বঞ্চিতদের সমস্যা নিরসনে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই আগামী দিনের তথ্য বিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগিয়ে তথ্য-ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে অগ্রগতির উল্লম্ফন, বিদ্যমান সেবার মানোন্নয়ন ও নতুন সেবা তৈরির গুরুত্ব অপরিসীম।

একইসাথে, প্রযুক্তির সম্ভাব্য ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি টেকসই করতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বাড়াতে সরকারের সক্রিয়, ধারাবাহিক এবং পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভুয়া খবরের দ্রুত বিস্তার এবং বড় বড় সংস্থা কর্তৃক ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ন্ত্রণের মতো বিপদজনক প্রবণতার সমস্যা নাগরিককেন্দ্রিক নিয়মনীতি এবং ব্যাপক ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোকাবেলার করতে হবে।

টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ

আজকের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে প্রতিযোগ-দক্ষতার প্রধান নির্ধারক হলো ব্যয়সাশ্রয়ী ও দক্ষ পরিবহন সেবা, কেননা তা দেশের ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একটি দক্ষ ও ব্যয় সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন তাই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য অভীষ্ট অর্জন সক্ষমতার একটি প্রধান নির্ধারক।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য প্রয়োজন কারখানা থেকে বন্দর পর্যন্ত যাতায়াতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসের অধিকতর উন্নয়ন এবং সেই সাথে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী আমদানি পণ্যসামগ্রী বন্দর থেকে কারখানার ফটকে যথাসময়ে পৌঁছে দেয়া। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবহন কৌশল গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে বেশী অগ্রাধিকার পাবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর কৌশলের অনিষ্পন্ন কাজগুলো সম্পন্ন করা। এছাড়া অগ্রাধিকারে পাবে পরিবহন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার অপসারণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় পরিবহন খাতে অধিক সাফল্য পেতে তৃতীয় অগ্রাধিকার পাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কৌশলের সংস্কার সাধন। পরিশেষে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো বড় বড় পরিবহন প্রকল্প শনাক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশকে আরো সতর্ক ও কৌশলী হতে হবে এবং তদনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় পরিবহন খাতের কৌশল: এ খাতে যে কৌশলগুলো প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো: (১) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নিরূপণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ; (২) বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার আন্তঃভারসাম্যরক্ষণ ক্ষমতার উন্নতি সাধন; (৩) বাস্তবায়ন সক্ষমতা বাড়ানো; (৪) নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়নসহ যানজট হ্রাসের জন্য সময়-সাশ্রয়ী বিদ্যুতচালিত আরবান মাস ট্র্যানজিট/মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক চালুকরণ; (৫) পরিবহন অবকাঠামোর জন্য টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ; (৬) পরিবহন সেবার বিশ্বাসযোগ্যতা ও মান নিশ্চিত করতে কার্যকর কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন ও

বাস্তবায়ন; (৭) সরকারি পরিবহন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং (৮) ২০৪১ সালে ট্র্যাফিক বা যাতায়াত চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক পরিবহন সুবিধাদির বাস্তবায়ন ও পরিচালনা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল: প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সফলতার ওপর ভিত্তি করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশল অনুসারে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলের আওতায় যোগাযোগ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর উপর নজর দেয়া হবে তা হলো: টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবার সম্প্রসারণ, ব্যক্তিখাতে প্রিন্ট, অডিও ও ভিডিও মিডিয়ার সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান, এবং যোগাযোগ সেবা, জ্ঞান ও তথ্য আদান-প্রদান সেবার প্রতিযোগিতামূলক ও সুষ্ঠু বিস্তারের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় তথ্য অধিকার আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে, যা একটি তথ্যভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে সহায়ক হবে।

নগরায়ণ ব্যবস্থাপনা

নগরায়ণ ও উন্নয়ন অত্যন্ত ইতিবাচক ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের অভিযাত্রায় আগামী দিনগুলোতে নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাবে। নগর খাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো: (১) দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ নগরে বসবাস করবে; (২) নগরের ভৌত পরিবেশ হবে বাস্তুতন্ত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নগরবাসীদের চাহিদার সাথে ভারসাম্যমূলক; (৩) এমন একটি সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ করা হবে যেখানে থাকবে না চরম দারিদ্র্য এবং থাকবে না কোন বস্তি; (৪) নগর সেবা শিল্প গড়ে তুলে মানসম্মত নগর অবকাঠামোসহ চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের নাগরিক সেবা প্রদান করা হবে; এবং (৫) নগর প্রশাসন কাঠামো নগরবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত, নাগরিকদের চাহিদা মেটাতে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এর ব্যয় নির্বাহ করা হবে নগর উন্নয়ন কর, জাতীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত মঞ্জুরি, সেবা থেকে প্রাপ্ত ব্যয় পুনর্ভরণ ও দায়িত্বশীল ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও টেকসই সংমিশ্রণে সৃষ্ট তহবিল দ্বারা।

নগর প্রশাসন সংস্কার: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ ধরে নেয়া হয়েছে যে, একটি বাজার অর্থনীতিতে নগরায়ণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত। নগরায়ণের ধরণকে প্রভাবিত করতে সরকারি নীতির ভূমিকা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রণোদনা, বিধিমালা, সরকারি বিনিয়োগ ও প্রতিষ্ঠানের ওপর। উচ্চ আয় দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিন্যাসের প্রধান বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বিকেন্দ্রীকৃত ও স্বায়ত্তশাসিত নগর সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সুষ্ঠু নগর ব্যবস্থাপনার কৌশলে তাই ত্রিমুখী কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন হয়: (১) উন্নত সেবা পেতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা প্রয়োজন বিধায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভূমিকা পুনর্বিন্যাস; (২) নাগরিক সেবাপ্রদানকারি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং (৩) একটি জবাবদিহিমূলক নগর প্রশাসন ব্যবস্থা বিনির্মাণ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ নগর খাতে অর্থায়ন চাহিদা ও বিকল্প উৎস: নগর খাতের অর্থায়ন চাহিদা ব্যাপক। নগরায়ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়ন চাহিদা বিবেচনায় রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে, নগর খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচি বর্তমানে জিডিপির ২.৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে জিডিপির ৫% হবে এবং ২০৪১ অর্থবছরে তা জিডিপির ৭% এ উন্নীত হবে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক বড়, এবং এমনকি কর সংগ্রহের ব্যাপক অগ্রগতি দিয়েও এককভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই অর্থায়ন সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে দুটি পৃথক অর্থায়ন কৌশলের: বেসরকারি অর্থায়ন এবং নগর সেবার ব্যয় পুনর্ভরণে একটি শক্তিশালী কর্মসূচি। নগর সরকারের পরিচালন ব্যয়সহ স্থানীয় সড়ক, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পার্ক ও জলাশয় সংরক্ষণ প্রভৃতি সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নের অর্থায়ন হবে স্থানীয় সরকারের কর রাজস্ব থেকে। এছাড়া পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন ও কঠিন বর্জ্য অপসারণের মতো সেবার খরচ মেটাতে সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে খরচের অর্থ আদায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক আইন ও বিধি-বিধান গৃহীত হয়েছে। এর ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমনের পাশাপাশি অভিযোজনমূলক কর্মসূচি ও নীতিমালা পরিচালিত হচ্ছে। বায়ু ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর

বিশেষ গুরুত্বসহ ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে এর অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। জীববৈচিত্র্য উন্নয়নেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কৌশল ও নীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে বড় ধরনের একটি অগ্রগতি হলো বিগত সেপ্টেম্বরে ২০১৮-তে গৃহীত বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে দেশের ব-দ্বীপ গঠনজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য এটি একটি সুসমন্বিত কৌশল ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা।

প্রবৃদ্ধি কৌশলে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিবেচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করাই হবে মূলত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রধান উদ্দিষ্ট। সুতরাং অনিবার্যভাবেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় বাংলাদেশে একটি প্রকৃতিবান্ধব প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হবে। এর সুনির্দিষ্ট কৌশল, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (ক) সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যয় বিবেচনায় নেয়া; (খ) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও ভঙ্গুরতা হ্রাস; (গ) বায়ু ও পানি দূষণ কমিয়ে আনা; (ঘ) জ্বালানি ভর্তুকি হ্রাস; (ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর সবুজ কর আরোপ করা; (চ) শিল্পকারখানা হতে কার্বন নির্গমণের ওপর করারোপ; এবং (ছ) ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষণ রোধ; (জ) তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভূ-স্থানিক তথ্য বিশ্লেষণ।

পরিবেশ বৈশিষ্ট্যগতভাবেই গণ সম্পদ হলেও সরকারি খাতের পক্ষে এককভাবে এর অর্থায়ন সম্ভব নয়। তাই সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অর্থ বন্টন নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করা দরকার। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বিভিন্ন বিকল্প অর্থায়ন উৎসের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন বেসরকারি অর্থায়ন, সরকারি অর্থায়ন নীতিমালা, সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ)-এর সুবিধা গ্রহণ এবং অপরাপর বৈশ্বিক তহবিল হতে অর্থ সংগ্রহ করা।

অব্যাহত অগ্রযাত্রা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর আওতায় যে অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে, তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের সাক্ষ্যবাহী। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নলালিত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে যাবার জন্য দেশ আজ পুরোপুরি প্রস্তুত। এই প্রেরণাদায়ী উন্নয়ন পথে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে চালিত করতে প্রয়োজনীয় কৌশল, নীতি ও কর্মসূচি একসূত্রে গাঁথা হয়েছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ দলিলটিতে। সামনে পাহাড়সম সমস্যা থাকলেও তা অলঙ্ঘনীয় নয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর ভিত্তিপ্রস্তর ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় একটি পথ-নকশা তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানাদি শক্তিশালীকরণসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে শুরু হবে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য প্রমাণ করেছে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, শক্তিশালী পরিকল্পনা কৌশল ও নিবেদিত প্রচেষ্টা কীভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত, বলিষ্ঠ ও অবিচল নীতি-নেতৃত্বে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

বিষয়সূচি

নির্বাহী সারসংক্ষেপ i
সারণি তালিকা xviii
চিত্র তালিকা xix
শব্দসংক্ষেপ xx

অধ্যায় ১ ১

রূপকল্প ২০৪১ একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতি অভিমুখে

১.১ উদ্দীপনাময় সূচনা ৩
১.২ দ্রুত রূপান্তরের প্রেক্ষাপট ৪
১.৩ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক ৬

অধ্যায় ২ ৭

একটি উচ্চ-আয় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ

২.১ প্রতিষ্ঠানই উন্নয়নের প্রাণশক্তি ৯
২.২ রূপকল্প ২০৪১ এর প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ ৯
২.৩ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন ১০
২.৪ প্রতিষ্ঠান সংস্কারের চ্যালেঞ্জসমূহ ১৪
২.৫ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সুশাসনের অবস্থা ১৪
২.৬ অব্যাহত অগ্রযাত্রা ১৯

অধ্যায় ৩ ২১

একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

৩.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ২৩
৩.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক ২৪
৩.৩ উচ্চ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ২৪
৩.৪ রাজস্ব পরিচালন কৌশল ২৫
৩.৫ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ২৬
৩.৬ লেনদেনের ভারসাম্য উন্নয়ন ২৭
৩.৭ বহিঃস্থ স্থিতিশীলতার জন্য বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা ২৮
৩.৮ উচ্চতর বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় সমাবেশ ২৮
৩.৯ উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিনিয়োগ ২৯
৩.১০ মধ্য-আয় ফাঁদ পরিহার ৩০
পরিশিষ্ট ক: সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ৩১

অধ্যায় ৪ ৩৩

একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ

৪.১ প্রেক্ষাপট ৩৫
৪.২ দারিদ্র্য নিরসনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ৩৫
৪.৩ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ৩৮
৪.৪ দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কর্মকৌশল ৩৮
৪.৫ আয় বৈষম্যের মোকাবেলা ৪২
৪.৬ কাউকে পেছনে ফেলে নয় ৪২

অধ্যায় ৫		৪৫
মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং জনমিতিক লভ্যাংশ আহরণ		
৫.১	প্রেক্ষাপট	৪৭
৫.২	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে মানব উন্নয়নে অগ্রগতি	৪৭
৫.৩	মানব উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প	৪৯
৫.৪	মানব উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা	৫০
৫.৫	জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশল	৫১
৫.৬	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল	৫২
৫.৭	প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা গঠনের জন্য কৌশল	৫৪
৫.৮	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অর্থায়ন কৌশল	৫৫
৫.৯	মানব উন্নয়ন পেরিয়েঃ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য	৫৬
অধ্যায় ৬		**৫৭**
একটি উচ্চ-আয় দেশে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য টেকসই কৃষি		
৬.১	প্রস্তাবনা	৫৯
৬.২	খাদ্য ও কৃষি নিরাপত্তায় ব্যাপক রূপান্তর	৫৯
৬.৩	শস্য-কৃষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৬৫
৬.৪	খাদ্য নিরাপত্তায় অগ্রগতি	৬৮
৬.৫	কৃষি সম্প্রসারণ	৭৩
৬.৬	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির স্থায়িত্বের জন্য ভবিষ্যৎ কৃষিনীতি	৭৩
৬.৭	ভবিষ্যতের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	৭৫
৬.৮	ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখা	৭৬
অধ্যায় ৭		**৭৯**
একটি ভবিষ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান		
৭.১	একবিংশ শতাব্দীতে শিল্প ও বাণিজ্য	৮১
৭.২	বিশ্বায়নের নতুন যুগে বাণিজ্য	৮৫
৭.৩	একটি প্রতিযোগিতামুখী বিশ্বে বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা	৯৫
৭.৪	ভবিষ্যতের জন্য বাণিজ্য সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক কৌশল ও নীতিমালা	৯৯
৭.৫	ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও শিল্পে সেবা খাতের কৌশলগত ভূমিকা	১০৫
৭.৬	একটি পরিণত অর্থনীতির কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা	১০৭
অধ্যায় ৮		**১১৭**
একটি উচ্চ-আয় দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি		
৮.১	প্রেক্ষাপট	১১৯
৮.২	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মেয়াদে অগ্রগতি	১১৯
৮.৩	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প	১২১
৮.৪	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	১২২
৮.৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশল ও নীতিমালা	১২৩
৮.৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অর্থায়ন কৌশল	১২৭
	পরিশিষ্ট ৮	১২৮

অধ্যায় ৯ **১৩১**

আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজন

৯.১ সূচনা ১৩৩

৯.২ উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি অভিমুখে অগ্রগতি ১৩৪

৯.৩ উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সুবিধাবলির উন্মোচন ১৩৮

৯.৪ বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের দৃশ্যকল্প ১৪০

৯.৫ ডিজিটাল ও উদ্ভাবনমূলক সুবিধাবলির ব্যবহার কৌশল ১৪২

পরিশিষ্ট ৯ ১৪৮

অধ্যায় ১০ **১৫৩**

অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ

১০.১ প্রেক্ষাপট ১৫৫

১০.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে অর্জিত অগ্রগতি ১৫৫

১০.৩ পরিবহন খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প ১৫৬

১০.৪ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবহন খাতের লক্ষ্যমাত্রা ১৫৬

১০.৫ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য পরিবহন খাতের কৌশল ১৫৭

১০.৬ যোগাযোগ ১৬৪

অধ্যায় ১১ **১৬৫**

একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে নগর পরিবর্তনশীলতার ব্যবস্থাপনা

১১.১ নগরায়ণ ও উন্নয়ন ১৬৭

১১.২ নগরায়ণের জন্য ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা ১৭১

১১.৩ নগর সংস্কার অভিজ্ঞতা ১৭২

১১.৪ নগর অর্থায়ন কৌশল অভিমুখে ১৭৩

১১.৫ নগর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংস্কার ১৭৪

১১.৬ নগর সংস্কার কৌশল ১৭৫

১১.৭ জাতীয় এজেন্ডার সাথে নগর এজেন্ডার সমন্বয় ১৭৭

১১.৮ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ ১৭৭

১১.৯ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে নগর খাতে অর্থায়ন চাহিদা ও বিকল্প উৎস ১৭৮

১১.১০ নগর সেবায় বেসরকারি উদ্যোগ ১৭৮

১১.১১ স্ব-অর্থায়ন ও ব্যয় পুনর্ভরণ ১৭৮

অধ্যায় ১২ **১৭৯**

একটি গতিশীল প্রাণবন্ত ব-দ্বীপে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি বিনির্মাণ এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন

১২.১ প্রেক্ষাপট ১৮১

১২.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল নীতিমালা বাস্তবায়নে অগ্রগতি ১৮২

১২.৩ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও একটি জলবায়ু সহিষ্ণু ব-দ্বীপ জাতির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ রূপকল্প ১৮৩

১২.৪ মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা ১৮৩

১২.৫ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহিষ্ণুতার জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল ১৮৪

১২.৬ সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন ১৮৯

১২.৭ সুনীল অর্থনীতি ঘিরে সাম্প্রতিক অগ্রগতি ১৮৯

১২.৮ সুনীল অর্থনীতির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল ১৯০

রচনাপঞ্জি ১৯৩

ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি'র তালিকা ১৯৪

জিইডি প্রকাশনা তালিকা ১৯৫

সারণি তালিকা

৩.১	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ	২৪
৩.২	লেনদেনের ভারসাম্য উন্নয়ন	২৭
৪.১	দারিদ্র্যের বিভাগওয়ারি বিস্তার	৩৬
৪.২	আয় বৈষম্যের গতিধারা (গিনি সহগ)	৩৬
৪.৩	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা	৩৮
৫.১	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা	৫০
৬.১	২০৩১ এবং ২০৪১ সালে খাদ্য চাহিদা ও সরবরাহের প্রক্ষেপণ	৬৯
৭.১	বাংলাদেশ: এশিয়ার বাণিজ্যিক উদারতা ২০১৬	৮৬
৭.২	সেবা খাতের কাঠামো	১০৮
৭.৩	কর্মসংস্থানের ওপর স্বয়ংক্রিয়করণের প্রভাব: বাংলাদেশের সুবিধা, উদ্বেগ ও সমস্যা	১১৩
৮.১	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	১২০
৮.২	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সাফল্য	১২১
৮.৩	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মূল উদ্দেশ্য	১২২
৯.১	ডিজিটাল পরিমন্ডল ও সূচকে বাংলাদেশের যোগ্যতার বিবর্তন	১৪০
১০.১	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবহন খাতের লক্ষ্যমাত্রা	১৫৭
১১.১	নগর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	১৭১
১১.২	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে নগর খাতের অর্থায়ন চাহিদা ও বিকল্প উৎস	১৭৮
১২.১	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	১৮৩

চিত্র তালিকা

২.১	রূপকল্প ২০৪১ এর চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ	১০
৪.১	দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি	৩৫
৪.২	চরম দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি	৩৫
৬.১	গত ১০ বছরে মৎস্য উৎপাদনে ক্রমবর্ধিত গতিধারা	৬০
৬.২	নমুনা চাষীদের খামার-নির্দিষ্ট গড় কারিগরি দক্ষতা	৬৩
৬.২ক	বাংলাদেশে মাথাপিছু চাল গ্রহণে ক্রমনিম্নতা	৬৩
৬.২খ	বাংলাদেশে মাথাপিছু শাকসব্জি গ্রহণে উর্ধ্বগামিতা	৬৩
৬.২গ	বাংলাদেশে মাথাপিছু ডিম গ্রহণে উর্ধ্বগামিতা	৬৪
৬.২ঘ	বাংলাদেশে মাথাপিছু মৎস্য গ্রহণে উর্ধ্বগামিতা	৬৪
৬.৩	আঞ্চলিক তাপমাত্রায় পরিবর্তন	৬৮
৭.১	জিডিপি'তে বাণিজ্যের ঊর্ধ্বমুখী অংশ	৮৫
৭.২	তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়	৮৬
৭.৩	বিনিময় হারে গতিময়তা ২০১১-২০১৯ অর্থবছর	৯১
৭.৪	শিল্প বিপ্লবের গতিধারা নিরূপণ	৯৩
৭.৫	আউটপুট ও ইনপুট শুল্কের গতিধারা: বাংলাদেশ	১০১
৭.৬	একটি ভবিষ্যবাদী ট্যারিফ প্রোফাইল	১০২
৭.৭	ফ্যাক্টর ও নন-ফ্যাক্টর সেবা রপ্তানির গতিধারা	১০৬
৭.৮	সেবা রপ্তানির ভূমিকা	১০৭
৭.৯	জিডিপি'র % হিসেবে সেবা রপ্তানি থেকে আয়	১০৭
৯.১	বাংলাদেশের উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতির জন্য ত্রি-মুখী কৌশল	১৪২
৯.২	বাংলাদেশের জাতীয় উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম	১৪৪
১১.১	নগরায়ণ, নগর-অর্থনৈতিক ঘনত্ব ও জিডিপি	১৬৮
১১.২	বাংলাদেশে গ্রাম-শহর ঘনত্ব ও উৎপাদনশীলতায় পার্থক্য	১৬৮

শব্দসংক্ষেপ

ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Programme
AEOSIB	Association of Export Oriented Shipbuilding Industries Bangladesh
AI	Artificial Intelligence
ANS	Air Navigation Services
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BASIS	Bangladesh Association of Software and Information Services
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BBIN	Bangladesh, Bhutan, India, Nepal
BDP	Bangladesh Delta Plan
BERC	Bangladesh Energy Regulatory Commission
BGMEA	Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association
BIDA	Bangladesh Investment Development Authority
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BOP	Balance of Payment
BORI	Bangladesh Oceanographic Research Institute
BRT	Bus Rapid Transit
BTMA	Bangladesh Textile Mills Association
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CCTF	Climate Change Trust Fund
CFID	Centre of Integrated Development
CA	Conservation Agriculture
CIF	Climate Investment Fund
CoE	Centres of Excellence
CSE	Chittagong Stock Exchange
CSO	Civil Society Organization
CTT	Coal Transshipment Terminal
CWU	Consumptive Water Use
DOICT	Department of ICT
DSE	Dhaka Stock Exchange
EC	Electronic Commerce
ECA	Ecologically Critical Areas
EDI	Electronic Data Interchange
EEBL	Excelerate Energy Bangladesh Limited

EEZ	Exclusive Economic Zone
EFA	Education for All
EFFRA	European Factories of the Future Research Association
EPZs	Export Processing Zones
ERD	Economic Relations Division
FCG	Final Consumer Goods
FDI	Foreign Direct Investment
FIP	Forest Investment Program
FIR	Fourth Industrial Revolution
FSRUs	Floating Storage and Re-Gasification Units
FTAs	Free Trade Agreements
FY	Fiscal Year
GAP	Good Agricultural Practices
GCF	Green Climate Fund
GCF	Green Climate Fund
GDP	Gross Domestic Product
GEF	Global Environmental Facility
GHG	Greenhouse Gas
GVCs	Global Value Chains
HEIS	Household Income and Expenditure Survey
HEQEP	Higher Education Quality Enhancement Project
HIC	High-Income Country
HYVs	High-Yielding Varieties
ICS	Improved Cook Stoves
ICT	Information Communications Technology
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited
IFFP	Investment Financing Facility for Private sector
INDCs	Intended Nationally Determined Contributions
ICOR	Incremental Capital Output Ratios
IoT	Internet of Things
IPM	Integrated Pest Management
IPNS	Integrated Plant Nutrition System
IPP	Independent Power Plant
IPCC	Inter-Governmental Panel on Climate Change
ISAC	Industrial Sector Adjustment Credit
ITS	Intelligent Transportation Systems
JWG	Joint Working Groups

KOICA	Korean International Cooperation Agency
LDC	Least Developed Country
LDCF	Least Developed Countries Fund
LGIs	Local Government Institutions
LLPs	Low-Lift Pumps
LMIC	Lower Middle-Income Country
LNG	Liquefied Natural Gas
MDG	Millennium Development Goals
MFIs	Micro-Finance Institutions
MFA	Multi Fibre Arrangement
MGI	McKinsey Global Institute
MIT	Middle-Income Trap
MIC	Middle Income Country
MIE	Multilateral Implementation Entity
MMT	Million Metric Tons
MOE	Ministry of Education
MoPA	Ministry of Public Administration
MSME	Micro Small and Medium Enterprises
MSY	Maximum Sustainable Yield
MTBF	Medium-Term Budget Framework
NAMA	Nationally Appropriate Mitigation Action
NBR	National Board of Revenue
NBFI	Non-Bank Financial Institutions
NDA	National Designated Authority
NEMC	National Environment Management Council
NFS	Non-Factor Services
NFE	Non-Formal Education
NGO	Non-Governmental Organisation
NIE	National Implementation Entity
NORI	National Oceanographic Research Institute
NPR	Nominal Protection Rate
NSDP	National Skills Development Policy
NSSS	National Social Security Strategy
NTVQF	National Technical and Vocational Qualifications Framework
OTI	Oman Trading International
PHN	Population Health and Nutrition
PP	Perspective Plan

PPP	Public-Private-Partnership
PSMP	Power Sector Master Plan
RD	Regulatory Duty
REDD	Reducing emissions from deforestation and forest degradation
REER	Real Effective Exchange Rate
RMG	Readymade Garment
RTI	Right to Information Act
RTAs	Regional Trading Arrangements
SAFTA	South Asian Free Trade Area
SBA	Small Business Authority
SBDA	Small Business Development Authority
SD	Supplementary Duty
SDG	Sustainable Development Goal
SEZs	Special Economic Zones
SEIP	Skills for Employment Intensive Program
SHS	Solar Home System
SMEs	Small and Medium Enterprises
SPA	Sales Purchase Agreement
SPS	Phyto-Sanitary Standards
SREDA	Sustainable and Renewable Energy Development Authority
TFP	Total Factor Productivity
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TSP	Triple Super Phosphate
TSMP	Transport Sector Master Plan
TVET	Technical and Vocational Education and Training
UGC	University Grants Commission
UMIC	Upper Middle-Income Country
UN	United Nations
USG	Urea Super Granule
VAT	Value Added Tax
VTMS	Vessel Traffic Management System
WASA	Water Supply and Sewerage Authority
WGI	Worldwide Governance Indicators
WTO	World Trade Organization

অধ্যায় ১

রূপকল্প ২০৪১:
একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতি অভিমুখে

রূপকল্প ২০৪১: একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতি অভিমুখে

১.১ উদ্দীপনাময় সূচনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাস্তববাদী ও দূরদর্শী নেতা। সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার চিন্তা-চেতনাকে অগ্রভাগে ধারণ করে তিনি স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তিনি সোনার বাংলা গড়ার এ স্বপ্ন আজীবন তাঁর হৃদয়ে লালন করেছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় "সোনার বাংলা" শব্দটির বহুল ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তিনি সর্বান্তকরণে "সোনার বাংলা" পুন:নির্মাণের চিন্তা করতেন যা তাঁর কাছে কোন রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর ছিল না। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল এই দেশটির অতীত গৌরব ও খ্যাতি সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি। তিনি জানতেন যে, কয়েক শতাব্দী আগেও বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধ এক সোনার দেশ ছিল। কৃষি উৎপাদন, সোনালি আঁশ (পাট), মসলিন, রেশম, সুতি বস্ত্র এবং মসলা রপ্তানিতে এই দেশটির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

বাংলাদেশকে দেউলিয়া করার জন্য পাক-হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যাসহ এদেশের অবকাঠামো ও সম্পদ ধ্বংস করার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ খুব নাজুক অবস্থায় পড়ে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আস্থা ছিলো এদেশের মানুষের অপার সম্ভাবনায়, যারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য দৃঢ়পণে যুদ্ধ করেছে। তিনি বীর বাঙালির ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, একদিন তারা সকল বাধা পেরিয়ে স্রোতের বিপরীতে দেশকে তাঁর স্বপ্নের উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি দৃঢ়ভাবে চাইতেন জনগণকে একত্রিত করে তাঁর কাঙ্ক্ষিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে। সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর এই স্বপ্ন প্রজাতন্ত্রের ৭২-এর সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত থেকে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরে অল্প কয়েক বছরেই তিনি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন এবং সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে মাত্র ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক অর্থনীতি পেয়েছিলেন, যার বর্তমান মূল্যমান ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তখন এক ডলারও ছিল না। কিন্তু দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো পুন:নির্মাণ এবং কার্যত অস্তিত্ববিহীন আইনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এদেশের অর্থনীতিকে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সফল হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বঙ্গবন্ধু কৃষি ও শিল্পায়নকে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন অর্থনীতির চালিকা শক্তির নির্ভরতার জায়াগা হিসেবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষি শুধু জনগণের খাদ্য সরবরাহ করবে না বরং আগামী দিনে অধিকাংশ জনগণের আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করবে। উপরন্তু, কার্যকর কৃষি ব্যবস্থা দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস করবে এবং উদীয়মান শিল্প খাতের কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করবে। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে, বঙ্গবন্ধু কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে অনেক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার কয়েকটি হলো: যুদ্ধবিধ্বস্থ অর্থনীতির পুনর্গঠন, বিনামূল্যে কিংবা রেয়াতি মূল্যে জরুরী ভিত্তিতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা, পাকিস্তান আমলে অনাদায়ী কৃষি ঋণের জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা বাতিল করা, কৃষি পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা, দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য রেশন সুবিধা চালু করা। তিনি ঐসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এই বিশ্বাস থেকে যে, দেশের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো কৃষির উন্নয়ন।

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে আধুনিক রাষ্ট্রের এক রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নে উন্নয়ন চর্চা ও চিন্তা-চেতনার ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রতিফলিত হয়েছিল। এ পরিকল্পনার

প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো: ১) দারিদ্র্য হ্রাস, ২) অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করা এবং অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতের উৎপাদন বাড়ানো, ৩) বছরে কমপক্ষে ৫.৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, ৪) অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো, ৫) ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা, ৬) বছরে কমপক্ষে ২.৫ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা, ৭) খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেছিলেন। এ পরিকল্পনার মুখবন্ধে বঙ্গবন্ধু আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, *কোনো একটি পরিকল্পনা কেবল কারিগরি এবং অর্থনৈতিক দলিল নয়, রাজনৈতিক দলিলও বটে। এর মাধ্যমে জনগণকে অনুপ্রাণিত, সংঘবদ্ধ এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরিকল্পনায় অবশ্যই জাতির জন্য একটি রূপকল্প ও তা বাস্তবে রূপায়নের প্রেক্ষিত থাকতে হবে।* সাড়ে তিন বছরের স্বল্প পরিসরে বঙ্গবন্ধু এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধির দিকে যাত্রার এক সোনালী সোপান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন এদেশের উন্নয়নের জন্য বৃহদাকার কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত: তখন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে হত্যা করে।

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ, দীর্ঘলালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ আজ তাঁরই উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। তাঁর নেতৃত্বেই দেশ এখন ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশ এখন কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ গড়ার সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে, যার সোনালি পথ নকশা এই রূপকল্প দলিল।

১.২ দ্রুত রূপান্তরের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে। এ এক অনন্য অনুকূল সময়, যখন শুধু অতীতের সাফল্য ও অর্জনের বিষয় ভাবনায় নেয়া নয়, বরং পরবর্তী ২০ বছর যে সমস্যা ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তার সমাধান ও সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণেরও সময়। একবিংশ শতাব্দীর একটি অবিসংবাদী বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটি হলো পরিবর্তন। পরিবর্তনের গতি এখানে দ্রুত ও রূপান্তরধর্মী। বাণিজ্য ও শিল্পে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায়, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং আমরা যেভাবে কাজ করি ও ব্যবসা চালাই এর সর্বত্র যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটবে, পরবর্তী অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজকে সেই পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে হবে। এছাড়া এতো দ্রুততার সাথে এই পরিবর্তন ঘটবে যে, সমাজ যদি রূপান্তরের এই অত্যাসন্ন প্লাবন মোকাবেলার প্রস্তুতি না নেয় তাহলে হয়তো আমরা আবার নতুন বিশ্বব্যবস্থায় আবদ্ধ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হবো। তাই একমাত্র সঠিক পন্থা হলো সামনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে জাতিকে এগিয়ে নেবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নেওয়া এবং বলিষ্ঠতার সাথে সম্ভাব্য সুবিধাবলির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উচ্চ-আয় ও উন্নত জাতির সাথে বিশ্বসভায় তাদের ন্যায্য আসন পেতে পারে। এগুলো সবই হতে হবে মধ্য-শতাব্দী পেরুনোর আগেই, জলবায়ু সহিষ্ণু ও প্রতিবেশ-বান্ধব একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে। ২০২১-২০৪১ মেয়াদে আসন্ন পরবর্তী দুই দশকের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের এটাই হলো অন্তর্নিহিত ও চূড়ান্ত লক্ষ্য।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ দুটি প্রধান স্বপ্ন প্রাধান্য পেয়েছে:

- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে আজকের মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।
- বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

এতে অবাক হবার কিছু নেই যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞবৃন্দ বাংলাদেশকে আজ উন্নয়নের বরপুত্র হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরে। ১৯৭০ এর দশকে উন্নয়নের হতাশাপূর্ণ নিরীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে যে দেশটিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল তার এই অপ্রতিরোধ্য উত্থান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এমডিজি অর্জনে, বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা, শিশু ও মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এর অসামান্য অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী অভিনন্দিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ আজ বিস্ময়কর উন্নয়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সক্রিয় ও ইতিবাচক উদ্যোগের মাধ্যমে মানব উন্নয়নের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন আরো গতিশীল ও দ্রুতগামী হয়ে উঠতে পারে। অর্থনীতি তাই এখন উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যাভিমুখী। সঙ্গতভাবেই সামনে নানা জটিল সমস্যা পথ রোধ করে দাঁড়াবে। তাই বলিষ্ঠ কৌশল ও অবিচলিত নীতি অঙ্গীকার হবে আমাদের পাথেয়।

বিশ্ব বণিক সম্প্রদায়ে দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এখন একটি গতিশীল প্রথম প্রজন্মের শিল্পোদ্যোক্তা জাতি, যা বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠিত কুশীলবদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। তৈরি পোশাক শিল্পের (আরএমজি) রপ্তানি সাফল্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আবার রপ্তানিকারকরা নতুন পণ্যসম্ভার নিয়ে নিত্য নতুন বাজারে ঢুকে পড়ছেন, যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রগামী জাহাজ, নিত্য ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক পণ্য, পাদুকা ও ঘরে ব্যবহার্য নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। এই অগ্রগতির ধারায় দেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলেছে। সমাজ ও অর্থনীতিতে ভবিষ্যৎ রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ তার জনমিতিক লভ্যাংশকে অপ্রতিরোধ্য মানব পুঁজিতে পরিণত করে এর বিশাল জনসম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এই অর্জন সম্ভব করতে পারে। বাংলাদেশকে তার ব-দ্বীপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপে পরিবেশগত অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত যে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে এগোতে হয় তা সকলেই অবগত। সুতরাং সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ও বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য বজায় রাখার অনুকূলে শক্তিশালী নীতি-নির্দেশনা অনুসৃত হবে। এরই ধারায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্য একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা, যা প্রবৃদ্ধিবান্ধব আর্থিক প্রজ্ঞামন্ডিত একটি সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পরিপূর্ণভাবে প্রবৃদ্ধির সাথে প্রযুক্তিগত রূপান্তর, দারিদ্র্য নিরসন ও পরিবেশগত সুরক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করবে।

রূপান্তরধর্মী এই পরিবর্তন বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব এমন একটি দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনমূলক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণ ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি গড়ে উঠবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি শক্তিশালী কর্মসূচির ওপর, যাকে বেগবান করতে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি এবং একই সাথে যা ভূমি, পানি, বন, প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য ও বায়ুর মতো মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করবে, যা সেগুলোর বিনাশ ও অবক্ষয় পরিহার নিশ্চিত করবে।

দেশকে নানাবিধ জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রূপান্তর সংঘটিত হবে এমন একটি বিশ্বায়িত অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে, যেখানে আমূল ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে, সৃষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ, সেই সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘর্ষ ও জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে মারাত্মক ঝুঁকিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এখন একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী প্রযুক্তিগত বিপ্লব বা ডিজিটাল যুগ চলমান, যা পরিণতিতে আমাদের বেঁচে থাকা জীবন ধারণ ও কাজের ধরনসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ধরনে পরিবর্তন আনবে। এই ইতিবাচক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু উন্নত অর্থনীতিতে উনবিংশ ও বিংশ শতকের পুরনো জাতীয়তাবাদী ধারার পুনরুত্থান ঘটছে এবং সেই সাথে বাড়ছে বৈশ্বিক সংঘর্ষের ঝুঁকি যা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী ২০ বছর বাংলাদেশে যে আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ঘটতে যাচ্ছে তা বিগত ২০ বছরে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে ভিন্নতর ও মৌলিক। ইতিবাচক বৈশ্বিক শক্তিগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেগুলোর সম্ভাবনা আহরণ ও সদ্ব্যবহারসহ বৈরী উপাদান নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যতে উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে, যা অতীতে সম্ভব ছিল না। একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি-সংগঠনের উপাদান হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওপরের দিকে উঠে আসার আকাঙ্ক্ষা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, টেকসই উপায়ে অংশগ্রাহী সমৃদ্ধির সাথে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন হবে আরো অর্থবহ উদ্ভাবনমূলক কৌশল, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সমতা ও জন অংশগ্রহণ। অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির পথে ও দারিদ্র্যমুক্ত করে এর বিকাশসহ শোভন কর্মসংস্থান বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অবারিত করার উপযোগী সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

এই লক্ষ্যে দ্রুত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি বাড়াতে কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা দরকার। প্রত্যাশা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি উচ্চ-আয় দেশসমূহের কাতারে যুক্ত হবে, যখন দারিদ্র্য হবে অতীতের কাহিনী, সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় থাকবে সকলের প্রবেশাধিকার, থাকবে না বেকারত্ব ও ছদ্ম-বেকারত্ব, জনসংখ্যার শতভাগ হবে স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন এবং এদের সবাই হবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের (বিশেষ করে, শিক্ষা, শিল্প ও সেবা) সকল ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানের অধিকারী। এগুলোর সবকিছু অর্জিত হবে পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে, যা ভূমি, পানি ও বনসম্পদ সংরক্ষণসহ পরিচ্ছন্ন বায়ু, নিরাপদ পানি, সবুজ মাঠ ও জীববৈচিত্র্যে জনগণের অধিকার অবাধ করবে।

১.৩ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক

দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নিরসন; ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩ শতাংশেরও নিচে নামিয়ে আনা;
- ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জন;
- রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে শিল্পায়ন কাঠামোগত রূপান্তরকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে;
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তরের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে;
- ভবিষ্যতের সেবা খাত গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকে প্রাথমিকভাবে শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সেতুবন্ধন রচনা করবে;
- একটি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা কৌশলের অপরিহার্য অংশ হবে নগরের বিস্তার;
- একটি অনুকূল পরিবেশের অপরিহার্য উপাদান হবে দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, যা দ্রুত, দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ; এবং
- একটি দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশকে জ্ঞানভান্ডার দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উল্লিখিত লক্ষ্য ও মাইলফলক অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মপদ্ধতি ও কৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। নির্ধারিত দুই দশকের দীর্ঘ মেয়াদে চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এই কৌশলগুলো বাস্তবায়িত হবে, যা জাতিকে তার বর্তমান অবস্থা (নিম্ন মধ্য-আয়) থেকে ২০৪১ নাগাদ উচ্চ-আয় দেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে। এই সময় বাংলাদেশকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করতে হবে তা হচ্ছে স্বল্পোন্নত ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দেশের তালিকা হতে বেরিয়ে আসতে হবে। তবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হয়ে আসা সব সমস্যার সমাধান নয়। উদ্বেগের বিষয় এই যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পরিচালিত গতানুগতিক প্রক্রিয়া ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকার বাইরে নিয়ে আসতে পারলেও এ ধরনের গতানুগতিক প্রক্রিয়া আরো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে তেমন সহায়ক নাও হতে পারে। এলডিসি'র বাইরে আসার এবং "নিম্ন মধ্য-আয়" দেশের বর্তমান অবস্থা থেকে "উচ্চ মধ্য-আয়" দেশের অবস্থায় উত্তরণ ঘটানোর বিষয়টি এক নয়। সুতরাং, আরেকটি চ্যালেঞ্জ হবে "মধ্য-আয়ের ফাঁদ" এড়িয়ে চলা। এগুলোর সব কিছু ছাপিয়ে বাংলাদেশের জন্য যে কাজটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হবে তা হলো ২০৩০ মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতিও বেশ সমস্যাকীর্ণ হয়ে আসছে। এগুলো থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশকে আগামী দিনগুলোতে এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অসামান্য উদ্যোগ ও তৎপরতা যুক্ত করতে হবে।

অধ্যায় ২

একটি উচ্চ-আয় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ

একটি উচ্চ-আয় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ

২.১ প্রতিষ্ঠানই উন্নয়নের প্রাণশক্তি

শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান দ্বারাই চালিত হয় সমাজের দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। দিন শেষে দেখা যায়, সকল প্রকার ও প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানই হলো সমাজের সমৃদ্ধি বা অবক্ষয়ের নির্ধারক। নেতৃস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, আজকের উন্নত দেশগুলোর প্রতিটিতে ছিল শক্তিশালী ও সক্ষম প্রতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামোর সুবিধা যা দীর্ঘ সময় পরিধিতে সেই দেশগুলোর উন্নয়ন আরো বিকশিত ও টেকসই করেছে। এই যুক্তি অনুযায়ী, অনুন্নয়ন হতে পারে দুর্বল ও অকেজো প্রতিষ্ঠানেরই পরিণতি। সার্বিকভাবে, বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, দেশে দেশে সাধারণ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ভিন্নতা থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আয়ের স্তরে ভিন্নতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রতিষ্ঠানই হলো উন্নয়ন স্তরের প্রধান নির্ধারক। বহু দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে অন্যের চেয়ে পিছিয়ে পড়ার আসল কারণ হলো প্রবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো হয় সেখানে অনুপস্থিত অথবা অকার্যকর।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কেননা সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণকারীদের অনুকূলে প্রণোদনা আসে এখান থেকেই। বিশেষ করে, এগুলো ভৌত ও মানব পুঁজিতে বিনিয়োগ প্রভাবিত করা ছাড়াও উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির লালন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন বিকশিত করে। উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সেখানকার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের অবস্থা উন্নত দেশগুলি ও তাদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। কিছু সংখ্যক দেশকে রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল পেরোতে হয় এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সম্পন্ন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকতর সফল পথে এগিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অনুরূপ একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাই পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সবার আগে দরকার এর প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনরুজ্জীবন যা অভীষ্ট অনুযায়ী টেকসই উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে।

এছাড়া, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা সাধারণত এখান থেকেই ঠিক করা হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব কীভাবে হবে এবং অগ্রগতির পথে দেশকে এগিয়ে নিতে এর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কীভাবে সচল করা হবে। বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকেই রাজনৈতিক, নির্বাহী ও বাণিজ্যিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, যা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের (প্রশাসনিক, বিচারিক, অর্থনৈতিক ও বাজার সংশ্লিষ্ট) সৃজন ও সংস্কারে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির শক্ত ভিত্তি নির্মাণ করে। এ ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিভিন্ন জাতির স্থায়ী অগ্রগতির দীর্ঘমেয়াদি পরিপালনে বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিবাচক প্রভাব ছিল।

সকল সমাজে রাষ্ট্রকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। উন্নয়ন বিকশিত করে এমন বহু প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত। বিনিয়োগ পরিবেশসহ বাজার পরিচালনায় যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ও ইতিবাচক প্রভাব থাকে, এগুলোর পরিচর্যায় রাষ্ট্রের সক্ষমতাকে তাই সমাজের সুষ্ঠু প্রবৃদ্ধি ও বন্টন ব্যবস্থা নিরূপণে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকরূপে গণ্য করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য রেখার নিম্ন থাকা জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশের দারিদ্র্য নিরসন ও দ্রুত অগ্রগতির জন্য সুশাসন একটি অপরিহার্য শর্ত। তাই সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক কার্যকর প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সুবিধা বিধান রাষ্ট্রের কৌশলগত দায়িত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ যদিও বাজারমুখী উন্নয়নের পথ বেছে নিয়েছে, তবুও রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব রয়েছে কার্যকর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের পরিচর্যায়, যা ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য অভিযানে সমর্থন যোগাবে। দক্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে "সোনার বাংলা" স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে দেশ তথা এর জনগণ বঞ্চিত হবে ।

২.২ রূপকল্প ২০৪১ এর প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

রূপকল্প ২০৪১ চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে জনগণ সম্মিলিতভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে (চিত্র ২.১)। এগুলো হলো: (১) সুশাসন; (২) গণতন্ত্রায়ণ; (৩) বিকেন্দ্রীকরণ; ও (৪) সক্ষমতা বিনির্মাণ। ২০৪১ সালের মধ্যে ১২,৫০০ মার্কিন ডলার সমতুল্য মাথা পিছু আয়ের সাথে একটি উন্নত জাতি হিসেবে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অভিযাত্রার মূল ভিত্তি হবে এই চার স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলোর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো জনগণকে সম্পৃক্ত

করা - (১) অধিক সংখ্যক মানুষকে সরকারি সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা এবং যে সেবাসমূহ তারা পেয়ে থাকে মানগত দিক হতে সেগুলোর আরো উন্নতি নিশ্চিত করা; (২) কীভাবে দেশ পরিচালিত হবে এবং কে তাদের পক্ষে দেশ পরিচালনা করবে- এ ব্যাপারে সকল বয়স্ক নাগরিকগণ নিয়মিতভাবে তাদের পছন্দ জ্ঞাপন করতে পারবেন; (৩) প্রশাসনিক কাঠামোর নিম্ন স্তরের (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ছাড়াও বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) জনগণ যাতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) ও সম্পদ (অর্থ) সুবিধা পায়; এবং (৪) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ যাতে আরো ভালোভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারে- এজন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানো।

চিত্র: ২.১: রূপকল্প ২০৪১ এর চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ

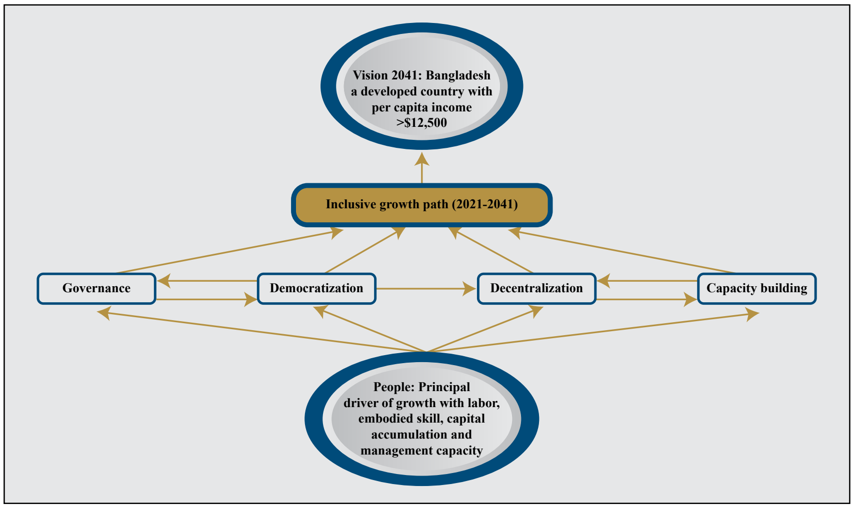

এই চারটি স্তম্ভের সম্মিলন দেশকে ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যখন বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ এবং এর মাথাপিছু আয় হবে ২০১৯ সালের মার্কিন ডলারের মূল্যে ১২,৫০০ ডলার বা ততোধিক।

২.৩ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন

টেকসই, অংশগ্রাহী, দারিদ্র্যনিরোধী উন্নয়ন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমন্বয়ে গঠিত: (১) আইনের ভিত্তি; (২) সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ সহায়ক নীতি পরিবেশ; (৩) জনগণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ; (৪) অরক্ষিতদের সুরক্ষা; এবং (৫) প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা। প্রতিষ্ঠান এই উপাদানগুলোর সমন্বয়ের সুফল আহরণকে সহজতর করে। প্রতিষ্ঠান যতো বেশি কার্যকর, উন্নয়নের সুফল ততোধিক বেশি। উন্নয়ন তৎপরতা থেকে উপকার পেতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেয় প্রতিষ্ঠান। কেননা প্রতিষ্ঠানই হলো মধ্যবর্তী অঙ্গ যার মাধ্যমে আইন ও নিয়মকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করা হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এগিয়ে নেয়া হয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডগলাস নর্থ (১৯৯১) প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, "প্রতিষ্ঠান হলো মানবিকভাবে উদ্ভাবিত বাধ্যবাধকতা যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার কাঠামো হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে দুই ধরনের বাধ্যবাধকতার সমন্বয়ে- অনানুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা (লোকাচার, সংস্কার, প্রথা, ঐতিহ্য ও আচরণবিধি) এবং আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা (সংবিধান, আইন, সম্পত্তিতে অধিকার)।" সামাজিক রূপান্তরে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক প্রভাব বিষয়ক এই উপলব্ধির আলোকে পরবর্তী দুই দশক অন্তবর্তীমূলক উন্নয়ন ধারা সম্মুখবর্তী করতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ভূমিকার ওপর সবিশেষ জোর দেয়া হবে।

ক) অর্থনৈতিক প্রশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠান এবং প্রবৃদ্ধিতে এর অবদান

গত এক দশক যাবৎ বাংলাদেশের সম্মানজনক প্রবৃদ্ধির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, যা অভ্যন্তরীণ (আর্থিক) এবং বহিঃস্থ (লেনদেনের ভারসাম্য) দুটোরই স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক

স্থিতিশীলতার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি সবার জানা। গবেষণায় এটি দেখানো হয়েছে যে, মূল্যস্ফীতির উচ্চ হার (একক সংখ্যার ঊর্ধ্বে) প্রবৃদ্ধিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মুনাফায় অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, যা পুঁজি সংগঠনে এক অনুৎসাহী পরিস্থিতি তৈরি করে। এছাড়া মূল্যস্ফীতির ফলে একটি স্থিতিশীল অথচ প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, যা মজুরি হারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিসহ উদারতার সুফল ধরে রাখতে দেশের সক্ষমতাকে ব্যাহত করে।

এই প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রশংসার দাবিদার বাংলাদেশের সেই সব প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী যারা এই লক্ষ্যকে মিলিতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বেসরকারি খাত (বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প), সরকার (বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো) এবং কর্মজীবী জনগোষ্ঠী (দেশের ভেতরে তৈরি পোশাক শিল্পে যারা কাজ করেন এবং প্রবাসে উন্নত দেশগুলোতে শ্রমের বিনিময়ে যারা আয় করে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠান)।

খ) বিশ্ববাজারের সাথে কৌশলগত বাণিজ্য আত্মীকরণের অঙ্গীকার

বাজার অর্থনীতিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। পরিবর্তন যা হয়েছে তা হলো বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জাতিসমূহের কৌশলগত বাণিজ্যের আত্মীকরণ যা বিশ্বায়নের লক্ষণবাহী এবং বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীব্যাপী উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে প্রণোদনা তৈরিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বের সর্বত্র বাণিজ্যই আয় প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে সক্রিয়। এছাড়াও এতে সংযোজিত হয় বিভিন্ন দেশের পুঁজি ও বিনিয়োগ প্রবাহ, ফলে তা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিশ্ববাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যা পণ্য ও সেবা উৎপাদন সংশ্লিষ্ট মূল্য শিকলের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত।

পরবর্তী বছরগুলোতে এই বিস্তৃত বিশ্ববাজার থেকে উপকার আহরণকল্পে বাংলাদেশে উদার বাণিজ্য, পুঁজি বাজার ও বিনিময় ব্যবস্থা বজায় রাখা আবশ্যক, যাতে বিশ্ব বাজারের আত্মীকরণকে দেশের অভ্যন্তরে উচ্চতর প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তর করা যায়। মুক্ত বাজার সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ের সামনে বিশাল বিশ্ববাজারে প্রবেশসহ সরবরাহ, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন বৃদ্ধি দ্বারা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা মেলে ধরে। তদুপরি, বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক সংযোগ বিশ্ববাজার পরিস্থিতির সাথে অভ্যন্তরীণ মূল্য সমন্বয়েও সহায়ক হয়, যাতে নিরূপিত মূল্যে পণ্য ও সেবার দুষ্প্রাপ্যতা-মূল্যে প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও উন্নত প্রণোদনা ও সুবিধাদির ফলে উদ্যোক্তাদের পক্ষে অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পদ ব্যবহার সম্ভবপর হয়। আজকের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নির্দেশ করে। এখন সময় এসেছে যখন তৈরি পোশাক -বহির্ভূত অপর প্রায় ১৩০০ রপ্তানি পণ্যসম্ভার বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেবার জন্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে রপ্তানি তৎপরতা বৃদ্ধি করায় যা তৈরি পোশাক খাতের মতোই লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। অদূর ভবিষ্যতে বাণিজ্যনীতির মূল ভিত্তি হবে রপ্তানির বহুমুখীকরণ। এজন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই বিদেশে নতুন বাজারে প্রবেশের সকল সুযোগ লুফে নিতে হবে এবং সেই সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নীতিরও পুনর্বিন্যাস এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ পণ্য বিক্রয়ের মধ্যে প্রদত্ত প্রণোদনা পর্যাপ্তভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এটি তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানিমুখী পণ্যের উৎপাদনে পর্যাপ্ত প্রণোদনা প্রদান করবে। উচ্চ শুল্ক সুরক্ষার মাধ্যমে মুনাফায় ব্যবধান কৃত্রিমভাবে উঁচুতে রেখে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য বিক্রয়ের এ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হবে।

এই রপ্তানি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান ছাড়াও সরকার বিশেষ করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চলের মতো সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি অধিকতর আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যদিও বাংলাদেশে এখনো দুটি পুঁজিবাজার চালু রয়েছে- ১৯৫৪ সাল থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং ১৯৯৫ থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই), অন্যান্য দেশগুলোতে পুঁজিবাজার যে ভূমিকা পালন করে থাকে, এগুলোর পক্ষে এখনো সেই ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়নি। এই দুটি পুঁজিবাজাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে ইকুইটি বাজারে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সমাবেশে তারা আরো বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি এককভাবে ব্যাংক ঋন ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতেও সহায়ক হবে।

গ. ভূমি বাজার, সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার, শ্রম আইন ও কর্মপরিবেশ

দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সম্পত্তিতে কার্যকর স্বত্বাধিকারসহ দক্ষ ভূমি বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জমি, ব্যবসায় ও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক হলো সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার। জমি, শ্রম, পুঁজি, পণ্য ও সেবার লেনদেনে প্রচলিত বিপণন সংশ্লিষ্ট আইনকানুন বৈচিত্র্যপূর্ণ। চলমান কাঠামোগত রূপান্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই আইনগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা, সমন্বয় সাধন ও সংশোধন করা হলে তা সার্বিক বিষয়ের অগ্রগতিতে সহায়ক হবে। শ্রম ও শিল্প আইনের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশের সুরক্ষায় শ্রমিকদের অধিকার, ন্যূনতম মজুরি, প্রশিক্ষণ ও শ্রম গতিশীলতা, অন্যত্র হতে আসা শ্রমিকদের সুরক্ষা- এর সবগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

দক্ষতার সাথে বাজার পরিচালনার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অনুসরণ করা হবেঃ (১) কার্যকর ভূমি ব্যবস্থা ও প্রশাসন, (২) ২০১৩-এর সংশোধনী সহ শ্রম আইন ২০১০ এর কার্যকর বাস্তবায়ন, (৩) বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ সহ সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার রক্ষা, এবং (৪) প্রবেশের সকল বাধা অপসারণ করে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রেখে মুক্ত বাজার নীতির পরিচালনা নিশ্চিত করে বিপণন নিয়ন্ত্রণমূলক আইন। "ভূমি ব্যবস্থাপনার মান" হবে এর বিমূর্ত নির্দেশক।

ঘ. কর ব্যবস্থাপনা

বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানিক সুবিধার জন্য প্রয়োজন সম্পদ। আবার সম্পদ আহরণ একান্তভাবে নির্ভরশীল কর প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতার ওপর। বিশ্বের অনেক দেশেই, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে কাজ করে না। কর সংগ্রহের পরিমাণ যখন অন্তহীনভাবে নিম্ন, তখন দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনার অনুকূলে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে থাকে না। দুর্বল কর সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে সুপরিচালিত বাজারের অধোগতিকে ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশে কর ভিত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। নতুন করদাতাদের অন্তর্ভুক্তি এবং বর্তমান করদাতাদের তাদের প্রদেয় কর যথাযথভাবে পরিশোধে উৎসাহ দিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে। কর ভিত্তি সম্প্রসারণের কোন বিকল্প হয় না। কোন দেশের পক্ষেই উন্নত হওয়া বা উচ্চ-আয় দেশ হওয়া সম্ভব নয় যদি না সেখানে একটি আধুনিক ও ডিজিটাল কর ব্যবস্থার আওতায় একটি বিস্তৃত কর ভিত্তি গড়ে তোলা যায়। নিম্নতম কর-মোট দেশজ আয় অনুপাতের দেশগুলোর মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। কর ব্যবস্থার সংস্কার তাই সময়ের দাবি, বিশেষ করে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় কর সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতার জন্য আশু সংস্কার প্রয়োজন। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ক্রমবর্ধনশীল সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য পরবর্তী দশক ব্যাপী কর ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সম্পন্ন করা হবে।

ঙ. বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসন

একটি শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা যে কোন দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, যা সকল উন্নয়নশীল দেশেই গড়ে তোলা দরকার। এমনকি কিছুটা ত্রুটিসম্পন্ন বিচার ব্যবস্থা ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হলেও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে সহায়তা করে। বিচারিক রায় কতো দ্রুত পাওয়া গেল এটি কোন বড় কথা নয়, বরং তা কতটুকু ন্যায়ানুগ ও পক্ষপাতহীন হলো-সেটাই আসল। এজন্যে প্রয়োজন বিচারকদের যুক্তিসঙ্গতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া, বিচার ব্যবস্থাকে বিচারকদের বিধি বর্হিভূত আচরণ থেকে দূরে রাখা এবং বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও কার্যকর সক্ষমতার প্রতি আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগকে শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে একটি স্বাধীন, পৃথক, কার্যকর, দক্ষ, ন্যায্য, পক্ষপাতহীন, দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি ও জনবান্ধব বিচার ব্যবস্থার জন্য অন্তহীন অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। ২০৪১ এর জন্য এই হলো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত। নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ সরকারের এই তিনটি অঙ্গের স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের বিকাশ। তবে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা (ব্যক্তিগত, বাস্তব, অভ্যন্তরীণ ও যৌথ) রক্ষা করা এমনকি উন্নত দেশেও একটি বড় সমস্যা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হলো সরকারসহ সকল কিছুর প্রভাবমুক্ত থাকা, বাস্তব স্বাধীনতা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অর্থ উর্ধ্বতন ও সহকর্মীদের থেকে স্বাধীনতা এবং যৌথ স্বাধীনতার অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা। অন্য কথায়, বিচার ব্যবস্থাকে হতে হবে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭, ৩৫(৩) এবং পর্ব ৪ এর অনুচ্ছেদ ১১৬ (ক)-এ বিচার

বিভাগের স্বাধীনতা প্রদানের বিধান রয়েছে এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২২, ৯৫(১), ১০৭, ১১৩, ১১৫ ও ১১৬ তে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন চ্যালেঞ্জ হলো সংক্ষুব্ধজনের অনুকূলে স্বাধীনভাবে, সততা ও দক্ষতার সাথে বিচার ব্যবস্থা যেন দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলির সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো হলো: মামলাজট, জনবলের মান, স্বল্প প্রণোদনা, মামলাবাজদের সংখ্যাধিক্য, আইন সংক্রান্ত জ্ঞান ও সক্ষমতার অপ্রতুলতা।

যথাযথভাবে পরিচালিত বিচার ব্যবস্থা বিনিয়োগকারীদের (দেশি ও বিদেশি উভয়েরই) আস্থা বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগ কর্মসূচি পরিচালনা ও বিস্তারের জন্য দরকার হলো অন্য কোন পক্ষের অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে তার বিনিয়োগ নিরাপদ রাখা। এরূপ কোন উদ্যোগ নেয়া হলে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই আদালত হতে ন্যায্য রায় পাওয়া যাবে। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ আদালতের আদেশসহ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত অন্যান্য আইনের বাস্তবায়ন হবে। যেহেতু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক এই দায়িত্ব পালন করা হয়, তাই জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সমাজের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

চ. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

বহুত্ববাদী গণতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের স্তম্ভ হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই নিশ্চিত করে না, সেই সাথে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের অনুকূল পরিবেশও তৈরি করে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং সুন্দর ও সুষম প্রতিনিধিত্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিপক্বতা আনে। নীতিগতভাবে রাজনৈতিক দলসমূহ হলো গণতন্ত্রের অভিভাবক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের রক্ষক। জাতির বিভিন্ন বিষয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সকল রাজনৈতিক দলের উচিত বহুত্ববাদী রাজনীতির ধারণাকে উচ্চে তুলে ধরা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর চ্যালেঞ্জ হলো রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান উন্নত করা। জীবনের নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা বিধানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। স্বাভাবিক প্রাতিষ্ঠানিক রীতি অনুযায়ী সকল বৈধ রাজনৈতিক দল কোন প্রকার ভীতি বা অনুগ্রহ ব্যতিরেকেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। আসল সমস্যা হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা, যাতে তারা দেশকে টেকসই উপায়ে স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের নীতির প্রতি অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

ছ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রের পেছনে যৌথভাবে বেসরকারি সংস্থা/নাগরিক সমাজ তৃতীয় রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান গড়ে তুলেছে। অতীতে বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে নাগরিক সমাজ আন্দোলনের প্রভাব থাকলেও সামষ্টিক পর্যায়ে এর প্রভাব ছিল অতি সামান্য। ভবিষ্যতে নাগরিক বা সুশীল সমাজ যে পন্থায় এগোতে চায় সেখানে কিছু প্রতিষ্ঠানগত ও নীতিগত বিষয় প্রভাব রাখবে। একটি একীভূত আইনগত কাঠামোর প্রসঙ্গ এখানে বিবেচনায় চলে আসে। তবে উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ যাতে অবরুদ্ধ না হয়ে পড়ে সেদিকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলোর (সিএসও) বিস্তৃতি ও বৈচিত্রের ওপর সীমা আরোপ না করে বাংলাদেশ ভালো করেছে। এ সংস্থাগুলোর অনেকেই বাণিজ্যিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্যে এগিয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ২০৪১ সালের অভীষ্ট হলো: "সকল সিএসও উচ্চমানের বড় ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিপক্বতা অর্জন করবে, কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক উত্তম কর্মসম্পাদনে দক্ষ হয়ে উঠবে এবং এদের সবগুলোকেই স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায় রীতির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করা হবে"। এভাবে ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে একটি পর্যায়ে মাইলফলক প্রাপ্তির মর্যাদা লাভ করবে।

জ. জেন্ডার বা নারী-পুরুষের সমতা

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের আধিপত্য রয়েছে। নারী শিক্ষাসহ শিশু মৃত্যুহার, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার, জন্ম হার এবং ঋণপ্রাপ্তিতে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য উন্নতি হয়েছে। তবে যে ক্ষেত্রগুলোতে এই কাম্য রূপান্তরের ছোঁয়া এখনো লাগেনি, সেগুলো হলো - সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার, উত্তরাধিকার, আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা, সরকারি

চাকুরি, সংসদ, স্থানীয় সরকার, সরকারি স্থানে অভিগম্যতা, আইন প্রয়োগ, আইনি পেশা, ক্রীড়া, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, প্রজননগত স্বাধিকার, সন্তান নেয়ার সিদ্ধান্ত, বিবাহ বিচ্ছেদ, পৈত্রিক কর্তৃত্ব, লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট ও অন্যান্য। এই ক্ষেত্রগুলোতে লৈঙ্গিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারের নীতিই পারে পরিবর্তনের গতি বৃদ্ধি করতে ও তা বজায় রাখতে।

ঝ. বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান- ডব্লিউটিও

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বিশেষভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা বাণিজ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। ডব্লিউটি'র নির্যাস হলো একটি চুক্তিনামা যার সাহায্যে বহুপাক্ষিকভাবে সম্মত একগুচ্ছ বিধিমালা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে এগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত দু'টি মৌলিক নীতির ওপর স্থাপিত পারস্পরিক সমভূমিকা বা অধিকার যার অর্থ হলো কোন দেশের শুল্ক হারে হ্রাস দ্বারা এটি প্রত্যাশিত যে অন্যান্য দেশেও সমপরিমাণে শুল্ক হার কমিয়ে আনবে; এবং বৈষম্যহীনতা- এর অর্থ সকল দেশ অবশ্যই অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে একই শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হবে। ডব্লিউটিও'র প্রথম কাজ হলো বাণিজ্যনীতি সংস্কারে আগ্রহী দেশগুলোকে সহায়তা দান, অন্যথায় তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। ডব্লিউটিও'র থেকে দ্বিতীয় যে কাজটি করা হয় সেটি হলো নির্বাচকমন্ডলী তৈরিতে সহায়তাদান, যা শুল্ক হ্রাসের অনুকূলে রাজনৈতিক সমর্থনসহ বাণিজ্যের জন্য অর্থনীতিকে অবাধ করে। তদুপরি, বিশ্ববাণিজ্যে এলডিসিগুলোর সংশ্লিষ্টতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ডব্লিউটিও কাজ করে চলেছে। একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্যে কতিপয় অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধার উপকার ভোগ করে আসছে। তাৎপর্যপূর্ণ রপ্তানি সাফল্য অর্জনে বাংলাদেশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এসব সুবিধা ব্যবহার করে। এই ধারা পরবর্তী দুই বা ততোধিক দশক জুড়ে অব্যাহত রাখতে হবে। তবে ২০২৪ সালের পরে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার কঠিন চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবেলা করার জন্য এর বাণিজ্য সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক নীতিমালা নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হবে।

২.৪ প্রতিষ্ঠান সংস্কারের চ্যালেঞ্জসমূহ

সংস্কারমনা সরকারগুলির উচিত জনমত গঠনসহ পরিবর্তনের পথে অন্তরায়গুলো দূর করা এবং একটি দক্ষ সরকারি খাত নির্মাণকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা অব্যাহত রাখার যাবতীয় সুযোগ সদ্ব্যবহার করা। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে আমূল সংস্কারসাধন থেকে ব্যাপক সুফল মিলবে। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত উন্নয়নের জন্য সুশাসনই হলো প্রেরণার মূল মঞ্চ। গণতন্ত্রায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ধীরগতিসম্পন্ন, ক্রটিযুক্ত, সংকর, পূর্ণবিকশিত ও বহুত্ববাদী হতে পারে। বাংলাদেশ অবশ্য বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বহুত্ববাদী গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত, আরো আনুষ্ঠানিকভাবে বললে, সরকারি কাঠামোর সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত যতদিন না প্রশাসনিক, আর্থিক (রাজস্বসহ) এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হয়, ততদিন বাংলাদেশের পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়াও সম্ভব নয়।

বহুত্ববাদী গণতন্ত্র, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তনশীল অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্ষমতা বিনির্মাণের গুরুত্ব অপরিমেয়। এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো: সঠিক কাজের জন্য সঠিক প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান, অর্পিত দায়িত্ব যাতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক ক্রান্তিকালে ব্যবস্থার উপযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পরিশেষে, এটি নিশ্চিত করা যে, প্রাতিষ্ঠানিক গতি অব্যাহত থাকবে এবং তা কোন প্রকার মধ্যবর্তিতা বা প্রথাগত রীতির ফাঁদে আটকা পড়বে না। প্রকৃত প্রবৃদ্ধি তখনই টেকসই হবে যখন প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়, যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সহজতর করে।

২.৫ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সুশাসনের অবস্থা

মাসট্রিক্ট ক্রাইটেরিয়া নামে বহুল পরিচিত মানদন্ড অনুযায়ী কতিপয় লক্ষ্য সামনে রেখে সাধারণভাবে বাংলাদেশের ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এগুলো হলো: (১) নিম্ন ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি (বাংলাদেশের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির মাত্রা বৈশ্বিক গড়ের উর্ধ্বে হলেও তা দেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে বিশেষ করে প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ); (২) দীর্ঘমেয়াদি নিম্ন সুদ হার (বৈশ্বিক গড়ের উর্ধ্বে, তবে মুদ্রাস্ফীতি মাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ); (৩) মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) তুলনায় নিম্ন জাতীয় ঋণ (২০১৯ তে মোট দেশজ আয়ের সরকারি ঋণের অনুপাত ছিল ৩৪% যা সমগোত্রীয় দেশগুলোর অনুরূপ); (৪) নিম্ন ঘাটতি (২০১৯ তে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল জিডিপির ৫%, যা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যেই

ছিল); এবং (৫) মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা (নিয়ন্ত্রিত অবাধ লেনদেনের প্রয়োজনে ২০০৩ সালে বিনিময় হার ব্যবসা বছর ভিত্তিক করার পর থেকে কিছু দিনের বাংলাদেশি টাকা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে)। তাই দেখা যায়, মধ্য-মেয়াদে বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য ঈর্ষণীয়, তবে স্বল্পমেয়াদি সমস্যাগুলো মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তৎপরতাকে ব্যাহত করতে পারে।

ক. মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

পরিকল্পনা কাঠামো ও বাজেট সংযুক্তির দিক থেকে সমপর্যায়ের দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও বাজেট ও অর্জিত ফলাফলের তাল মেলানোর ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ও মালয়েশিয়ার মতো অন্যান্য এশীয় দেশগুলির তুলনায় দেশের বাজেটের সাথে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকবে। তবে এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ সত্ত্বেও সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো এখন পর্যন্ত দুর্বল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রকৃতির কারণ হলো বার্ষিক বাজেট ও মধ্য-মেয়াদি ব্যয় কাঠামোর সাথে বিশেষ করে প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন সক্ষমতা ও আর্থিক প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব।

২০৩১ সাল পর্যন্ত স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বাস্তবায়ন কাঠামোর অংশ হবে দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, যার উদ্দিষ্ট হবে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছানোর লক্ষ্য অর্জন করা। ২০৩১-উত্তর দীর্ঘ-মেয়াদি সময়কালে পরিকল্পনা কমিশনের করণীয় হবে রূপকল্প, সংশ্লিষ্ট নীতি এবং কৌশলসমূহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিফলন করা।

খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

শাসন ব্যবস্থার যে তিনটি মৌলিক নীতির ওপর জোর দিয়ে সুশাসনের একটি সচল ধারা গড়ে তুলতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলি হলো: (১) আইনের শাসন নিশ্চিত করা; (২) রাজনৈতিক পক্ষপাত পরিহার; (৩) একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মধ্যবর্তী অংশে বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অবস্থা একটি মিশ্র চিত্র তুলে ধরে, যেখানে শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছুটা অগ্রগতি হলেও উন্নয়নকে অগ্রগামী করে এমন বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকেও সামনে নিয়ে আসে। কেননা, প্রথমে উচ্চ ও মধ্য-আয় দেশের এবং পরে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে অগ্রসর হতে হবে তা বেগবান করতে এটি জরুরি।

চারটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ একটি উন্নত শাসন ব্যবস্থা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল: (১) সিভিল সার্ভিস বা জনপ্রশাসনকে শক্তিশালী করা; (২) স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ বিকশিত করা; (৩) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) শক্তিশালী করা; এবং (৪) পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সংস্কার সাধন। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ অনুযায়ী রূপকল্প ২০২১ এর মাইল ফলক অর্জন শাসনব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট যেসব মূল সমস্যাবলি সমাধানের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, এগুলো হলো: (১) জনপ্রশাসনে সক্ষমতার অভাব; (২) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি; এবং (৩) যথাযথভাবে কর্মসম্পাদনে দুর্বলতাসমূহ যা জনপ্রশাসনের কাজের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশ ২০৪১: প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কৌশল

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত অভিঘাত হবে প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিবৃদ্ধির ওপর। সাধারণভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে জোর দেয়া হবে সেগুলো হলো: (১) পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান; (২) শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (৪) গঠনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-বিশেষ করে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন করে এমন প্রতিষ্ঠান; (৫) বিকেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠান; এবং (৬) সক্ষমতা বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের উপ-শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ক) লৈঙ্গিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠান; (খ) আইন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; (গ) বিচার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; (ঘ) জনপ্রশাসন সক্ষমতা - নির্বাহী, আমলাতন্ত্র এবং আইনের শাসন; (ঙ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; (চ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান; (ছ) ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠান; (জ) মানব পুঁজি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান - মৌলিক শিক্ষা ও দক্ষতা; (ঝ) প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং (ঞ) বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

ক. পরিকল্পনা

২০৩১ পর্যন্ত স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে: সরকারের মধ্য-মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) ও বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যাতে অর্থনীতির ২০৪১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে নিয়মিত পরিবীক্ষণসহ এর গতিধারা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যায়।

২০৩১ উত্তর দীর্ঘমেয়াদে: এই মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উভয় দলিলের রূপকল্প, কৌশল এবং নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ।

খ. শাসন ব্যবস্থা

মহাহিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল), পাবলিক অ্যাকাউন্টস সরকারি হিসাব সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারি কর্ম বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, আদালত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করার ওপর সমধিক জোর দেয়া হবে। তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) ২০০৯ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য এই আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আয়ের উচ্চাভিলাসী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদেশি বিনিয়োগসহ বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে আর্থিক প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন, ভূমি প্রশাসন, নগর প্রশাসন, কর্পোরেট প্রশাসনসহ চুক্তি বাস্তবায়ন ও বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে বিচারিক ব্যবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হবে। ২০৪১ অভিমুখে এই অগ্রযাত্রার পথে ভূমি ও নগর প্রশাসনে ২০৩১ পর্যন্ত অগ্রাধিকার অব্যাহত থাকবে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে এই অগ্রাধিকার অব্যাহত থাকবে ২০৪১ ও তৎপরবর্তী কাল পর্যন্ত। এ প্রচেষ্টা শিথিল করার কোন সুযোগ নেই।

২০৩১ পর্যন্ত স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে: আইনের শাসন জোরদার করার পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি হ্রাসসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, উৎপাদনশীলতা, বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ গণদাবির ভিত্তিতে একটি নিরবচ্ছিন্ন ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সার্বিক অবস্থার কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য শাসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করা হবে। একই সাথে আইন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা, বিচার বিভাগ, প্রশাসনসহ নীতিপ্রণয়ন সংক্রান্ত সকল সংস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বকে উৎসাহিত করা ছাড়াও বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হবে এবং ইলেক্টনিক-শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা হবে।

২০৩১-উত্তর দীর্ঘ মেয়াদে: বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।

গ. গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়ণ

রূপকল্প ২০৪১ এর দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থেই এটিকে যথাযথভাবে সচল রাখা অপরিহার্য। বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন একটি বহুত্ববাদী পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের নিহিতার্থ হলো একটি মিথষ্ক্রিয়া যা ক্ষমতার বিভিন্ন উৎস যেমন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, স্বার্থ গোষ্ঠী ও জনপ্রতিনিধিবর্গসহ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বিকশিত করে এমন সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার তিনটি অংশ রয়েছে: (১) অর্থনৈতিক ঐকমত্য; (২) রাজনৈতিক ঐকমত্য; ও (৩) সামাজিক ঐকমত্য।

সংক্ষেপে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অভীষ্ট হলো বহুত্ববাদী গণতন্ত্র এবং এর নীতিমালা ও কৌশল গড়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা জ্ঞাপক মূল্যবোধের ওপর। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী প্রসঙ্গে রায় দানকালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণীতে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ধারণা তুলে ধরা হয় তা হলো: "সাংবিধানিক গণতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত একটি দেশে এটি প্রত্যাশিত যে, সেখানে নিম্নবর্ণিত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলি বজায় রাখা হবে: (ক) নির্বাচনের শুদ্ধতা, (খ) শাসন ব্যবস্থায় সাধুতা, (গ) ব্যক্তিগত মর্যাদার পবিত্রতা, (ঘ) আইনের শাসনে অলঙ্ঘনীয়তা, (ঙ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, (চ) আমলাতন্ত্রের দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা, (ছ) বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সংসদের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আস্থাশীলতা, (জ) ঐ সকল প্রতিষ্ঠান যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের নৈতিক শুদ্ধতা ও শ্রদ্ধালাভের উপযুক্ততা"।

অভীষ্ট অর্জনের কৌশলসমূহ নিম্নরূপ: (১) স্বাধীনভাবে কর্মপরিচালনার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টান্ত অনুসারে ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালীকরণ; (২) নির্বাহী, আইন সভা ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা পৃথকীকরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; (৩) নির্বাচনের জন্য বৈধ ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পর্যালোচনা ও শক্তিশালীকরণ; এবং (৪) সেনাবাহিনীসহ কোন শক্তি/গোষ্ঠী দ্বারা অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক উপায়ে জবর-দখলের সম্ভাবনা পরিহার/উচ্ছেদের জন্য সাংবিধানিক ও আইনগত নিশ্চয়তা বিধান।

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা, যারা দেশকে টেকসই উপায়ে স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর সাথে সম্পৃক্ত অপর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে উৎসাহিত করা হবে।

ঘ. বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ হলো রূপকল্প ২০৪১ এর তৃতীয় স্তম্ভ। বিকেন্দ্রীকরণ একটি অত্যন্ত বিস্তৃত ধারণা। এমন বহু উপাদান/ক্ষেত্র রয়েছে যার বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- (১) রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ; (২) বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ; (৩) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ; (৪) নির্বাচকমন্ডলীর বিকেন্দ্রীকরণ, (৫) আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ; এবং (৬) আর্থিক ও পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।

বিকেন্দ্রীকরণের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমত, সকল পর্যায়ে সক্ষমতা বিনির্মাণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। দ্বিতীয়ত, যাবতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পীঠস্থান হিসেবে ঢাকায় সরকার ও প্রশাসনের এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যে কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নসহ স্বার্থবাদী মহলকে নিষ্ক্রিয় করতে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। তৃতীয়ত, শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করতে বড় ধরনের বিনিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। চতুর্থত, আইনগত কাঠামো তৈরি করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সামনে একটি স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা হবে যার অন্তর্ভুক্ত হবেঃ এর এক্তিয়ার, কর আদায়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট হিসাব, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয়-স্থানীয় ও স্থানীয়-স্থানীয় সম্পর্ক ও সংযোগ রক্ষা করা।

ঙ. সক্ষমতা বিনির্মাণ

রূপকল্প ২০৪১ এর চতুর্থ স্তম্ভ হলো সক্ষমতা বিনির্মাণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিনির্মাণের উদ্দেশ্য হলো কৌশলগত সম্পর্ক, সম্পদ উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন-পদ্ধতির ওপর প্রাধান্য দানসহ একটি পরিবর্তনশীল অর্থনীতির সাথে এগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা। এটি নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তবে আগামী ২০ বছর যে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে যেতে হবে, বিশেষ করে উচ্চ-আয় দেশের প্রলুব্ধকর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে, সেজন্য অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন হওয়া দরকার। এতে সাফল্য লাভের মূল চারটি কর্মপদ্ধতি হলো: (১) সঠিক কাজের জন্য সঠিক প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান গঠন/ক্ষমতায়ন/সংশ্লিষ্টকরণ; (২) প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ, যাতে সেগুলো সুন্দরভাবে সেবা বিতরণসহ কার্যকরভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে; (৩) প্রাতিষ্ঠানিক ক্রান্তিলগ্নে উত্তরণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং (৪) প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা অব্যাহত রাখা।

রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১০ এ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকারি কর্মচারীদের কাজের সক্ষমতা বাড়াতে দেশ ও বিদেশে নিবিড় প্রশিক্ষণ দানের জন্য একটি ক্র্যাশ কর্মসূচি পরিচালিত হয়, যাতে তারা উন্নয়নের সুফল সবার ঘরে পৌঁছাতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপক কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ২০০৯ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে ৯০০০ এর অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য ২০০০ এরও অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে বিদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন ও অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করতে পাঠানো হয়। যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এ ব্যাপারে সংযোগ স্থাপন করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনকল্পে আইসিটি দক্ষতার উন্নয়নে সমর্থন দিতে কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (কেওআইসিএ) থেকে কারিগরি সহায়তা নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অপরাপর মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি পর্যালোচনা থেকে একটি স্পষ্ট ধারণা

পাওয়া যায় যে, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ২০১৫ সালে যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এজন্য যে পরিমাণে কর্মসূচি পরিচালনাসহ আর্থিক বরাদ্দ দান করা হয়, তা ছিল ২০১০ সালের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

অনধিক ১০ লাখ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মানদন্ড নিয়ে, সরকারের "স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইন্টেনসিভ প্রোগ্রাম" ঘিরে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মাইলফলক ও অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়। ২০৪১ সালের অভীষ্ট হলো ১৪ মিলিয়ন (১ কোটি ৪০ লক্ষ) কর্মীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা। এর মাইলফলকে নির্ধারিত হয়েছে ২০২১ সালের মধ্যে ৬.৫ মিলিয়ন (৬৫ লক্ষ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবং ২০৩১ সালের মধ্যে আরো ৯ (৯০ লক্ষ) মিলিয়ন প্রশিক্ষিত কর্মীসহ এক বিশাল দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

চ. দক্ষতা উন্নয়ন: শ্রমের নিম্ন দক্ষ- নিম্ন উৎপাদনশীলতা থেকে উচ্চ দক্ষ- উচ্চ উৎপাদনশীলতায় উত্তরণ

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের অভাবে প্রতিবছর ২০ লক্ষাধিক নতুন শ্রমিকের যুক্ত হওয়ার সমস্যা সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন; সামগ্রিক শ্রমশক্তিতে নিম্ন দক্ষতার প্রাধান্য পাবে নিম্ন উৎপাদনশীলতা; প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সুবিধাবলি অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল; প্রতিযোগিতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব; এবং প্রবাসী শ্রমিকদের গড় দক্ষতা মান উন্নত না হওয়ায় তা গড় প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মতো অপরাপর এশীয় দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে।

২০৩১ পর্যন্ত স্বল্প হতে মধ্য-মেয়াদে: অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং বিদেশে বিশ্বায়ন সুবিধার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি দক্ষ উন্নয়ন নীতি ও কৌশল গঠন; দক্ষতা উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগসহ এই নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন; একদিকে জনমিতিক লভ্যাংশ সুবিধা সদ্ব্যবহারের সাথে দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বিতকরণে অন্যদিকে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা ভিত্তিক কাঠামোতে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন; দক্ষতা উন্নয়নকে রপ্তানিভিত্তিক প্রবৃদ্ধিমুখী করা, যা কর্মসুযোগবিহীন প্রবৃদ্ধি ও আসন্ন মধ্যম আয়ের ফাঁদ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কর্মসংস্থানের বৃহত্তর সুযোগ সম্প্রসারণ এবং উচ্চতর গড় প্রবাসী আয় বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতায় রূপান্তর সাধন; বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রবাহে অনাবাসী বাংলাদেশীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ; আইসিটি ও সংশ্লিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নের জন্য পিপিপি সহ বেসরকারি সম্পদ সমাবেশ করা এবং সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি; নারী সাক্ষরতাসহ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ; আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানে নারী শ্রমশক্তির বর্ধিত অংশগ্রহণ বা ব্যবসায় বাণিজ্যে নারীদের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা বিস্তার কল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০৩১-উত্তর দীর্ঘ মেয়াদে: উল্লিখিত কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে এবং বাড়তি জোর দেয়া হবে সরবরাহে চাহিদা অসঙ্গতি নিরসনসহ সকল পর্যায় ও সকল গোষ্ঠীর বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্বের সমস্যা কমিয়ে আনার ওপর; প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের সাথে দক্ষতার অভিযোজন ও উন্নয়ন; যেহেতু বাজার ভিত্তিক কর্মতৎপরতা হিসেবে দক্ষতা উন্নয়ন বিকশিত ও পরিপক্ব হয়, সুতরাং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের সিংহভাগ যাতে বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালিত হয় তা নিশ্চিতকরণ; শূন্যতা পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমের রপ্তানি সহজীকরণ; এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জনবল রপ্তানি অব্যাহত রাখা; দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইসিটি ও সংশ্লিষ্ট দক্ষতার উন্নয়নকে কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে তোলা।

ছ. প্রযুক্তি অগ্রগতির জন্য কৌশল

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজনের অপরপ্রান্তে উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। প্রযুক্তির পাঁচটি উপাদান রয়েছে- প্রযুক্তি মঞ্চ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও উৎকর্ষ কেন্দ্র; আইটি পার্ক; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইটি শিক্ষা; জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট এবং আইসিটি সেবা রপ্তানি। এটি একটি উচ্চাভিলাসী কর্মসূচি হলেও তা অর্জনযোগ্য, কেননা ইতোমধ্যেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অধীনে বহু কিছু অর্জিত হয়েছে। এর বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে-

১. অবকাঠামোগত সহায়তা- অবকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি;

২. জনবল সহায়তা- মেধা সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন;

৩. উৎকর্ষ কেন্দ্র, জাতীয় আইসিটি ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নত আইটি শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ;

৪. বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথভাবে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ;

৫. নীতিগত সহায়তা;

৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ অপরাপর সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে সরকারি-বেসরকারি ফোরাম গঠন;

৭. শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা;

৮. দীর্ঘমেয়াদি বিপণন ও বিকাশ পরিকল্পনা;

৯. পরিচিতি ও ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা;

১০. আইটি ও আইটিইএস খাতের জন্য প্রণোদনা কাঠামোর নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংস্কার;

১১. জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের জন্য শক্তিশালী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;

১২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

১৩. স্বীকৃত ও বিখ্যাত বিদেশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা বিনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ. উৎকর্ষ কেন্দ্র

উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলোতে সহায়তা দানের বিষয়টিতেও সরকারের নজর থাকবে। উৎকর্ষ কেন্দ্র দ্বারা একটি দল, একটি অংশগ্রাহী সুযোগ বা সত্তা বুঝানো হয়ে থাকে, যা একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমর্থন এবং/অথবা প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সর্বোত্তম ব্যবহারসহ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এই কেন্দ্রগুলোরও করণীয় হবে বিষয় বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সহায়তা দান, মান ও পদ্ধতি সম্পন্ন পরিচালন, প্রশিক্ষণ ও প্রত্যয়ন দ্বারা অংশগ্রাহী শিক্ষণ ফলাফল পরিমাপ, এবং সম্পদ বরাদ্দ ও সমন্বয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। আরেক ধাপ এগিয়ে উদ্ভাবনে গতি সঞ্চারকল্পে সরকার একটি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করবে।

উৎকৃষ্ট কেন্দ্রসমূহের উদ্দেশ্য হবে: (১) বিশেষ খাতে উৎপাদনশীলতার সুফল প্রদর্শনের জন্য উন্নত প্রযুক্তি সুবিধা দান; (২) দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন ও সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ সুবিধা দান; (৩) নতুন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য একটি মঞ্চ গড়ে তোলা; (৪) বিদ্যমান শিল্পকারখানাসমূহের উন্নয়নকল্পে স্বল্পমূল্যে অটোমেশন ও অন্যান্য শিল্পোন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবাদান প্রকল্প গ্রহণ; (৫) বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ পরিচর্যার অনন্য সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকায় নতুন ব্যবসায় বিকাশে সহায়তা দান; (৬) প্রয়োজন অনুযায়ী পরীক্ষণ, ক্রমাঙ্কন ও অনুরূপ সুবিধা দানের জন্য সাধারণ সেবা কেন্দ্র গঠন; (৭) যন্ত্রপাতির মেরামত ও সংরক্ষণে সহায়তা দান; এবং (৮) এই খাতে আইটি বাস্তবায়নের মডেল তৈরি ও তা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ। ২০৪১ সালের অভীষ্ট হলো অগ্রাধিকার খাতসমূহে ৩০টি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন, যা ২০২১ সালের মধ্যে ৬টি এবং ২০৩১ সালের মধ্যে ২০টি স্থাপিত হবে।

২.৬ অব্যাহত অগ্রযাত্রা

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বিষয়ক সমীক্ষা হতে এটি স্পষ্ট হয় যে সমাজে উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণে প্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মান ও সক্ষমতা পার্থক্যও বিভিন্ন দেশে আয়-মাত্রার পার্থক্য নির্দেশ করে। তবে এই পার্থক্য দীর্ঘ সময়ের জন্য টিকে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সাধন কঠিন হয়ে পড়ে। তারপরও যে দেশগুলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সংস্কারের প্রচেষ্টা নেয় তারা নিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে দ্রুত উন্নয়নের পথে এসে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র ভূ-আবদ্ধ দেশ বতসোয়ানার সাফল্য সুবিদিত। এই দেশটি শুধু আফ্রিকায় নয়, গোটা বিশ্বে বিগত ৩৫ বছরে দ্রুততম হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশটি যদিও হীরার বিশাল ভান্ডারে সমৃদ্ধ যা প্রায়শই এ ধরনের সম্পদে অভিশাপ বয়ে আনে তবুও এর শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান উন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। বিশ্লেষকদের অভিমত অনুযায়ী, বতসোয়ানা রাজনৈতিক ভারসাম্যের এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক।

২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পার্থক্য ও মাথাপিছু আয়ে বিদ্যমান পার্থক্যের প্রধান নির্ধারকসমূহ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয় বিশেষজ্ঞদের লব্ধ শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের পার্থক্য দীর্ঘসময়ব্যাপী টিকে থাকার ফলে রাজনৈতিক ভারসাম্যসহ বিভিন্ন যৌথ পছন্দের ওপর তা বিরূপ প্রভাব ফেলে। সুশাসন ও উন্নত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংমিশ্রণ থেকেই বেরিয়ে আসে উন্নত রাজনৈতিক ভারসাম্য। এভাবে অনুন্নয়ন বিষয়ে উপলব্ধি আমাদের ধারণাকে পরিচ্ছন্ন করে, কেন বিভিন্ন দেশ মন্দ রাজনীতির ভারসাম্যে আটকা পড়ার পরিণতিতে মন্দ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে থাকে। উন্নয়ন সমস্যার সমাধান পেতে হলে আগে তাই সঠিকভাবে বুঝতে হবে একটি মন্দ রাজনৈতিক ভারসাম্যের সমাজকে ভালো ভারসাম্যসহ এগিয়ে নিতে কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রয়োজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণাই বেরিয়ে আসে যে, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সঠিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণসহ গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতার বিকাশ ঘটানো হলে তা প্রায় অবধারিতভাবে দেশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে উন্নয়নের এই প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি আমাদের ইতিবাচক রাজনৈতিক ভারসাম্যের নির্ধারক সংক্রান্ত উপলব্ধিকে স্পষ্ট করে, যা বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত সমৃদ্ধি আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের উৎসাহিত করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একটি অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়া বলে মনে হলেও তা অবশ্যই আমাদের পূরণ করতে হবে, যদি আমরা জাতির ২০৪১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই।

অধ্যায় ৩

একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

৩.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন

নিম্ন-মধ্য-আয়ের অবস্থান পেরিয়ে এবং ২০২৪ সালের মধ্যে নিম্ন আয় দেশের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সকল মানদন্ড পূরণ করে বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য-আয় দেশের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদায় আসীন হবার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অতীত উন্নয়নের অর্জন এবং ভবিষৎ সম্ভাবনা ও সক্ষমতা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে এই অগ্রযাত্রা সম্ভব। তবু বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সমস্যার মুখোমুখী হতে হচ্ছে যা চলমান ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় (বিডিপি ২১০০) প্রতিফলিত হয়েছে। পরিবেশ সম্পৃক্ত বেশ কিছু ঝুঁকি ও ভঙ্গুরতার যে দিকগুলো ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়নি, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে সেগুলো যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেহেতু প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, তাই সরকার আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা ২০২১-২০৪১ মেয়াদ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

অন্যান্য পরিকল্পনার মতোই, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস, এবং সাম্প্রতিক বেশ কয়েক দশকব্যাপী বৈশ্বিক অন্যতম সেরা সাফল্য অর্জনকারীদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও অন্তর্নিহিত সক্ষমতার ভিত্তিতে আগামী বিশ বছর মেয়াদি কৌশল নিরূপণ করাই এর লক্ষ্য। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য ও অভীষ্ট সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে- এ ধরনের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে ।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট : প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এমন এক সময়ে গ্রহণ করা হচ্ছে যখন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির শক্তিশালী জাতীয় নীতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এটি শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহও নতুন সহস্রাব্দ শুরু হবার লগ্ন থেকে অধিকতর প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে। নতুন যে উপাদান এতে যুক্ত হয়েছে সেটি হলো বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির গুরুত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, একই সাথে অগ্রসর অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব দিন দিন কমে যাচ্ছে। তবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে পর্বতসম অনিশ্চয়তারও শেষ নেই। যুদ্ধোত্তর বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার আওতায় অতুলনীয় শান্তি ও সমৃদ্ধির ৭০ বছর পেরিয়ে সেই কাঠামো আজ একটি ক্রমঘনায়মান বাণিজ্য-লড়াইয়ের ফলে হুমকির মুখে। আর এই লড়াই শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্র-চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্কারোপ এবং অনেক অগ্রসর দেশে অতি-ডান রাজনৈতিক ধারার উত্থানের মধ্য দিয়ে যা বৈশ্বিক অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। তবু এটি সত্য যে, অপরাপর যে কোন সময়ের তুলনায় এখন পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা অনেক বেশি - বিশেষ করে বাণিজ্য, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জ্ঞান প্রসারণ, অভিবাসন এবং পরিবেশগত প্রভাবের মাধ্যমে। আগামী দশকগুলোতে বাংলাদেশকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অধিকতর অর্থনৈতিক সম্পৃক্তির জন্য তৎপর হতে হবে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে এভাবেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর হয়। উন্নত অর্থনীতিতে উন্নীত হওয়ার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

জাতীয় প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০১৬ অর্থবছরে ৭ শতাংশ হারে বার্ষিক মোট দেশজ আয় বা (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির সীমা অতিক্রম করে এবং সেই থেকে প্রবৃদ্ধি হার ৭ শতাংশের অধিক বজায় রয়েছে। এই ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি আসে গড় বার্ষিক ৬% এর উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি দশক পার হয়। যে অনন্য বৈশিষ্ট্য এই প্রবৃদ্ধির সাথে যুক্ত হয়েছে, সেটি হলো অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির চেয়ে এর তুলনামূলক স্থিতিশীলতা। এই দৃষ্টান্তমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন মূলত দশক ব্যাপী দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই ফল, যা সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য মাঝারি ধরনের অথচ টেকসই বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য তৈরি করে, যা সার্বিক অর্থনীতির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে আনে। এভাবে একটি উচ্চ-আয় দেশের অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সুফল আহরণকল্পে গড়ে তোলা হয়েছে একটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি।

৩.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক

দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক নীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ৩% এর নিচে নামিয়ে আনা।
- ২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ; ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশ।
- রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং-এর সাথে শিল্পায়ন কাঠামোগত রূপান্তরকে ভবিষ্যতের দিকে চালিত করবে।
- কৃষিতে মৌলিক রূপান্তর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ ভবিষ্যতের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
- ভবিষ্যতের সেবা খাত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি প্রাথমিক শিল্প ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সংযোগ-সেতুর সুবিধা প্রদান করবে।
- নগরায়ণ হবে উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে অগ্রযাত্রা-কৌশলের অপরিহার্য অংশ।
- দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো হবে কার্যকর পরিবেশ তৈরির অপরিহার্য অংশ যা দ্রুত, দক্ষ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবেশগত অভিঘাত সহিষ্ণু বাংলাদেশ বিনির্মাণ।
- একটি দক্ষতা-ভিত্তিক সমাজ বিকাশের জন্য বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানকেন্দ্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

৩.৩ উচ্চ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রধান লক্ষ্য ২০৪১ অর্থবছরের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জন। এজন্য দেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য-আয় দেশের সীমা অতিক্রম করতে হবে যার মাথাপিছু আয় হবে প্রায় ৫৫০০ মার্কিন ডলার (চলতি ডলারের মূল্যে), এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রাক্কলিত মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ১৬০০০ মার্কিন ডলারের অধিক (ডলারের চলতি মূল্যে) উচ্চ-আয় সীমা পেরিয়ে যেতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ ও অব্যাহত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অধীনে এ ধরনের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারণক্ষমতা হবে অব্যাহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ (অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয়) একটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি। সামষ্টিক অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মাত্রা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কারিগরি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেখানো হয়েছে যে, অর্থনীতিতে পরবর্তী দুই দশক, অর্থাৎ ২০২১-২০৪১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ৯% উচ্চ হারে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, রূপকল্প ২০৪১ এর জন্য প্রবৃদ্ধিকে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে।

সারণি ৩.১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ[১]

নির্দেশকসমূহ	ভিত্তি অর্থবছর ২০	অভীষ্ট অর্থবছর ৩১	অভীষ্ট অর্থবছর ৪১
প্রকৃত মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধি (%)	৮.১৯	৯.০	৯.৯
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৫	৪.৭	৪.৫
(মোট দেশজ আয়ের % হিসেবে)			
স্থূল দেশজ বিনিয়োগ (%)	৩২.৭৬	৪১.১৫	৪৬.৯
স্থূল জাতীয় সঞ্চয় (%)	৩১.৩১	৩৭.১৮	৪৩.৯৫
মোট সরকারি রাজস্ব (%)	১০.৪৭	১৯.৫৫	২৪.১৫
মোট সরকারি ব্যয় (%)	১৫.৫২	২৪.৫৫	২৯.১৫
(প্রবৃদ্ধি হার % হিসেবে)			
রপ্তানি	৫.০০	১১.৬৫	১১.০০
আমদানি	৫.০০	১২.০৫	১০.০০
রেমিট্যান্স	৯.০০	৪.৫০	২.০০
দারিদ্র্য (মাথাপিছু হার, %)			
চরম দারিদ্র্য (%)	৯.৩৮	২.২৫	০.৬৮
দারিদ্র্য (%)	১৮.৮২	৭.০২	২.৫৯

উৎস: জিইডি প্রজেকশনস

১ চারটি সংযুক্ত মডেল নিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক কাঠামো গঠিতঃ (১) একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল, (২) কর্মসংস্থান সম্পৃক্ত একটি স্যাটে-লাইট মডিউল, (৩) একটি দারিদ্র্য মডিউল এবং (৪) একটি পরিবেশগত মডিউল। বিবিএস, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রভৃতিসহ বিভিন্ন উৎস থেকে কাঠামোর জন্য তথ্য সেট সংগৃহীত হয়। এই গতিময় কাঠামো হতেই পাওয়া যায় মোট দেশজ আয়, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসন হারের পরিমাণগত প্রাক্কলন।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলত পুঁজি ঘনীভূতকরণের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ অর্জিত হয়ে থাকে। ভারতসহ পূর্ব এশিয়ার উত্থানশীল অর্থনীতিসমূহ এবং চীনের অভিজ্ঞতা সবগুলোই নির্দেশ করে যে দেশজ আয়ের অনুপাতে উচ্চতর বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক পুঁজির সমাবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উচ্চ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দেশগুলোর সবকটিই দু'টি বাস্তব সত্যকে প্রতিপাদন করে: প্রথমত, এদের সকলেই প্রাথমিক বছরগুলোতে উচ্চতর বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজির গভীরতা নিশ্চিত করে উচ্চতর ক্রমবর্ধমান পুঁজির উৎপাদন অনুপাত (আইসিওআর) এর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়; এবং দ্বিতীয়ত, উচ্চতর বিনিয়োগ ও মোট দেশজ আয় অনুপাতের সাথে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার সম্পর্কযুক্ত। এভাবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাতেও অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সাধন করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিরূপন করা হয়েছে, যা পরিকল্পনা মেয়াদের ভিত্তি বছর ২০২০ অর্থবছরে মোট দেশজ আয়ের ৩৩% এর পর্যায় থেকে অর্থবছর ২০৩১-এ ৪১% এ এবং অর্থবছর ২০৪১ এ ৪৬.৯% এ উন্নীত হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রথম দশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির উৎসসমূহের সাথে মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতায় পরিমিত উন্নতিসহ শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পুঁজি সঞ্চয়নের প্রাধান্য থাকবে। তবে দ্বিতীয় দশকে, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তি ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ উদ্ভাবনমুখী উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে সহায়ক হবে। শিক্ষা, আইসিটি, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নতুন উদ্যোগসমূহ এই সুফল অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় সঞ্চয় ও বহুপাক্ষিক উৎস হতে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের বেশির ভাগেরই অর্থায়ন হতে পারে। যদিও একপর্যায়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ ক্রমবর্ধিত হারে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এর পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপির কমপক্ষে ৩%। রপ্তানির জন্য বৃহত্তর বাজার সুবিধাসহ নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও বর্ধিত মাত্রায় বৈদেশিক বিনিয়োগ কম হবে। অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা দেশজ সম্পদ হতে এককভাবে কিছুতেই মেটানো সম্ভব নয়। তাই সরকারকে স্থানীয় ও বৈদেশিক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়াও বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অবকাঠামো বিনিয়োগে একটি দীর্ঘ বিরতির জন্য প্রাথমিকভাবে পুঁজি ও উৎপাদন অনুপাত (আইসিওআর) বেড়ে যেতে পারে। তবে, পরবর্তীতে যখন আইসিটি কৌশলের (ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ) বাস্তবায়নসহ অধিকতর অর্থনৈতিক উদারতা ও অবকাঠামোতে কাম্য উন্নতির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা-দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, তখন আইসিওআর কমতে থাকবে।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি কৌশল অনুসরণের পাশাপাশি উচ্চ প্রবৃদ্ধি যাতে আর্থিক পরিচালন, মূল্যস্ফীতি বা লেনদেনের ভারসাম্যে মারাত্মক অসঙ্গতি তৈরি না করে তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি খাত হবে মুখ্য কুশীলব এবং সরকারি বিনিয়োগ এমনভাবে পুনর্গঠিত হবে যা প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন বিকাশে অধিকতর কার্যকর হবে। প্রবাসী আয় প্রবাহের বদৌলতে জাতীয় সঞ্চয় হার বৃদ্ধি পেলেও, এতে আরো গতি সঞ্চার করা প্রয়োজন এবং এজন্যে কয়েকটি কৌশল গ্রহণ করা হবে। যেমন, আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সহজ প্রবেশ সুবিধা দিতে আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং মোবাইল ও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

সর্বোপরি, উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে অবশ্যই হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দরিদ্রমুখী, যাতে এর সুফল সকল স্তরের জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং দরিদ্র, বয়োবৃদ্ধ ও অসমর্থ জনগোষ্ঠীর জন্য সুরক্ষা বেষ্টনী বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

৩.৪ রাজস্ব পরিচালন কৌশল

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিগত প্রায় তিন দশক যাবৎ টেকসই বাজেট ঘাটতি বজায় রাখা। প্রাপ্তিসাধ্য রাজস্ব ও বহিঃসম্পদের পরিসীমার মধ্যেই যাতে সরকারি ব্যয় সীমিত থাকে সেই কৌশল অবলম্বন করা হবে। এরই ফলশ্রুতিতে, বিশ্বে কর-জিডিপি অনুপাতে বাংলাদেশ নিম্নতম দেশগুলোর অন্যতম হলেও বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫% এর মধ্যেই বজায় রাখা সম্ভব হয়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ঋণের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পায়।

রাজস্ব আয় সংগ্রহ প্রচেষ্টার কার্যকারিতার ওপর রাজস্ব পরিচালনার প্রবৃদ্ধি প্রভাব বহুলাংশে নির্ভর করবে। অবকাঠামোসহ অন্যান্য সরকারি সেবায় সরকারি বিনিয়োগের জন্য ক্রমবর্ধনশীল চাহিদায় অর্থায়নের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ গতিশীল করতে এর

কর ভিত্তি সম্প্রসারণের কৌশল গ্রহণ করা হবে এবং পরিবর্তিত কৌশল অনুসরণে বাণিজ্য করের ওপর একান্ত নির্ভরশীলতা থেকে প্রত্যক্ষ কর (আয়কর ও কর্পোরেট কর) এবং মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)-এর ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে। বর্তমানে, দেশজ ও আমদানি পর্যায়ে আদায়কৃত রাজস্বের সিংহভাগ আসে পরোক্ষ কর ব্যবস্থা হতে, যার অধিকাংশই মূল্য সংযোজন কর এবং রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ। রাজস্বের নিম্ন উৎপাদনশীলতা ছাড়াও কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা এখনো বেশি। লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অবদান মোট কর রাজস্বের ৫০ শতাংশের ওপরে নিয়ে যাওয়া। প্রয়োজনীয় সরকারি রাজস্ব সংগ্রহের কৌশলে নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে:

- যথাযথ যৌক্তীকিকরণ ও সংস্কারসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের কর বাড়াতে কর ভিত্তি বিস্তৃত করা;
- হিসাব-ভিত্তিক নিরীক্ষণের ওপর অধিকতর নির্ভরশীলতাসহ কর প্রশাসনের কম্পিউটারায়ন করে ভ্যাট ও আয়কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন;
- সম্ভাবনাযুক্ত করদাতাদের পরিবীক্ষণসহ কর ফাঁকি রোধ এবং কর প্রদানে আগ্রহ বাড়াতে করদাতাদের শক্তিশালী ও কার্যকর সেবা সুবিধাদানের জন্য রাজস্ব প্রশাসনের (ডিজিটাল প্রযুক্তি ও অনলাইন ফাইল ব্যবহার সংশ্লিষ্ট) পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা শক্তিশালী করা; এবং
- রাজস্ব আদায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত মানসম্মত সর্বাধুনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকল্পে সাংগঠনিক ও অন্যান্য সংস্কার গভীরতর করা হবে, যাতে সেগুলো রাজস্ব চাহিদাসহ (যেমন, পরিদর্শন, বিরক্তি পরিহারী ইলেট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস, বন্ড ব্যবস্থাপনার অটোমেশন) করদাতাদের সেবা চাহিদা এবং উচ্চ-আয় অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন তৎপরতা সহজীকরণ চাহিদা মেটাতে পারে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদে রাজস্ব পরিচালন পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য হবে বার্ষিক বাজেটকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকর বাহন হিসেবে ব্যবহার করা। সরকারি ব্যয় যেন অধিকতর দরিদ্রমুখী, লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও পরিবেশবান্ধব হয়, সরকারি ব্যয়ের মান ও কার্যকারিতা যেন আরো উন্নত হয়, এবং সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেন প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করার উপর সমধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সামাজিক খাতগুলোতে যে বিপুল ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে তদানুসারে সরকারি সম্পদ বরাদ্দে প্রধান বিবেচ্য হবে সরকারি ব্যয়ের দরিদ্রমুখী প্রবণতা। এটাই হবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দুই দশকব্যাপী সরকারি ব্যয় প্রবৃদ্ধির উদ্দিষ্ট। ফলে একদিকে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ধারা বেগবান করতে অবকাঠামো উন্নয়নে বর্ধিত সরকারি বিনিয়োগ, তেমনি অন্যদিকে প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব করা।

৩.৫ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে, নমনীয় মূল্যস্ফীতিসহ অব্যাহত ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক হলো আর্থিক এবং মুদ্রা নীতিমালার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়। সামান্য মূল্যস্ফীতিসহ বাংলাদেশ সাধারণভাবে যুক্তিযুক্ত মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, যা সম্ভবত উন্নত দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি সঞ্চালনের অবিচ্ছেদ্য সহচর। বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ বরাদ্দসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধানে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। পরিকল্পনা মেয়াদে মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য হবে পরিকল্পনার আওতায় প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশিত লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুদ্রার সামগ্রিক বিস্তৃতি ঘটানো।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারি খাতের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা হতে হবে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী "ব্যাপক মুদ্রা" প্রসারণের সামগ্রিক সীমার মধ্যে। এর জন্য প্রয়োজন হবে সরকার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণদানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মাত্রা বজায় রেখে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অধীনে আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা টেকসই হলেও এর জন্য সরকারকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বড় আকারের নতুন ঋণ গ্রহণ। দরকার হলে, বেসরকারি খাতের পর্যাপ্ত ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে (ক্রাউডিং আউট এড়াতে) সরকারকে অতিরিক্ত বৈদেশিক অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ যেহেতু এলডিসির কাতার থেকে বের হয়ে এসেছে, সেহেতু পরবর্তী দুই দশককালে সহজ শর্তে বহুপাক্ষিক ঋণ কমতে শুরু করবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের ঋণের ঝুড়িতে ছাড়বিহীন ঋণের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। বিদেশের পুঁজিবাজার থেকে যখন বেসরকারি খাতও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ শুরু করবে, তখন সার্বিক ঋণভারসহ ঋণ পরিশোধের দায়ও বৃদ্ধি পাবে। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার উচ্চমাত্রায় পৌঁছালে

কিছুটা উচ্চ সুদ ব্যয়ের সাথে উচ্চতর ঋণভার বহন কিছুটা স্বস্তিদায়ক হবে। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদে এই পরিস্থিতি ছিল না। তবে ঋণভার এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার মধ্যে যদি কোন বিশৃংখলা দেখা দেয়, সেজন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে ঋণের গতিপ্রকৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাই হবে সরকারের সুষ্ঠু নীতি।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষ ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিদ্যমান নীতিমালার বাইরে ঋণ বাণিজ্য ও ঋণ সিকিউরিটাইজেশন, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ডের মতো ঋণ ও পুঁজি বাজারের নতুন নতুন উপাদানকে উৎসাহিত করা হবে। তদুপরি, বাণিজ্যিক কৃষির জন্য শস্যবিমা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) জন্য আংশিক গ্যারান্টি স্কিম প্রবর্তন করা হবে, যাতে বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করা যায়।

৩.৬ লেনদেনের ভারসাম্য উন্নয়ন

বাংলাদেশের সুদৃঢ় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এর বহিঃস্থ লেনদেনের ভারসাম্যের শক্ত অবস্থানের ওপর নিহিত। বিগত ২০০১ থেকে বেশির ভাগ বছরগুলোতেই এর বৈদেশিক চলতি হিসাবে ভারসাম্য উদ্বৃত্ত বা ইতিবাচক হয়ে আসছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দ্রুত বৃদ্ধিতেও এটি প্রতিফলিত হয়েছে। বেশ কিছু বহিঃস্থ উপাদান ও বাইরের ঘটনা পরম্পরাসৃষ্ট অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এই সময়ে বর্ধিত রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ দ্বারা লেনদেনের ভারসাম্য সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত হয়। রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ শক্তিশালী রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে, যা ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫০ বিলিয়ন ডলারে এবং ২০৪১ সালে ৩০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে এবং এর অধিকাংশ সময়েই দুই অংকের এ বৃদ্ধি সংঘটিত হবে।

সারণি ৩.২: লেনদেনের ভারসাম্য উন্নয়ন

লেনদেনের ভারসাম্য সূচক	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (%)		
	২০২০ অর্থবছর	২০৩১ অর্থবছর	২০৪১ অর্থবছর
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	৫.০০	১১.৬৫	১১.০০
আমদানি প্রবৃদ্ধি	৫.০০	১২.০৫	১০.০০
সেবা প্রবৃদ্ধি	৯.০০	১৪.০	১৪.০
আয় প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি	৮.০০	১০.০	১০.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি	৯.০০	৪.৫০	২.০০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপির %)	-১.৪৫	-৩.৯৭	-২.৯২
এফডিআই (জিডিপির % হিসেবে)	১.০০	৩.০	৩.০
নিট এমএলটি (জিডিপির % হিসেবে)	১.২৫	১.২৫	১.০৫
মাস হিসেবে আমদানি রিজার্ভ	৬.৬০	৬.০০	৬.৭৩

উৎস: রূপকল্প ২০৪১ প্রক্ষেপণ।

পরিকল্পনা মেয়াদের বেশির ভাগ সময়েই তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে। যদিও রপ্তানি বহুমুখীকরণ কৌশল ত্বরান্বিত হলে নতুন নতুন বহুমুখী রপ্তানি পণ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এর পরেই বা একই সাথে এতে যুক্ত হতে দেখা যেতে পারে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হালকা প্রকৌশল ও ইলেকট্রনিক পণ্যসম্ভার। রপ্তানিতে খুব ভাল করছে শুধু এমন খাতকে অব্যাহত সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি রপ্তানি বিরোধী যে কোন নীতি সমূলে উৎপাটন করা আশু প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের রপ্তানি কৌশল বাস্তবায়নে তাই দ্বিমুখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে: (ক) এমন একটি নীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যা তৈরি পোশাক-বহির্ভূত সকল রপ্তানিতে, তৈরি পোশাক খাত প্রদত্ত সুবিধাদির মতো (শুল্কমুক্ত উপকরণ আমদানি) একই সুবিধা প্রদান করা; এবং (খ) রপ্তানি বিরোধী নীতি-পক্ষপাতিত্ব দূর করার জন্য, বিদ্যমান শুল্ক ও সুরক্ষা ব্যবস্থা যা আমদানি-বিকল্প উৎপাদনের প্রতি অস্বাভাবিক ঝোঁক তৈরি করেছে তা যুক্তিযুক্ত করা।

কাঙ্খিত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও প্রকৃত মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমদানি ব্যয়ের বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরবর্তী দুই দশকে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও সরকারি খাতের অবকাঠামো বিনিয়োগ দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটবে তা নিশ্চিতভাবে আমদানি ব্যয় পরিশোধ করার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রক্ষেপিত উচ্চ প্রকৃত আমদানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতের গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা ঘাটতি পূরণসহ শিল্পখাত সম্প্রসারণকল্পে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

যদিও রপ্তানি ও আমদানি গড়ে প্রায় একই হারে বাড়বে বলে প্রক্ষেপন করা হয়েছে, ডলারের হিসেবে (রপ্তানির তুলনায়) আমদানির জন্য উচ্চতর ভিত্তি থাকায় পরিকল্পনা মেয়াদে ডলারের দিক থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ভারসামের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে। তবে বাণিজ্য ভারসাম্যকে জিডিপির ৫%-৬% এর মাত্রায় বজায় রাখতে হবে। ধরে নেয়া যাক যে, রেমিট্যান্সের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি (২০২১-২০৪১ এ প্রবৃদ্ধির ক্রমহ্রাসমান হারে) বাস্তবায়িত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মেয়াদের অধিকাংশ সময় "চলতি হিসাব ভারসাম্যে" পরিমিতভাবে ইতিবাচক মাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এটি সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ও তদনুসারে রিজার্ভ বৃদ্ধির এক আশাবাদী চিত্র তুলে ধরে। তৈরি পোশাক ও অপরাপর উদীয়মান বহুমুখী রপ্তানিসহ গতিশীল রপ্তানি খাতের প্রতি বৈদেশিক বিনিয়োগ যথেষ্ট আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। এটি বহুপাক্ষিক/দ্বিপাক্ষিক অর্থায়নের সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিক হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত তৈরি করবে। এই প্রেক্ষাপটে, বাইরের দিক হতে কোন বড় ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না হলে, পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্বারা ১৪ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে।

৩.৭ বহিঃস্থ স্থিতিশীলতার জন্য বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা

লেনদেন ভারসাম্যের ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বিনিময় হার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৩ সালের ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নমনীয় বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করে আসছে। এই নীতি সাধারণভাবে অর্থনীতিতে অত্যন্ত ভালোভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারেই বিনিময় হার নির্ধারণ সম্পন্ন হয়। বিনিময় বাজারের অস্থিরতা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে মাঝে মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে হস্তক্ষেপ করতে হয়। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত ভাসমান বিনিময় ব্যবস্থার স্বার্থে প্রাথমিকভাবে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এই নীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একই সাথে তা জুন ২০১৯ এর শেষ প্রান্তে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক মাত্রায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের অতি মূল্যায়ন প্রতিরোধের মাধ্যমে রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা বজায় রাখা।

পরবর্তী দশকগুলোতেও বাজার-স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ সীমিত রেখে বিনিময় হার নমনীয়তার নীতি অব্যাহত থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সমান্তরালে অর্থনৈতিক "মৌল ভিত্তিগুলো" দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারণ করা হবে। এজন্যে পুরো মেয়াদ জুড়ে রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা ও স্বস্তিদায়ক মাত্রায় রিজার্ভ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যকেও বিবেচনায় নেয়া হবে। লেনদেনের ভারসাম্য এমন হবে, যা সামগ্রিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত এবং চলতি হিসাবের সহনীয় ঘাটতি/উদ্বৃত্ত বজায় রাখবে, যেন বিনিময় বাজারে তেমন বড় ধরনের কোন অস্থিতিশীলতা সৃষ্ট না হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান স্বস্তিকর রিজার্ভ ধরে রাখার অবস্থান আগামীতেও বজায় রাখা বা আরো উন্নত করার কৌশল গ্রহণ করা হবে। এটি বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের যে কোন ফটকাবাজির চাপ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। স্বস্তিকর বহিঃস্থ অবস্থানও বাংলাদেশ ব্যাংককে চলতি ও মূলধনী হিসাবের কিছু বিধি-নিষেধ পর্যায়ক্রমে সহজীকরণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার সুযোগ করে দিবে। একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও শক্তিশালী বহিঃস্থ পরিবেশে মূলধনী হিসাবের পর্যায়ক্রমিক উদারীকরণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে, যা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ উৎসাহিত করবে।

৩.৮ উচ্চতর বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় সংগ্রহ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে যে উচু মাত্রার বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, তার বেশিরভাগ আসবে জাতীয় সঞ্চয় ব্যাপক বৃদ্ধির মাধ্যমে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স প্রবাহ সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সঞ্চয়ে বর্ধিত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ছাড়াও রেমিট্যান্স প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিককালে ঊর্ধ্বমুখী গতি দেখা দিয়েছে। জাতীয় সঞ্চয়ের

ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ইতিবাচক প্রবণতার ওপর ভর করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্য হলো প্রায় ১১ শতাংশ পয়েন্ট হারে জাতীয় সঞ্চয় বাড়ানো, অর্থাৎ ২০২০ অর্থবছরের জিডিপির ৩৫.৫% থেকে ২০৪১ এ জিডিপির ৪৬.৭%-এ উন্নীত করা।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অধীনে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জাতীয় সঞ্চয়ের বৃদ্ধি নির্ভর করবে রেমিট্যান্সের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ওপর, যদিও কিছুটা মন্থর গতিতে, যা এর আগে লেনদেনের ভারসাম্য অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে। বিনিয়োগের জন্য বর্ধিত চাহিদা দ্বারা আংশিক সমর্থনপুষ্ট উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে অধিকতর আকর্ষণীয় মুনাফার হার প্রবাসী বাঙালি শ্রমিকদেরও তাদের সঞ্চয় স্থানান্তরের জন্য উৎসাহিত করবে। এছাড়া বাড়তি রাজস্ব সমাবেশ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারি খাত থেকেও বর্ধিত জাতীয় সঞ্চয়ে একটি অংশে যুক্ত হবে।

৩.৯ উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিনিয়োগ

উৎপাদনশীলতা

প্রবৃদ্ধির হিসাব একটি সত্যকে সামনে নিয়ে আসে, আর সেটি হলো বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধিতে এ পর্যন্ত প্রযুক্তিগত রূপান্তরের অবদান হবে ন্যূনতম বার্ষিক প্রায় ০.৩ শতাংশ হারে। এটি অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং দীর্ঘ-মেয়াদে বাংলাদেশের জন্য এটিই হবে প্রবৃদ্ধির একটি সম্ভাবনাময় প্রধান উৎস।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রবৃদ্ধি কৌশলের লক্ষ্য মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি যেন তা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে ২০৩১ এ প্রায় ৪০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি অবদান রাখতে পারে। এটি একটি অতি উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য, তবে তা উচ্চ প্রবৃদ্ধির কাম্য অবস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ যা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়-দেশের মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন। উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানসম্মত শিক্ষায় বিনিয়োগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞানের উন্নতি বিধান, গবেষণা ও উন্নয়ন। উৎপাদন কৌশল ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্ভাবনকে (যেমন শিল্প বিপ্লব ৪.০) বিকশিত করা হবে ও সকল প্রকার সহায়তা দেয়া হবে। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি খাতে যৌথ-সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

সরকারি বিনিয়োগ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উচ্চ প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো সামষ্টিক বিনিয়োগ ফলে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামষ্টিক বিনিয়োগের হার জিডিপির প্রায় ৩০-৩২%-এ স্থির হয়ে আছে, অথচ এই হার ৩৪-৩৫%-এর মধ্যে থাকা উচিত ছিল। অবকাঠামোতে বেশ কয়েকটি মেগা-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চালু থাকায় অতি সম্প্রতি সরকারি বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পসমূহ অবকাঠামোগত চাহিদায় বিদ্যমান ব্যাপক শূন্যতা পূরণ করবে এবং অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা এতকাল কিছুটা অবরুদ্ধ ছিল, তার পরিপূর্ণ বিকাশকে অবারিত করবে। একবার এই প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে, এগুলো বৃহৎ পরিসরে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতাসহ উচ্চতর প্রবৃদ্ধিকে দ্রুতগামী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অর্থায়নের ওপর নির্ভরতার বাইরে সরকার বড় ধরনের অবকাঠামো প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য কাজ করবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ

বেসরকারি খাতকে প্রবৃদ্ধির চালক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিতে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে, বাড়তি বৃদ্ধির বেশিরভাগই আসবে দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় পর্যায়ের বেসরকারি খাত হতে। বিগত দুই দশক ধরে বেসরকারি খাত বিনিয়োগের ক্রমবর্ধনশীল অংশে উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশের প্রতি বেসরকারি খাতের অনুকূল সাড়া প্রদান প্রতিফলিত হয়। বিগত দশ বছরে অবকাঠামো উন্নয়নে যে বিপুল পরিমাণ সরকারি বিনিয়োগ হয়, তা বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াবে এবং বেশ কিছু সময়ের জন্য যা হারিয়ে গিয়েছিল তাতে গতি সঞ্চার করবে।

ভবিষ্যতে বেসরকারি বিনিয়োগ চালনা করবে এমন অবকাঠামো এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কারে সহায়ক প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো: (১) বিদ্যুৎ ও গ্যাস (অথবা এলএনজি) সহ পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ; (২) সড়ক, রেলপথ, সেতু, বাঁধ ও ডাইকসহ অবকাঠামো; (৩) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা; (৪) বন্দর; (৫) সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারসহ আইনগত ও প্রশাসনিক

ব্যবস্থা; (৬) আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতিসহ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ; এবং (৭) কার্যকর মুদ্রানীতি এবং সরকারি অর্থায়নের টেকসই ব্যবস্থাপনা।

৩.১০ মধ্য-আয় ফাঁদ পরিহার

পরিশেষে, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে অতীত সাফল্য আমাদের যত আশাবাদী করে তুলুক না কেন, উচ্চ-আয় পর্যায়ে উন্নীত হবার পথে অর্থনীতির কোন মধ্য-আয় ফাঁদে (এমআইটি) আটকে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে নীতি-প্রণেতাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। একটি দ্রুত বর্ধনশীল উন্নয়নকামী অর্থনীতির জন্য মধ্য-আয় কোন গন্তব্য হতে পারে না, বরং অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২১-২০৪১ মেয়াদে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে বার্ষিক ৯-১০ শতাংশ, যা গড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৯ শতাংশ। যদি কোন কারণ এই দ্রুত গতিকে ব্যাহত করে তবে সেটি হতে পারে মধ্য-আয় ফাঁদের সূত্রপাত, যা উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনকে বিলম্বিত করবে। নীতি বা প্রতিযোগ-সক্ষমতায় ব্যর্থতার জন্য অথবা উদ্ভাবন ও আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে ক্রমবর্ধনশীল উন্নত অর্থনীতির সাথে পাল্লা দিতে ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ যদি মানসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য রপ্তানিতে সস্তাশ্রম ব্যবহারকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে না পারে, তবে মধ্য-আয় ফাঁদে আটকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হবে। উন্নত অর্থনীতিতে উত্তীর্ণ দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরের মতো এশীয় অর্থনীতিসমূহ কখনোই মধ্য-আয় পর্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়েনি। মালয়েশিয়া ২০১৮ সালে বা খুব শিগগিরিই ১২,০৫৫ ডলারের মাথাপিছু আয় নিয়ে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে[২], অথচ থাইল্যান্ড বহু বছর ধরে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে (২০১৮ সালে মাথাপিছু আয় ৬৩৭৫ ডলার) আটকা পড়ে আছে। মালয়েশিয় প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিমত্তা এবং এর স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা (উদার গণতন্ত্র থেকে খানিকটা সরে আসাসহ) উন্নততর অর্থনৈতিক সুফল আহরণের জন্য দক্ষ সুশাসন নিশ্চিত করে।

পক্ষান্তরে, থাইল্যান্ডের অর্থনীতি তার রপ্তানি প্রবণতায় মন্দাগতির কারণে যাবতীয় ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ভারে এর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন-দক্ষতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ১৯৬০ সালের ১০১টি মধ্য-আয় অর্থনীতির মধ্যে মাত্র ১৩টি ২০০৮ সালে উচ্চ-আয় অর্থনীতি হবার মর্যাদা লাভ করে। এটি এমন একটি বাস্তবতা যা হালকাভাবে নেয়া ঠিক হবে না।

প্রতিটি দেশেরই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি পৃথক চরিত্র রয়েছে, তাই মধ্য-আয় ফাঁদ পরিহারের জন্য কোন একক নীতি মিশ্রণ গ্রহণ করা হয় না। এই ফাঁদ পরিহারের জন্য তাই প্রতিটি দেশকে চাহিদা ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট নীতিমালার সঠিক মিশ্রণ খুঁজে পেতে হবে, যা তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে গতিসঞ্চারসহ দেশজ ও বৈদেশিক বাজার হতে উৎসারিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ মধ্য-আয় ফাঁদ পরিহারের কার্যকর ব্যবস্থাসহ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শক্ত ভিত্তি নির্মাণসহ এর পথনকশা সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

২ আইএমএফ রিপোর্ট ২০১৮ নিশ্চিত করে যে, পেট্রোলিয়ামের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যের উন্নত শর্তাদিসহ ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচার পণ্যের রপ্তানি দ্বারা উদ্দীপ্ত শক্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মালয়েশিয়া অচিরেই উচ্চ আয় দেশের মর্যাদায় উন্নীত হতে যাচ্ছে।

পরিশিষ্ট ক: সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এর জন্য সামষ্টিক প্রক্ষেপণ

আর্থিক বছর	২০২০	২০২১	২০২৫	২০২৬	২০৩০	২০৩১	২০৩৫	২০৩৬	২০৪০	২০৪১	গড় (২০-৪১)
প্রকৃত খাত নির্দেশক	(প্রবৃদ্ধি হার %)										
প্রকৃত মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধি	৮.১৯	৮.২৩	৮.২৯	৮.৩২	৮.৩৭	৮.৫১	৮.৯১	৯.০০	৯.৩৬	৯.৯০	৯.০২
মুদ্রাস্ফীতি (সিপিআই ভিত্তি, % রূপান্তর)	৫.৫০	৫.৪০	৫.৩০	৫.১২	৪.৯৪	৪.৭৬	৪.৫১	৪.৪৬	৪.২৬	৩.৯৬	৪.৫২
আইসিওআর	৪.০০	৪.০৮	৪.১৬	৪.২৪	৪.৩২	৪.৪০	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৬৪	৪.৭৩	৪.৫২
জনসংখ্যা বৃদ্দির হার	১.৩৯	১.৩৪	১.২৪	১.২২	১.১৯	১.১৮	১.০৪	১.০৩	০.৯৩	০.৭৮	১.০৩
	(মোট দেশজ আয় 'র % হিসেবে)										
মোট জাতীয় সঞ্চয়	৩১.৩১	৩১.৫৬	৩২.৩৫	৩২.৯৮	৩৩.৬৮	৩৪.৭৭	৩৬.৮৪	৩৭.১৮	৪০.০২	৪৩.৯৫	৩৭.৭৫
মোট বিনিয়োগ	৩২.৭৬	৩৩.৫৮	৩৪.৪৯	৩৫.২৮	৩৬.১৬	৩৭.৪৪	৪০.৬০	৪১.১৫	৪৩.৪১	৪৬.৮৮	৪০.৮৭
সরকারি বিনিয়োগ (পিপিপিসহ)	৮.১৯	৮.৩৮	৮.৫৯	৮.৬৮	৮.৮৬	৯.২৪	৯.৬৪	৯.৭২	১০.০৪	১০.৫২	৯.৬৪
বেসরকারি বিনিয়োগ (পিপিপিসহ)	২৪.৫৭	২৫.২০	২৫.৯০	২৬.৬০	২৭.৩০	২৮.২০	৩০.৯৬	৩১.৪৩	৩৩.৩৭	৩৬.৩৬	৩১.২৩
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই)	১.০০	১.৭০	১.৯০	২.১০	২.৫০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	২.৮২
অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	২৩.৫৭	২৩.৫০	২৪.০০	২৪.৫০	২৪.৮০	২৫.২০	২৭.৯৬	২৮.৪৩	৩০.৩৭	৩৩.৩৬	২৮.৪১
ভোগ	৭৪.৪৮	৭৩.৯৮	৭৩.৪৮	৭২.৯৮	৭২.৪৮	৭১.৯৮	৬৯.৪৮	৬৮.৯৮	৬৬.৯৮	৬৩.৯৮	৬৮.৯৮
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	২০৫৪	২২৫০	২৪৬৮	২৭০৮	২৯৭৪	৩২৭১	৫৩৩৮	৫৯০৬	৮৯৪৭	১৭২২৯	৭২৫২
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৬৯.৮	১৭২.১	১৭৪.২	১৭৬.৩	১৭৮.৪	১৮০.৫	১৯০.৬	১৯২.৬	২০০.১	২১০.৩	
আর্থিক নির্দেশক	(মোট দেশজ আয় 'র % হিসেবে)										
রাজস্ব ও অনুদান	১০.৫২	১১.২৪	১১.৬৪	১২.০৪	১২.৮৯	১৪.০৯	১৯.০৬	১৯.৫৫	২১.৩৫	২৪.১৫	১৮.৫১
মোট রাজস্ব	১০.৪৭	১১.১৯	১১.৬০	১২.০০	১২.৮৬	১৪.০৬	১৯.০৬	১৯.৫৫	২১.৩৫	২৪.১৫	১৮.৫০
কর রাজস্ব	৯.৩৭	১০.০৪	১০.৩০	১০.৬০	১১.২৬	১২.২৬	১৬.৯৬	১৭.৩৫	১৯.১৫	২১.৮৫	১৬.৪৭
এনবিআর কর রাজস্ব	৯.০৫	৯.৬৯	৯.৯০	১০.১০	১০.৬৬	১১.৫৬	১৬.০১	১৬.৩৫	১৭.৭৫	১৯.৮৫	১৫.৩৬
নন-এনবিআর কর রাজস্ব	০.৩২	০.৩৫	০.৪০	০.৫০	০.৬০	০.৭০	০.৯৫	১.০০	১.৪০	২.০০	১.১১
অ-কর রাজস্ব	১.১০	১.১৫	১.৩০	১.৪০	১.৬০	১.৮০	২.১০	২.২০	২.২০	২.৩০	২.০২
অনুদান	০.০৫	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৩	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০১
মোট ব্যয়	১৫.৫২	১৬.২৪	১৬.৬৪	১৭.০৪	১৭.৮৯	১৯.০৯	২৪.০৬	২৪.৫৫	২৬.৩৫	২৯.১৫	২৩.৫১
রাজস্ব ব্যয়	৯.৪৬	৯.৯৬	১০.০৯	১০.৪০	১১.০৯	১১.৯১	১৬.৫৪	১৬.৯৬	১৮.৪৯	২০.৮৭	১৬.০০
উন্নয়ন ব্যয়	৬.০৩	৬.২০	৬.৪১	৬.৪৯	৬.৬৬	৭.০৩	৭.৩৭	৭.৪৪	৭.৭২	৮.১৩	৭.৩৬
সামগ্রিক ভারসাম্য (অনুদানসহ)	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০০
অর্থায়ন	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১.২৫	১.২৭	১.২৯	১.৩১	১.৩৩	১.৩৫	১.২৭	১.২৫	১.১৭	১.০৫	১.২৩
দেশজ অর্থায়ন	৩.৭৫	৩.৭৩	৩.৭১	৩.৬৯	৩.৬৭	৩.৬৫	৩.৭৩	৩.৭৫	৩.৮৩	৩.৯৫	৩.৭৭
ঋণ নির্দেশক	(মোট দেশজ আয় 'র % হিসেবে)										
মোট বকেয়া ঋণ	৩৪.২৯	৩৫.০৬	৩৫.৭৫	৩৬.৩৯	৩৭.০০	৩৭.৫৫	৩৯.৩৬	৩৯.৫৭	৪০.০৭	৪০.১৯	৩৮.৮৫
বৈদেশিক ঋণ	১১.৭৯	১১.৬১	১১.৪৭	১১.৩৮	১১.৩৪	১১.৩৩	১১.০৭	১০.৯৮	১০.৪৮	৯.৫৬	১০.৭৯
অভ্যন্তরীণ ঋণ	২২.৫০	২৩.৪৬	২৪.২৮	২৫.০১	২৫.৬৬	২৬.২৩	২৮.২৮	২৮.৫৯	২৯.৫৯	৩০.৬৩	২৮.০৬
মোট ঋণ সেবা	২.৫৭	২.৬৩	২.৬৮	২.৭২	২.৭৬	২.৭৯	২.৯১	৩.০০	৩.১৭	৩.২৮	২.৯৯
বৈদেশিক	০.৭০	০.৭১	০.৭১	০.৭২	০.৭৩	০.৭৪	০.৭৯	০.৮৫	০.৯৫	০.৯৮	০.৮৫
অভ্যন্তরীণ	১.৮৭	১.৯২	১.৯৭	২.০০	২.০৩	২.০৫	২.১২	২.১৪	২.২২	২.৩০	২.১৪
রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের % হিসেবে বৈদেশিক ঋণ	৬৬.০১	৬৫.৭৫	৬৫.৮২	৬৬.২৩	৬৬.৯৫	৬৭.৯৬	৭১.৭৮	৭২.১৯	৭২.৯৩	৭৬.৩৯	৭১.৩৫
রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের % হিসেবে বৈদেশিক ঋণ সেবা	৩.৯৪	৪.০০	৪.০৮	৪.১৯	৪.৩২	৪.৪৬	৫.১৪	৫.৬১	৬.৬০	৭.৮৩	৫.৭৩
বহিঃস্থ নির্দেশক	(% প্রবৃদ্ধি হার বা নির্দেশিত অন্য কোনভাবে)										
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	৫.০০	১০.১৫	১০.৩০	১০.৪৫	১০.৬০	১০.৭৫	১১.৫০	১১.৬৫	১২.০৫	১১.০০	১১.১২
আমদানি প্রবৃদ্ধি	৫.০০	১১.০০	১০.৭০	১০.৮৫	১১.০০	১১.১৫	১১.৯০	১২.০৫	১০.০০	১০.০০	১০.৭০
প্রবাসী আয় প্রবৃদ্ধি	৯.০০	৮.৪০	৭.৮০	৭.২০	৬.৬০	৬.০০	৪.৭৫	৪.৫০	৩.৫০	২.০০	৪.৬৭
মোট দেশজ আয়'র % হিসেবে কারেন্ট একাউন্ট ব্যালান্স	-১.৪৫	-২.০২	-২.১৪	-২.২৯	-২.৪৭	-২.৬৮	-৩.৭৬	-৩.৯৭	-৩.৩৯	-২.৯২	-৩.১২
মোট দেশজ আয়ের % হিসেবে নিট এমএলটি	১.২৫	১.২৭	১.২৯	১.৩১	১.৩৩	১.৩৫	১.২৭	১.২৫	১.১৭	১.০৫	১.২৩
বিনিময় হার (টাকা/ইউএস ডলার)	৮৬.৯৭	৮৯.৪৩	৯১.৮৮	৯৪.২৩	৯৬.৪৭	৯৮.৬০	১০৯.১৭	১১১.২৬	১১৯.৪৪	১৩০.৯৬	১১০.৯৪
আমদানি-মাসে রিজার্ভ	৬.৬০	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৫২	৬.৭১	৭.০৯	৬.৫২	৬.০০	৫.৫০	৬.৭৩	৬.৩৪
মুদ্রা সংশ্লিষ্ট নির্দেশক	(% প্রবৃদ্ধি হার বা নির্দেশিত অন্য কোনভাবে)										
ব্রড মানি	১০.৩০	১১.২০	১২.১৫	১২.৮৮	১৩.২৪	১৩.৫০	১৩.৮২	১৩.৮৬	১৪.০২	১৪.২৫	১৩.৬৩
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৬.৯১	৯.৪০	১১.১৯	১২.৪৭	১৫.৭২	১৯.৪১	৫.৯৯	৩.৩৯	১৩.২৭	১৮.০৭	১২.৩৭
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১.২৮	১১.৭০	১২.৪১	১২.৯৯	১২.৫৮	১১.৮৮	১৫.৯৫	১৬.৪৭	১৪.১৫	১৩.৫১	১৩.৯৬
বেসরকারি খাতের ঋণ	১০.৮০	১১.৭০	১২.৬৫	১৩.৩৮	১৩.৭৪	১৪.০০	১৪.৩২	১৪.৩৬	১৪.৫২	১৪.৭৫	১৪.১৩

উৎস: জিইডি প্রক্ষেপণ

অধ্যায় ৪

একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ

একটি দারিদ্র্যশূন্য দেশ

৪.১ প্রেক্ষাপট

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশ তার অর্জন নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। সত্তরের দশকে গোড়ার দিকে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে দারিদ্র্যের হার ছিল মাথাপিছু-৮০ শতাংশ। পরবর্তীকালে বিবিএস এর তথ্য অনুসারে ২০১৯-এ সাধারণ দারিদ্র্য হার ২০.৫% এবং চরম দারিদ্র্য হার ১০.৫% এ নেমে আসে। দারিদ্র্য নিরসনে এই দ্রুত অগ্রগতি নীতিপ্রণেতাদের সাহসী করে তোলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণে। রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্য হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-আয়ের দেশে উন্নীত করা, যেখানে দারিদ্র্য হবে নিম্নতম। রূপকল্প এই যে, ২০৪১ সালের মধ্যে সকল নাগরিক যাতে জীবনধারণের ন্যূনতম মান বজায় রাখতে পারে, যার ভিত্তি হবে সকল কর্মক্ষম মানুষের জন্য কর্মসংস্থান থেকে প্রাপ্ত আয়। যারা বার্ধক্য বা দৈহিক সামর্থ্যের অভাবে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে না এমন জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা থেকে সহায়তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। বর্তমানে উচ্চ-আয় অর্থনীতিগুলোর মতোই দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক ধারণায় পর্যবসিত হবে। এই পরিস্থিতিতে যারা দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে, তাদের সবার জীবনধারণের ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার মতো পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

৪.২ দারিদ্র্য নিরসনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাসমূহ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য নিরসন কৌশল ও নীতিমালা দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক ইতিবাচক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। ১৯৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে তার দৃঢ় ও অব্যাহত অগ্রগতির ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। ১৯৯০ এর দশক হতে দারিদ্র্য নিরসনের গতি ও প্রকৃতি চিত্র ৪.১ ও চিত্র ৪.২ এ প্রদর্শিত হলো।

চিত্র ৪.১: দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি

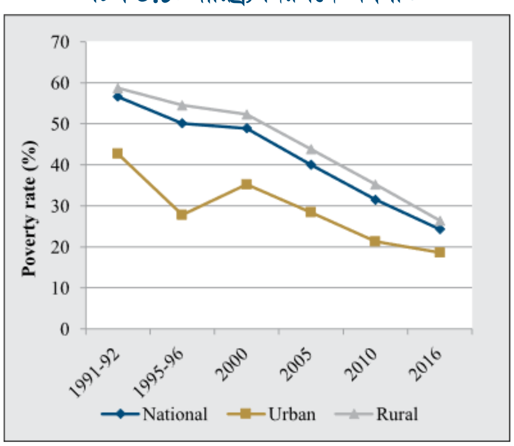

উৎস: সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরীপ ২০১৬ এর উপর ভিত্তি করে

চিত্র ৪.২: অতি দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি

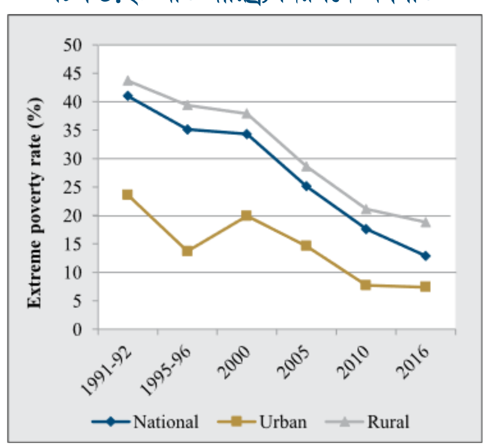

উৎস: বিভিন্ন বর্ষের বিবিএস ২০১৬ পর্যন্ত, এইচআইইএস

এটি পরিষ্কার যে, সাধারণ ও চরম উভয় ধরনের দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি চিত্তাকর্ষক। গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলের জনগণের জন্য দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। সাধারণ দারিদ্র্যের তুলনায় চরম দারিদ্র্য অধিকতর গতিতে নিম্নগামী হয়, যদিও শহুরে দরিদ্রদের জন্য ২০১৬ তে এই অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়। বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতিতে একই ধরনের ভালো ফলাফল দেখা যায়, তবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ হারে দারিদ্র্য প্রদর্শন অব্যাহত থাকে (সারণি ৪.১)। ২০১৬ তে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতির বিপরীতমুখিতা উদ্বেগের বিষয়, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলের অধীনে সমন্বিতভাবে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সারনি ৪.১: দারিদ্র্যের বিভাগওয়ারি বিস্তার

অঞ্চল	বিভাগ	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
দক্ষিণ পশ্চিম	বরিশাল	৫৩.১	৫২.০	৩৯.৪	২৬.৫
	খুলনা	৪৫.১	৪৫.৭	৩২.১	২৭.৫
	রাজশাহী (পুরাতন)	৫৬.৭	৫১.২	৩৫.৭	৩৭.৫
	রাজশাহী (নতুন)	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	২৯.৮	২৮.৯
	রংপুর	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	৪২.৩	৪৭.২
পূর্ব	চট্টগ্রাম	৪৫.৭	৩৪.০	২৬.২	১৮.৪
	ঢাকা	৪৬.৭	৩২.০	৩০.৫	১৬.০
	সিলেট	৪২.৪	৩৩.৮	২৮.১	১৬.২
সমগ্র		***৪৮.৯***	***৪০.০***	***৩১.৫***	***২৪.৩***

উৎস: ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ষের বিবিএস, এইচআইইএস

আয় বৈষম্য: এটি সুবিদিত যে, আয় বৈষম্য দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গিনি সহগ দ্বারা নির্ণীত আয় বৈষম্যের গতিধারা সারণি ৪.২ এ প্রদর্শিত হলো। আয় বৈষম্য বৃদ্ধির একটি স্পষ্ট প্রবণতা এতে পরিলক্ষিত হয়। প্রদর্শিত প্রাথমিক অবস্থা থেকে এই বৈষম্যগুলোর আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তবে এর সাথে আরো যুক্ত রয়েছে পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার জন্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক ফলাফল এই যে, আয় বৈষম্য বাড়লেও, ভোগ বৈষম্য যথেষ্ট নিম্ন হয় এবং অনেকাংশে অপরিবর্তিত থাকে। এর আংশিক কারণ পারিবারিক আয় স্থানান্তর এবং ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব। যেটি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবিলম্বে আয় বৈষম্য বৃদ্ধিসহ মানব ও ভৌত পুঁজি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে একে বিপরীতমুখী করতে হবে।

সারণি ৪.২: আয় বৈষম্যের গতিধারা (গিনি সহগ)

বর্ষ	জাতীয়	গ্রামীণ	নগর
১৯৯১-৯২	০.৩৮৮	০.৩৬৪	০.৩৯৮
১৯৯৫-৯৬	০.৪৩২	০.৩৮৪	০.৪৪৪
২০০০	০.৪৫১	০.৩৯৩	০.৪৯৭
২০০৫	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭
২০১০	০.৪৫৮	০.৪৩১	০.৪৫২
২০১৬	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮

উৎস: ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ষের বিবিএস এইচআইইএস

অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য তৈরি প্রেক্ষাপট গবেষণাপত্রে[৩] দারিদ্র্য ও বৈষম্যের গতিধারা এবং এর ফলাফলের ব্যাখ্যা সংবলিত উপাদানসমূহের ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষাগুলো হলো:

- বাংলাদেশে মাঝারি ও চরম দারিদ্র্যের দ্রুত নিরসনে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভবিষ্যতে তাই অব্যাহত দারিদ্র্য নিরসনের জন্য দ্রুত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অপরিহার্য।
- প্রবৃদ্ধি হার গুরুত্বপূর্ণ হলেও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক গঠনও অশেষ গুরুত্ববাহী। জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে এই অর্থে দরিদ্রমুখী করা উচিত যেন তা প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় দরিদ্রদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। যে উপাদানগুলো দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক, তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: খামারের উৎপাদনশীলতা ও আয় বাড়ানো, রেমিট্যান্স প্রবাহের মাধ্যমে গ্রামীণ খামার-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা, গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নতি সাধন, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ বিশেষ করে তৈরি বস্ত্রশিল্পে কর্মসুযোগের বিস্তার এবং নগর সেবা তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

৩ এস.আর. ওসমানী "বাংলাদেশে অংশগ্রাহী সমৃদ্ধির জন্য বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য নির্মূলীকরণ", প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য প্রণয়নকৃত প্রেক্ষাপট গবেষণাপত্র।

- চাহিদার দিক থেকে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি আবশ্যক। পাশাপাশি যে প্রতিবন্ধকতাগুলো দরিদ্রদের জন্য প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া থেকে সুফল আহরণে বিঘ্ন ঘটায়, সেগুলো অপসারণ করা বা ন্যূনতম পর্যায়ে আনা প্রয়োজন। এ ধরনের একটি প্রতিবন্ধকতা হলো স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবায় অভিগম্যতা। বস্তুত উন্নত মানব পুঁজিই দারিদ্র্য নিরসনের মূল নির্ধারক। উন্নততর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় দরিদ্রদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ জরুরি। বাংলাদেশ উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবার সাথে সাথে উন্নত মানব পুঁজি সংগঠনের ওপর বৃহত্তর ভূমিকা পালনের দায়িত্ব এসে পড়বে। এই রূপান্তরে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবা ক্রমবর্ধিতভাবে উচ্চতর ভূমিকা পালন করবে, যার জন্য প্রয়োজন হবে প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ শ্রমশক্তি। এই প্রবৃদ্ধি পরিবেশে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ বাড়াতে তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা ভিত্তির প্রসার ঘটাতে হবে উল্লেখযোগ্যভাবে।
- খামার-বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃজনে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ ভিত্তি উন্নয়নে এবং ভোগের স্থিতিশীলতা বিধানে ক্ষুদ্র ঋণের বিস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চরম দারিদ্র্য আরো কমিয়ে আনার জন্য ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি আরো জোরদার করা হবে। একই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকতর অভিগম্যতা মানব ও ভৌত পুঁজি গঠনে সহায়তা দান করবে।
- বৈদেশিক রেমিট্যান্সের অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ প্রত্যক্ষভাবে উপকারভোগী পরিবারগুলোতে, যাদের অধিকাংশ গরিব, আয় হস্তান্তরের মাধ্যমে, এবং পরোক্ষভাবে, খামার-বহির্ভূত গ্রামীণ কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের বেশিরভাগ জেলারই বিদেশের শ্রমবাজারে অভিগম্যতা কম। এ ধরনের প্রবেশ সহজীকরণের অনুকূলে নীতিমালা গ্রহণ করা হলে তা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করবে। জাতীয় পর্যায়ে দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে অভিবাসন দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করে, এতে বহু অভিবাসী শ্রমিকদের সামনে উচ্চতর আয়ের সুযোগ অবারিত হয়। তবে শহরাঞ্চলগুলোতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উচ্চতর প্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় বর্ধিত সরবরাহের সাথে তাল মিলিয়ে নগর উন্নয়ন এগোতে পারেনি। এমনকি আরো একটি জটিল উপাদান যুক্ত হয়েছে এর সাথে। সেটি হলো, অপরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য সবচাইতে বেশি চাপ পড়ছে রাজধানী শহর ঢাকাসহ সংলগ্ন নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার ওপর।
- অন্যান্য অধিকাংশ নগর কেন্দ্রগুলোতে, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা নগর সেবা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশের অভাব তীব্র রয়েছে। ফলে, বিভিন্ন নগরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে, বর্তমানে অব্যাহতভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীকরণ পরিদৃশ্যমান। এই পরিস্থিতি শুধু আবাসন, পরিবহন, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশনের মতো নগর সেবার ওপর দুঃসহ চাপই সৃষ্টি করেনি, এছাড়াও তা নগর দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে মন্থরতা এনে দিয়েছে, যা আমরা এইচআইইএস ২০১৬ (ঐওউঝ-২০১৬) এর ফলাফল থেকে জানতে পারি। সুতরাং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য নিরসনে অব্যাহত অগ্রগতির জন্য শুধু ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী নগরগুলোতে নয়, বরং আরো অনেক নগর কেন্দ্রগুলোতে নগর উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ করে এমন একটি সুগঠিত নগরায়ণ কৌশল গ্রহণ করা হবে।
- অব্যাহত পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন, যেখানে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলে বেশী দারিদ্র্য দৃশ্যমান। পূর্বাঞ্চলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে শ্রম ও পণ্যের চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি নীতি সহায়তা প্রয়োজন। পদ্মা সেতু এ ধরনের একটি কৌশলগত বিনিয়োগ, যা উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে সহায়ক হবে। এছাড়াও, অবকাঠামোগত উন্নয়নে অতিরিক্ত সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে।
- বিভিন্ন তথ্য এটি স্পষ্ট করে যে, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্যের ওপর একটি মারাত্মক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে দারিদ্র্য সংঘটনের মাত্রা অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে এই সকল অরক্ষণশীলতা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে দরিদ্র না হয়েও অনেকে এই কর্মসূচিগুলোর উপকার ভোগ করছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ ২০১৫) এই সমস্যাগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং এর সুষ্ঠু সমাধানকল্পে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নতুন কৌশল (সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি প্রবর্তনের একটি পরিকল্পনাসহ), কর্মসূচি ও নীতিমালা, যা সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচিকে অধিকতর দরিদ্রমুখী করবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দ্রুত বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- আয় বৈষম্য একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা, যা দারিদ্র্য কমে আনার ক্ষেত্রে মোট দেশজ আয় (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির সুফল কমিয়ে দিয়েছে। বৈষম্যের মূল কারণগুলোর সমাধানসহ উপকরণ বাজার ও শ্রমবাজার উভয়ের বৈষম্য নিরসন করে এমন নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এই ধারণাকেই স্পষ্ট করে যে, মানব ও ভৌত পুঁজিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নততর প্রবেশাধিকার এবং দরিদ্রমুখী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে উচ্চতর ব্যয় বরাদ্দই হলো আয় বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম মাধ্যম।

৪.৩ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

মৌলিকভাবে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হলো:

- ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান।
- সাধারণ দারিদ্র্যের সংঘটন একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা।
- ক্রমবর্ধনশীল আয় বৈষম্যের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং তা হ্রাসকরণ।

সারণি ৪.৩ এ দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শিত হলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হলো ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান (৩% এর কম) এবং সাধারণ দারিদ্র্যের নিরসন। এভাবে ২০৪১ অর্থবছর নাগাদ এই দারিদ্র্যকে ৫ শতাংশ এর নিচে নামিয়ে আনা। এছাড়াও, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ 'পালমা অনুপাত পরিমাপ' অনুযায়ী আয় বৈষম্য হ্রাসের জন্য একটি সংযত লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.৩: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	ভিত্তি বছরের ভিত্তি সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরীপ (২০১৬)	২০২১	২০২৫	২০৩১	২০৪১
		প্রক্ষেপণ			
চরম দারিদ্র্য	১২.৯	৮.৩৮	৫.২৮	২.৫৫	০.৬৮
দারিদ্র্য	২৪.৩	১৭.২৭	১২.১৭	৭.০	২.৫৯
আয় বৈষম্য (পালমা অনুপাত) [৪]	২.৯৩	২.৯৩	২.৮০	২.৭৫	২.৭০

উৎস : জিইডি অভিক্ষেপ

৪.৪ দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কর্মকৌশল

সারণি ৪.৩ এ বিধৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত দারিদ্র্য নিরসন কৌশল, নীতিমালা ও কর্মসূচিসমূহের ভিত্তিমূলে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হতে লব্ধ শিক্ষা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। নিম্নে প্রধান কৌশলগত উপাদানগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির অব্যাহত গতি অর্জন

দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতাসহ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রবৃদ্ধির একটি দ্রুত হার ত্বরান্বিত করা ও তা অব্যাহত রাখা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য নির্দেশক প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০২১-২০৪১ মেয়াদে বাংলাদেশে বার্ষিক গড় ৯% হারে বৃদ্ধি প্রয়োজন। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তেমন কঠিন হবে না, কেননা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ৮% মাত্রায় তার জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উন্নীত করতে পেরেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো বিষয়ে অধ্যায়-৩ এ বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এতে দেখানো হয়েছে যে, উন্নত শ্রম উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত রূপান্তর, শ্রমঘন রপ্তানি এবং বিনিয়োগ হার ত্বরান্বিতকরণের ওপর স্থাপিত হবে প্রবৃদ্ধির অধিকতর ত্বরান্বিতকরণের ভিত্তি। উচ্চ প্রবৃদ্ধি তৈরি করবে কর্মসংস্থান ও আয়ের ভিত্তি যা দারিদ্র্যকে

৪ আয় বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের গতানুগতিক গিনি সহগের পরিবর্তে পালমা সূচক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পালমা অনুপাত হলো আয় বন্টনের শীর্ষে ১০% এর শেয়ার, যা তল দেশের ৪০% এর শেয়ার দ্বারা ভাগকৃত। এটি আয় বৈষম্যের উন্নততর পরিমাপ পদ্ধতি, কেননা অধিকাংশ আয়-বৈষম্য ঘটে থাকে এই দুই পুচ্ছের মধ্যে ব্যবধানের কারনে। বিশদভাবে জানার জন্য ওসমানীর প্রেক্ষাপট গবেষণপত্র দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া এটি এসডিজি নির্দেশক যা আয় বৈষম্য হ্রাসে অগ্রগতি নিরূপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিম্নগামী করাসহ উচ্চতর ভোগ ও জীবনমানকে উৎসাহিত করবে। তদুপরি, উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি কর ভিত্তি প্রশস্ততর করবে এবং দারিদ্র্য নিরসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র্যনিরোধী কর্মসূচিগুলোতে অর্থায়নের জন্য সম্পদ সমাবেশের সক্ষমতা বাড়াবে।

উৎপাদন ভিত্তির কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্রমুখী করা

অতীত অভিজ্ঞতা দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উৎপাদন কাঠামো পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে। কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্ষীণ হয়ে আসায় এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে খামারের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার জন্য কৃষিতে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়, যা দারিদ্র্য নিরসনে বেশ সহায়ক হয়। খামার-বহির্ভূত বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় তা গ্রামীণ আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্র্যও কমিয়ে আনে। দারিদ্র্য নিরসনের এই গতি ধরে রাখতে উৎপাদন কাঠামোয় এই কাঠামোগত রূপান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে। প্রবৃদ্ধি যাতে দরিদ্রমুখী হয়, তা নিশ্চিত করাই একটি বড় সমস্যা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় দেখানো হয়েছে যে, কৃষির জিডিপি ও কর্মসংস্থানের অংশে হয়তো নিম্নমুখিতা অব্যাহত থাকবে। পক্ষান্তরে, ম্যানুফ্যাকচারিং এর অংশ বৃদ্ধি পাবে। সেবা খাতে জিডিপির অংশও কমতে পারে, তবে এর কর্মসংস্থান অংশের প্রবৃদ্ধি হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যমাত্রার সাথে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সংগঠনের এই খাতওয়ারি বিন্যাস মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে উৎপাদন পথের সাথে কর্মসংস্থান পথের অভ্যন্তরীণ সঙ্গতিবিধান এবং এর সাথে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি চাহিদার মেলবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে না। এজন্য উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে, বেশ কয়েকটি সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হবে। প্রথমত, কৃষি খাতে জিডিপি ও কর্মসংস্থান অংশ ক্রমশ সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও এখন থেকে ২০৩১ সালের মধ্যবর্তী মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কৃষির প্রধান ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধায় সহজলভ্যতা, রপ্তানি সহায়তার মাধ্যমে খামার উৎপাদনে বহুমুখিতা শক্তিশালী করতে নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য। বিশেষ করে, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, দুধ উৎপাদন এবং ফলমূল, শাকসব্জি ও ফুল চাষের ভূমিকা আরো সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে যেহেতু উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ আসতে থাকবে, বাংলাদেশের জন্য তাই একটি শ্রমঘন রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ করাই সমীচীন হবে। এই কৌশলেরই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি পোশাক খাতের সাফল্য। তৈরি পোশাক খাতের মতো একই ধরনের একটি প্রণোদনা পরিবেশ তৈরি করে অন্যান্য শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে। বাণিজ্যনীতির রপ্তানিবিমুখ প্রবণতার মূলোচ্ছেদই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রণোদনা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য গৃহীত বাণিজ্য ও শিল্পায়ন নীতি বিষয়ে অধ্যায় ৭ এ বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং উদ্যোগসমূহে বহুজনের কর্মসংস্থান হয়, তবে এগুলোতে গতিশীলতার অভাব রয়েছে এবং এগুলো নিম্ন উৎপাদনশীলতা, নিম্ন বিনিয়োগ, নিম্ন মানের দক্ষতা ও নিম্ন প্রযুক্তি সমস্যায় আকীর্ণ। এই প্রতিবন্ধকতা গুলোর মোকাবেলা করা হবে। বিশেষ করে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে উন্নত অভিগম্যতার মাধ্যমে অর্থায়ন সমস্যার মোকাবেলা করাই হবে সর্বাধিক গুরুত্ববহ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে শিল্পায়ন কৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে বহুজাতিক বৃহৎ শিল্পকারখানাসহ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে উৎপাদন শৃংখলে বিভিন্ন ধরনের সংযোগ ঘটানো (ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন)।

চতুর্থত, বৈশ্বিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত আরো বেশি করে প্রযুক্তি-প্রবণ, স্বয়ংক্রিয় ও পুঁজিঘন হয়ে উঠেছে। তাই প্রযুক্তি ও পুঁজি ঘনত্বের পছন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যার একটি নীতি সংশ্লিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উৎপাদনশীলতার ধরন যেমন আধুনিক প্রযুক্তির গ্রহণ নির্ধারণ করে, ঠিক তেমনি করে উপকরণ মূল্যায়ন নীতি দ্বারা পুঁজি ঘনত্বের পছন্দ প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে নীতি কাঠামোতে কখনোই পুঁজিঘন প্রযুক্তির ব্যবহারে ভর্তুকির ব্যবস্থা থাকবে না।

পঞ্চমত, ক্রমবর্ধনশীল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত হতে প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্ট হওয়ায় সেবা খাত ক্রমান্বয়ে আরো বেশি সুসংগঠিত হবে। এই পরিবর্তনশীল বাজারে দরিদ্রজনের অংশগ্রহণ সক্ষমতা বৃদ্ধির অনুকূলে গৃহীত নীতি কাঠামো দ্বারা পরিবহন ও ব্যক্তিগত সেবা সহ বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকায়নে সহায়তা দান করা হবে। এই তিনটি সেবা প্রধানত অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির এবং এখান থেকেই আসবে সেবা খাতে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড়ো অংশ, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকবে। এই কর্মকান্ডসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনায় মস্ত বড় বাধা হলো আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির অভাব। ম্যানুফ্যাকচারিংসহ

সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের অনুকূলে এককেন্দ্রিক বা ওয়ান-স্টপ সেবা সহায়তা প্রদানের জন্য যুক্তরাজ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসবিডিএ) গঠন করা হয়। এটি ছিল একটি অত্যন্ত সফল নীতি পদক্ষেপ, বাংলাদেশও ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের বিকাশে অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে এবং এভাবে দেশে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পারে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব পুঁজির ভিত্তি শক্তিশালীকরণ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে অব্যাহত দারিদ্র্য নিরসনের জন্য এই কৌশলগত উপাদান অপরিহার্য শর্ত। দারিদ্র্য নিরসনের অতীত রেকর্ডে মানব পুঁজির ইতিবাচক ভূমিকা ইতোমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়েছে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে এটি আরো অধিকতর প্রাধান্য লাভ করবে। পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান কাঠামোতে কর্মসংস্থানের বেশির ভাগের যোগান আসবে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবা থেকে। তার চাহিদা হবে এমন শ্রম, যা দক্ষ বা আধা-দক্ষ। অটোমেশনের সাথে বৈশ্বিক অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট হবে দক্ষ শ্রম চাহিদার ওপর অতিরিক্ত চাপ। এই পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, এজন্য তাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় দক্ষতা আয়ত্তে আনতে হবে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, যা বিদ্যালয় থেকে শুরু করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী বছরগুলোতে তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মানব পুঁজিগঠনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগই হবে বাংলাদেশের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো নীতি-চ্যালেঞ্জ। এজন্য যথাগুরুত্বসহ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুযোগের বিস্তার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূল করার স্বার্থে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত অর্থায়ন। এজন্য কার্যকর বিনিয়োগ শুরু করতে হবে একেবারে মায়ের উন্নয়ন থেকে, তার শিক্ষা থেকে বিয়ের সিদ্ধান্ত, গর্ভধারণ থেকে শিশুর পরিচর্যা পর্যন্ত। এর প্রতিটি পর্যায়েই বৈষম্য প্রভাব বিস্তার করে যা ক্রমাগত নিচের দিকে বর্ধিতহারে বৃদ্ধি পায়। অগ্রগতি সত্ত্বেও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসহ সকল ক্ষেত্রেই মানব উন্নয়নের জন্য সমস্যা অপরিমেয়। অধ্যায় ৫ এ এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নে অভিগম্যতার উন্নতি বিধান

বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরোধী কর্ম পরিচালনার অতীত অভিজ্ঞতা দ্বারা এটি সপ্রমাণিত যে, দারিদ্র্য নিরসনের জন্য অর্থায়নে অভিগম্যতার গুরুত্ব সর্বাধিক। সরকারি নীতি দ্বারা সমর্থিত ক্ষুদ্র ঋণ বিপ্লব এটিকে সম্ভব করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ওপর আরো শক্তভাবে গড়ে তোলা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তি ও এর ব্যাপ্তির বিস্তার, ঋণের ব্যয় হ্রাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধায় দরিদ্রদের অধিকতর অভিগম্যতার উন্নতি বিধান। ক্রেডিট ব্যুরো, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ও 'ফিনটেক' উদ্যোগমালার মতো গুচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণবাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে ঋণবাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্থার উন্নতি, তথ্য ও বাধ্যকতার ব্যয় হ্রাস এবং দরিদ্রজনের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ ঋণের ঝুঁকি হ্রাস। আরেকটি প্রধান নীতি-উদ্যোগ হবে ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোগ বিকাশের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ সেবা কেন্দ্রের মতো একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসবিডিএ) স্থাপন করে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবায় শহর ও গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে গতিশীল করে তোলা। এসবিডিএ'র মূল কাজ হবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে উন্নত অভিগম্যতা। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অর্থায়ন বাতায়ন ও এমএমই ফাউন্ডেশনের মতো বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর এসবিডিএ গড়ে উঠবে। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপিত হবে।

অভিবাসী শ্রমবাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বর্ধনশীল অভিগম্যতা

বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক অভিবাসন এবং রেমিট্যান্স আকারে আয়ের অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে আসছে। জেলা পর্যায়ের বিশ্লেষণ এই অবদানকে অধিকতর আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে।

এই বিশ্লেষণ থেকে এটিও বেরিয়ে আসে যে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত দারিদ্র্য পীড়িত দুর্যোগপ্রবণ বেশ কিছু জেলার জনগণের পক্ষে অভিবাসনের উচ্চ ব্যয়, প্রশিক্ষণের অভাব এবং তথ্যে অভিগম্যতার অভাব বিভিন্ন কারণে অভিবাসী শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূত্রপাত, তথ্যে অভিগম্যতা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অভিবাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো শোষণমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এই সমস্যাগুলো ক্রমপরম্পরায় সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তার মাঠ

পর্যায়ের অফিসগুলোর মাধ্যমে এতে নেতৃত্ব দান করবে। লোকবল বৃদ্ধি ও ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর কর্মতৎপরতা জোরদার করা হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা জেলাগুলোতেই অগ্রাধিকার দান করা হবে। অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী যাতে প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ আয়ের ভিত্তিতে ঋণ সুবিধা পায় সরকার এর অনুকূলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

সুষম নগরায়ণ

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন হেতু নগর সেবায় ক্রমবর্ধিত চাপ এবং বিশেষ করে গরিবদের জন্য নগরে বসবাসের সংশ্লিষ্ট নিম্নমান আইন ও শৃংখলা বজায় রাখাসহ নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য একটি বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ হতে পারে। একটি কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে নগর-কেন্দ্রিক শিল্প-অর্থনীতিতে মসৃণ উত্তরণ নিশ্চিত করার ওপর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে, নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (এলজিআই) যথাযথভাবে ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে নগরায়ণের সকল প্রান্ত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরকার পুরোপুরি অবহিত। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাতেও দেখা যায়, নগরায়ণে বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি দ্বারাই স্বায়ত্তশাসিত নগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা নগরের অধিবাসীদের কাছে জবাবদিহিতার জন্য দায়ী থাকে- এটিই হলো একটি সুশৃংখল নগরায়ণ নিশ্চিত করার টেকসই উপায়। সরকার রাজনৈতিক, আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে এই বিকেন্দ্রীকৃত নগর উন্নয়নের অনুকূলে সহায়তা দান করবে। প্রথম পর্যায়ে, লক্ষ্য হবে অন্ততপক্ষে আটটি আঞ্চলিক নগর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা: ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট যুক্তিযুক্তভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, প্রধান গুরুত্ব দেয়া হবে অবশিষ্ট পাঁচটি নগরের নাগরিক সুবিধা সংবলিত অবকাঠামো শক্তিশালী করা। এ বিষয়ে অধ্যায় **১১** এ বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। আটটি বিভাগীয় শহরের প্রতিটিতে একটি করে আঞ্চলিক নগর কেন্দ্র স্থাপন করা একটি উত্তম কৌশল হবে। এছাড়া, ঢাকা মহানগরের কাছে নগর কেন্দ্র স্থাপন একই ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আটটি বিভাগীয় শহরের সাথে নারায়ণগঞ্জ ,গাজীপুর ও কুমিল্লা-কে সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং, আটটি বিভাগীয় শহরসহ এগারটি সিটি কর্পোরেশনে প্রধানভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধ্যায় **১১** এ বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন

দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। সরকার চায় সকল জেলায় একেবারে গ্রাম পর্যায়ে থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং উন্নয়নের সুফল সম্মিলিতভাবে ভোগ করবে। সরকার জানে যে, ভৌগোলিক অবস্থানসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চল পিছিয়ে রয়েছে। বেশকিছু নীতি উদ্যোগের মাধ্যমে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের ওপর ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাদ্বয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় খামার উৎপাদন ও জেলার অবকাঠামোর উন্নতিকল্পে সরকারি উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণ প্রাপ্তি সুবিধার উন্নয়ন, এবং প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোর সাথে দূরবর্তী জেলাসমূহের বর্ধিত সংযোগশীলতা স্থাপন। এক্ষেত্রে, বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ এবং চলমান পদ্মা সেতুর নির্মাণ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এছাড়াও, আন্তঃনগর বিমান পরিবহন ও সড়ক সংযোগও শক্তিশালী হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং প্রধান আন্তঃনগর জনপথগুলোর অধিকতর উন্নয়ন সাধনের এই প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করবে। উপরিবর্ণিত নগরায়ণ কৌশল বাস্তবায়ন আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পরিবেশ পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলাগুলোর ক্ষতি প্রবণতা কমিয়ে আনা

বাংলাদেশের **১৫**টি দরিদ্রতম জেলার অধিকাংশই বন্যা, নদী ভাঙ্গন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত উচ্চ অরক্ষণশীলতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কুড়িগ্রামের দৃষ্টান্ত উদ্বেগজনক, দারিদ্র্য সংগঠন এমন কি স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছর পরেও খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) ২০১৬ এর প্রাক্কলন অনুযায়ী এখানে দারিদ্যের অভিঘাতের হার ৭০%। এটি সবার জানা যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক থেকে সবচেয়ে অরক্ষিত জেলাগুলোর মধ্যে কুড়িগ্রাম অন্যতম। প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবেশমুখে অবস্থিত কুড়িগ্রাম প্রতি বছর বন্যা ও প্লাবনের শিকার হয়, যা এর সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। দারিদ্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সংযুক্তির অনুরূপ আরো দৃষ্টান্ত আছে। সরকার বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বিডিপি ২১০০) দ্বারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার দূরদর্শী উদ্দিষ্ট হলো কৌশল, নীতি, বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন,

বাস্তুতন্ত্র, ভূমি ও পানির উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, বিডিপি ২১০০ এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সৃষ্ট অরক্ষণশীলতার সমাধানে একেবারে উৎস পর্যায়ে এই ঝুঁকিসমূহের মোকাবেলা করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য নীতি বিন্যাসের প্রধান উপাদান হবে প্রতিবেশের ভারসাম্যসহ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, সেচ, পানি সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর দারিদ্র্যমুখিতার দ্রুত উন্নতি সাধন

সামাজিক সুরক্ষার বর্তমান ব্যবস্থায় আশু পরিবর্তনের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। এটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের মূল উপাদানগুলোর একটি। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটাবে এবং বেসরকারি খাতের অর্থায়ন পুষ্ট কর্মসংস্থানভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান রীতির আধুনিকায়নেও সহায়ক হবে। এগুলোর উদাহরণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য বিমা, বেকারত্ব বিমা, দুর্ঘটনা বিমা ও মাতৃত্বজনিত ছুটি। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহের মূল উপাদান এই যে, বেসরকারি খাত দ্বারা অর্থায়নপুষ্ট সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো যথাযথভাবে একীভূত করার মাধ্যমে কর্মস্থলের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আধুনিকায়ন এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে উপযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে এর অনুকূলে সমর্থন দান। দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনচক্র স্কিমগুলো থেকে মূল কর্মসূচিগুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এ ধরনের কর্মসূচি গুলোতে পর্যাপ্ত তহবিল সহায়তা দেয়া হবে। অপব্যবহারের বিলোপ সাধন ও দক্ষতার উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন করা হবে। অধিকাংশ কর্মসূচি হবে নগদ অর্থভিত্তিক এবং তা অনলাইনে হস্তান্তরিত হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহের বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে অব্যাহত প্রচেষ্টার একটি উপকরণ হিসেবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পাশাপাশি উপকারভোগীদের সনাক্ত করতে একটি উপযুক্ত তথ্য ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি বা ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা হবে।

৪.৫ আয় বৈষম্যের মোকাবেলা

আয় বৈষম্য মূলত বাজার অর্থনীতিরই একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, এর কারণ নিহিত রয়েছে এর প্রাথমিক পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, যেখানে সম্পদ ও মানব পুঁজি অসমভাবে বন্টনকৃত। সরকারি নীতির জন্য মূল চ্যালেঞ্জ হলো সরকারি ব্যয় নির্বাহ কর্মসূচি ও যথাযথ নীতির সাথে ভারসাম্যের উন্নতি বিধান। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার উত্তম কর্মপদ্ধতির উদাহরণ থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো, বিশেষ করে ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও জার্মানি এবং কানাডা, জাপান ও কোরিয়া- এর সবগুলোই আয় বৈষম্যের একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রাসহ উচ্চ আয়ের সুবিধা ভোগ করে। আয় বৈষম্য হ্রাসের জন্য প্রধান কৌশল হিসেবে একটি প্রগতিশীল ব্যক্তি আয়করের ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষায় বৃহৎ দক্ষ সরকারি ব্যয় নির্বাহের সমন্বয় ঘটানোর ফলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। যেমন, সুইডেনে সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির ১৭-১৮% এবং শিক্ষায় জিডিপির ৬-৭% ব্যয় করা হয়। এই পরিমাণ তার বহিঃরূপ, তবে তা সরকারি ব্যয়ের ক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে সামনে তুলে ধরে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বাংলাদেশে একটি পুনর্বন্টনমূলক রাজস্ব নীতি প্রবর্তন করা হবে। যা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় নির্বাহের মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে সহায়ক হবে। ব্যাপক ভিত্তিক ও গতিশীল বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তি আয়কর ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত বাড়তি রাজস্ব হতে এই ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এই কর্মসূচিগুলোতে সরকারি ব্যয়ের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাধান্য থাকবে দরিদ্র, অরক্ষিত ও স্বল্প আয় গোষ্ঠীর জনগণ।

৪.৬ কাউকে পেছনে ফেলে নয়

একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে দেশের সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত, সবচেয়ে দুর্বল, প্রান্তিক এবং জনসংখ্যার বঞ্চিত অংশের পদক্ষেপ উন্নয়নে প্রয়োজন। এটি প্রমাণিত যে, প্রান্তিক মানুষ দারিদ্র্যের জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি এবং সাধারণত তারা মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হয়। এসডিজি'র মূলনীতি স্পষ্টভাবে এটিই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রান্তিক জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা করে তাদের জীবনকে এগিয়ে না নিতে পারলে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধ জাতি অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দাম অধরা থেকে যাবে । তবে বৈষম্য, অসমতা এবং সামাজিক বর্জনের মূল কারণগুলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন না করে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা কঠিন হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমভূমি উভয় অঞ্চলেই এমন বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী রয়েছে, যেমন হিজড়া সম্প্রদায়, জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যৌনকর্মী, বস্তিতে বসবাসকারী মানুষ, পথশিশু, বেদে সম্প্রদায় ইত্যাদি যারা মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে, তাদের চ্যালঞ্জ মোকাবেলায় কোনও একক পদেক্ষেপই যথেষ্ট নয়।

সরকার সামাজিক সুরক্ষার বাইরেও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার সময় সবার জন্য সমান সুযোগ প্রদান অব্যাহত রাখবে। বিগত পরিকল্পনাগুলিতে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশের উন্নয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার দৃ ষ্ঠিকোণ থেকে দেখা হত। রূপকল্প ২০৪১ সমৃদ্ধি অর্জনে এবং একই সাথে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের গঠনের জন্য তৈরি হবে যা সর্বাধিক দুর্বল জনগোষ্ঠিরও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে অবদান রাখতে পারবে। সরকার জাতিগত সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূরণ করে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য , পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইটি) চুক্তি ১৯৯৭ কে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং জমি অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অব্যাহত সৃষ্টি, আইসিটি, ক্ষুদ্রঋণ সম্প্রসারণ এবং সামাজিক সুরক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলে বনাঞ্চলের আওতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায়ও পদক্ষেপ নেয়া হবে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিশ্রুতি ও নীতিমালা অনুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণের সুবিধার্থে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি বাজেটরি ব্যবস্থাসহ জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মূলধারায় আনা হবে।

দলিত, বেদে সম্প্রদায় এবং যৌনকর্মীরা হলো সামাজিকভাবে বাদ পড়া গোষ্ঠী যারা অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক উভয় বৈষম্যের শিকার হয়। সরকারি চাকরিতে তাদের বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তাদের জীবনমান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, স্যানিটশেন, কর্মসংস্থানের অভিগম্যতা/সুযোগ প্রদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ৫

মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং জনমিতিক লভ্যাংশ আহরণ

মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন এবং জনমিতিক লভ্যাংশ আহরণ

৫.১ প্রেক্ষাপট

রূপকল্প ২০৪১ এবং এর সহযোগী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল নির্দেশনা হলো এমন একটি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন যেখানে সকল নাগরিকের জন্য জীবনযাত্রার মান হবে উন্নততর, সবাই হবে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাবে উন্নততর সামাজিক ন্যায়বিচার এবং একটি অধিকতর ন্যায্য আর্থসামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ। বস্তুত উচ্চ -মধ্য-আয় দেশ ও উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি হবে একটি সুচিন্তিত মানব উন্নয়ন কৌশলসহ বলিষ্ঠ অগ্রগতি। এ কারণেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ একটি সুস্থ ও দক্ষ শ্রমশক্তির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা দানসহ সম্পদ উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৫.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে মানব উন্নয়নে অগ্রগতি

মানব উন্নয়নের জন্য উচ্চাভিলাসী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অভিযাত্রা সূচিত হয়েছিল। জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিক থেকে এতে জোর দেয়া হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো কমিয়ে আনাসহ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও শিশু পুষ্টি উন্নয়নের ওপর। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক হতে এর উদ্দেশ্য ছিল স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা দক্ষতার নিম্নস্তর থেকে যুব জনগোষ্ঠী ও বর্ধনশীল শ্রমশক্তির জন্য সাক্ষরতা হারের দ্রুত বৃদ্ধি এবং মৌলিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। মানব উন্নয়নের এই লক্ষ্যমাত্রা যদি অর্জিত হতো তাহলে বাংলাদেশ অনায়াসেই উচ্চ মধ্যম আয় দেশে উন্নীত হতে পারতো।

তথ্য প্রমাণাদি থেকে এটি স্পষ্ট যে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মোট প্রজনন হারও অব্যাহতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো কমে গিয়ে প্রায় ১.২ শতাংশ দাঁড়িয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১% এ নামিয়ে আনার যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়, তা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয়। আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে ৭০ বছর প্রত্যাশিত বয়সের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়, তা এর অনেক আগেই ২০১৮ তে ৭২.৩ বছরে উন্নীত হয়। ২০১৮ তে শিশুমৃত্যু হার আরো হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে ২২ জনে নেমে আসে। দীর্ঘমেয়াদি গতিধারার ভিত্তিতে শিশুমৃত্যু হার ২০২১ সালের মধ্যে প্রতি হাজারে ২০ জনে নামিয়ে আনার যে প্রক্ষেপণ করা হয় তা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ ১৫ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রার চাইতে খানিকটা উপরে। তবে শিশুমৃত্যু হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। মাতৃত্বজনিত মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি হয় প্রতি লক্ষে ১৬৯ জনে যা ২০১০ সালে ছিলো ২১৬। ২০২১ সালের মধ্যে প্রতি লক্ষে ৫৭ জনের লক্ষ্যের তুলনায় এই অগ্রগতি কম। জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নয়ন দৃশ্যমান হলেও মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত অগ্রগতি এর একটি বড় দুর্বলতা। এজন্য আশু নীতি-পদক্ষেপ নেয়া দরকার। শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে উন্নয়নে অগ্রগতি প্রতিফলিত হয় খর্বতা হ্রাসে, যা ২০১১ এর ৪১.৩ শতাংশ হতে ২০১৯ তে নেমে আসে ২৮ শতাংশে। এটি ভালো অগ্রগতি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মেয়াদে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নত পুষ্টি নীতির সাফল্য নির্দেশ করে। ২০২১ সালে খর্বতা ৩৩ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে উপরিবর্ণিত অগ্রগতি প্রাতিষ্ঠানিক দিক হতে, বিশেষ করে সম্পদ সংগ্রহ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন দ্বারা আরো সুসংহত হয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশের সাফল্য সুবিদিত এবং এতে বৈশ্বিক মনোযোগও আকৃষ্ট হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের উন্নয়ন তৎপরতা সবসময়েই পরিচালিত হয় স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার, সেবা দাতাদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং পরিচর্যার মান উন্নত করার লক্ষ্যে। সমগ্র দেশ ব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন সরকারের একটি মর্যাদাবাহী কর্মসূচি। যা তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পব্যয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কমিউনিটি ক্লিনিক (সিসি) ভিত্তিক সেবা সুবিধার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (বিশেষ করে নারীদের) জন্য সামষ্টিক অংশগ্রহণসহ সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ ট্রাস্ট তহবিলের জন্য অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার "কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১৮"শিরোনামে একটি আইন অনুমোদন করে। এমডিজি-সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য লক্ষ্য অর্জনে অসামান্য সাফল্য দেশকে একটি বিশেষ অবস্থানে এনে দেয়, যেখান থেকে বাংলাদেশ এখন উচ্চাভিলাসী দৃষ্টি নিয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা (ইউএইচসি) সহ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে চলেছে। তবে বহু কিছু অর্জন সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এখনো বড় ধরনের অসাম্য বিদ্যমান, যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। অসংক্রামক রোগের (এনসিডি)

কারণে মৃত্যুহার; নিজস্ব বাড়তি চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস; সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন; সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা উন্নয়ন; সেবা মানের উন্নয়ন; বেসরকারি খাত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা; এবং পরিচর্যা মানের জন্য স্বীকৃতি অর্জনে সমস্যা রয়েছে।

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশলকে এগিয়ে নিতে যে সমস্যার মুখোমুখী হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো সরকারি ব্যয়ের স্বল্পতা। বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ এটি জিডিপির ০.৭% এ স্থির হয়ে আছে। স্বল্প সরকারি ব্যয়ে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশলকে এগিয়ে নিতে ব্যাপক ইতিবাচক অর্জনে সরকার অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারে। তবে সামনে এগোনোর ক্ষেত্রে এটি আর টেকসই হবে না যখন গণ-সংক্রামক ব্যাধির (কলেরা, ম্যালেরিয়া, টিবি, পোলিও) প্রকোপ কমে গেলেও এ ব্যাধিগুলোর স্বল্পমূল্যের প্রতিষেধক নিরাময়যোগ্য সমাধানের স্থলে যেমনটি উচ্চ-আয় দেশগুলোতে সচরাচর ঘটে থাকে তেমন একটি অধিকতর জটিল ও ব্যয়বহুল প্রকৃতির মহামারী যদি বিস্তৃতি পায়। দেশের আয় বেড়ে যাবার সাথে যখন জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশলকে এগিয়ে নিতে ব্যয়ের মূল উৎস হবে বেসরকারি ব্যয়, তখন গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশলকে এগিয়ে নিতে সেবায় অভিগম্যতা বাড়ানোর জন্য গবেষণাসহ দরিদ্র ও বয়োবৃদ্ধদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার ভর্তুকিতে সরকারি ব্যয় হয়ে দাঁড়াবে ব্যয়ের প্রধান খাত। তদুপরি, যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশলে স্বাস্থ্য বিমার বিষয়টি অনুপস্থিত।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ কৌশলের প্রধান উদ্দিষ্ট ছিল ২০২১ সালের মধ্যে “সকলের জন্য শিক্ষা”র লক্ষ্য অর্জন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল: (১) শতভাগ বয়স্ক (১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী) সাক্ষরতা অর্জন; এবং (২) নিট প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হারে শতভাগ অর্জন। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় বর্ধিত হারে ভর্তি; সকল পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন; একটি সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে শ্রমশক্তির শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন; এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিস্তার।

বয়স্ক সাক্ষরতা হার উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে, ২০১০ এর ৫৮.৬% থেকে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ তে উন্নীত হয় ৭৩.৯% এ। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর সাক্ষরতায় যে ব্যবধান ছিল তা অব্যাহতভাবে সংকুচিত হয়ে আসে। তবে, বর্তমানে যে গতিধারায় এগিয়ে চলেছে তাতে করে ২০২১ সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষা হার শতভাগ অর্জন কঠিন হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ভালো এবং লৈঙ্গিক ব্যবধানও কমে আসছে। ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বহুলাংশেই অর্জিত হয়েছে। সরকারের “সকলের জন্য শিক্ষা ”কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তারে অগ্রগতি হলেও এর কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন[৫]। ২০২১ সালের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শতভাগ সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নিট ভর্তি হার ২০১০ এর ৪৬% থেকে ২০১৮ তে ৬৭%এ উন্নীত হয়। একই সময়ে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি পায় ১১% থেকে ২১% এ। উচ্চ শিক্ষায় সরকারের উদারনীতি বেসরকারি খাতের বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এই সহায়ক নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের নীতি-সাফল্য, বিশেষ করে যখন উচ্চ শিক্ষার বিস্তৃতি সীমিত ও সরকারি বাজেটে আর্থিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। উচ্চ শিক্ষার বিস্তার অধিকতর ত্বরান্বিত করতে সরকার ২০১৭ তে “বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা: ২০১৭-২০৩১” গ্রহণ করে।

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রধান কৌশল হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বা ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। আনুষ্ঠানিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্স, এইচএসসি (ভোকেশনাল), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট)। এই কর্মসূচিগুলো সময়-নির্দিষ্ট, প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক এবং আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়নসহ পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ সমৃদ্ধ। কোর্সগুলো প্রদান করা হয় প্রকৌশল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কারিগরি স্কুল ও কলেজ, কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ও অন্যান্য কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান থেকে। ভর্তি হার ২০০৯ এর ১% থেকে ২০১৮ তে ১৬.০৫% এ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে আইসিটি খাতে এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ-অন্বেষণের জন্য বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে।

৫ দ্রষ্টব্যঃ “বাংলাদেশ এডুকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান” জিইডি ২০১৭।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (টিভেট) ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এই নীতিদ্বয়ে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা কর্মসূচির বিস্তার, বৈচিত্র্যায়ন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের বিশদ পরিকল্পনা সন্নিবেশিত হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির অধীনে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার মান ও স্থিরতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো গঠন করা হয়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও সরকারের অর্থায়নে "কর্মসংস্থান বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য দক্ষতা", যা একগুচ্ছ শিল্প সমিতি, যেমন বেসিস, বিটিএমএ, বিজিএমইএ, এইওএসআইবি ও অন্যান্যের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে প্রযোয্য ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা-প্রত্যয়নসহ কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য টিভেট কার্যক্রম বিকশিত ও শক্তিশালী করতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ একটি সমন্বিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচির উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এই নীতিমালার ফলে টিভেট ব্যবস্থা হতে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে চাকুরির বাজার ও লব্ধ দক্ষতার মধ্যে একটি বড় ধরনের ব্যবধান এখনো বিদ্যমান। ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম ও উচ্চ দক্ষ সেবা উদ্যোগ সমূহকে এখনো দক্ষতা ঘাটতির মোকাবেলা করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিদেশ হতে দক্ষ কর্মী নিয়োগের আশ্রয় নিতে হয়।

শিক্ষার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দান এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, বেশ কিছু ক্ষেত্রে, পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক হতেই বাংলাদেশকে এখনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরিমাণগত দিক থেকে, বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে, অভিগম্যতা ও ঝরে পড়া বেশ বড় সমস্যা। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৮ তে ঝরে পড়ার হার ছিল ১৮.৬ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, অবকাঠামোসহ ভৌত ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার অভাবের মতো বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো উচ্চ শিক্ষাকে, ব্যাপক বেসরকারি বিনিয়োগ সত্ত্বেও, ভর্তি হারের দিক হতে ১৮ শতাংশে সীমিত রেখেছে। শিক্ষার সকল স্তরে গুণগত মান অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, যা বিশেষভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবল, যার ধারা পরবর্তী স্তরগুলোতেও বহমান।

জ্ঞানসংক্রান্ত দক্ষতাসহ উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণমূলক সক্ষমতার দিক হতে গুণগত বিষয়টি ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন এমনকি শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় সমাপ্তির পরেও শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায়শই মৌলিক কারিগরি দক্ষতায় ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের প্রায়ই চাকুরির বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। তদুপরি, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিম্ন অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতার নিম্ন মান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় স্বল্প দক্ষতার ব্যবধানে অবদান রাখে। কর্মস্থলে যে দক্ষতার চাহিদা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় তা সব সময়ে পাওয়া যায় না। দক্ষতা ঘাটতির এই সমস্যা সমাধানের জন্য সতর্ক ও সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

পরিমাণগত ও গুণগত সমস্যাবলির পেছনে যে কারণগুলো সক্রিয় তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা খাতে নিম্ন বাজেট বরাদ্দ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিডিপির ২% এরও নিচে। এই বরাদ্দ ২০১৮ অর্থবছরে জিডিপির ২.৫ শতাংশে উন্নীত করার কর্মসূচি নেয়া হলেও এই উচ্চতর বরাদ্দের কর্মসূচির পূর্ণ বাস্তবায়নের বিষয়টি অনিশ্চিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কৌশল ও নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন ব্যহত হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন বাজেট বরাদ্দকে প্রায়শই একটি বড় অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এছাড়াও, উদ্বেগের অপর বিষয়গুলোর মাঝে রয়েছে শিক্ষা ব্যয়ের ন্যায্যতা এবং বিদ্যমান লৈঙ্গিক ব্যবধান নারী-পুরুষ বৈষম্য। ন্যায্যতার দিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে গরিবদের মোট ভর্তির হার মাত্র ২৪%, যা অ-গরিবদের তুলনায় (৭৬%) উল্লেখযোগ্যভাবে কম। লিঙ্গ সমতার দিক থেকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে লৈঙ্গিক ব্যবধান কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেও উচ্চ শিক্ষা স্তরে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশের শ্রম বাজারে নারীদের নিম্ন অংশগ্রহণ (২০১৭ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ৩৬.৩%) এবং নিম্ন মজুরি ও নিম্ন উৎপাদনশীল কাজে তাদের উচ্চ সমাবেশের অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের নিম্ন মাত্রা। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ২৬ শতাংশ মাত্র।

৫.৩ মানব উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ রূপকল্প

মানব উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ রূপকল্প বস্তুত মূল প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা দ্বারা চালিত, যার উদ্দেশ্য ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের প্রায় অবসানসহ উচ্চ-আয় মর্যাদা অর্জন। বিশেষ করে, নিম্ন বিষয়াবলি ঘিরে রূপকল্প তৈরি হয়:

- একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা।
- জনসংখ্যার শতভাগ সাক্ষরতা হার দ্বারা জাতীয় ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারার সক্ষমতা বোঝানো হয়েছে।
- ১২ বছর পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা।
- চাকুরিভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী সকলের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সরবরাহ।
- সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য বিমা স্কিমে সর্বজনীন অংশগ্রহণের সুযোগ।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য টিভেট-কে মূলধারায় স্থাপন।
- সংগঠিত খাতে সকল কর্মীদের চাকুরিভিত্তিক দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য বিমা স্কিমের শতভাগ আওতায় আনয়ন।
- প্রতি উপজেলা থেকে প্রতি বছর ১০০০ তরুণ-তরুণীর জন্য চাকুরির নিশ্চয়তা।

৫.৪ মানব উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা

মানব উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা এই রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে তা সারণি ৫.১ এ তুলে ধরা হলো। এই লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাসী হলেও তা উচ্চ-আয় দেশগুলোতে বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সারণি ৫.১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	২০১৮ (ভিত্তি বছর)	২০৩১ (মধ্য মেয়াদি)	২০৪১ (অভীষ্ট বছর)
ক) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা			
আয়ুষ্কাল (বছরে)	৭২.৩	৭৫	৮০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (%)	১.২	১	১
মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) (প্রতি লক্ষ জন্মে)	১৬৯	৭০	৩৬
শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জন্মে)	২২	১৫	৪
অনূর্ধ্ব ৫ বয়সী শিশুদের ওজন স্বল্পতা (৫-৫৯ মাস) %	৩৩	৫	২
খর্বতা (%)	৩১	১৫	২
মোট প্রজনন হার (টিএফআর) (%)	২.০৫	১.৮	১.৮
স্বাস্থ্য বিমার আওতা (%)	যৎসামান্য	৫০	৭৫
স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় (মোট দেশজ আয়ের %)	০.৭	১.৫	২
খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ			
বয়স্ক সাক্ষরতা হার (%)	৭২.০	১০০	১০০
নিট প্রাথমিক পর্যায়ে ভতি হার (%)	৯৭.৯	১০০	১০০
প্রাথমিক স্কুলে ঝরে-পড়া হার (%)	১৯.১	০.০	০.০
নিট মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হার (%)	৬২.৩	৯০	৯৫
মাধ্যমিক স্কুলে ঝরে-পড়া হার (%)	৩৮.৩	০.০	০.০
উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার (%)	১৭.৮	৫০	৮০
উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীদের অংশ (%)	২৬	৫০	৫০
টিভেট ভর্তির হার (%)	১৬.০৫	৩০.০০	৪১.০০
শিক্ষায় সরকারি ব্যয় (জিডিপি %)	২.০	৩.৫	৪.০

উৎস: জিইডি প্রক্ষেপণ। ভিত্তি বর্ষের তথ্য সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেকগুলো কৃতিত্বের অধিকারী। চলমান উদ্যোগসমূহের সুফল সংহত করার পাশাপাশি উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্ব প্রদান করা হলে তা সারণি ৫.১ এ উপস্থাপিত স্বাস্থ্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হবে। এছাড়াও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি বিধান করে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা পরিধি (ইউএইচসি) লক্ ষ্য অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। বিদ্যমান ব্যবধানের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমস্যা বেশ তীব্র। বিশেষ করে মানগত সমস্যা অত্যন্ত প্রবল, যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরাময় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা এগিয়ে নেবার জন্য শিক্ষায় সাফল্য অর্জন হবে মূল নির্ধারক।

৫.৫ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির (পিএইচএন) জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কৌশল ২০২১ এর আওতায় সরকারি বিতরণ ব্যবস্থাকে বেসরকারি খাতের সাথে সংযুক্ত করা হয়। স্বল্প মূল্যে বেসরকারি জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা বিতরণ যেখানে অত্যন্ত সীমিত সেখানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী সরকারি জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা বিতরণে প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়। জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সরকারি সেবার অধিকাংশই ছিল সরল স্বল্পমূল্য সরবরাহ যা গ্রামীণ ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। স্বাধীনতার প্রাথমিক বছরগুলো থেকে এই সেবা মডেল পরীক্ষিত এবং এর সুফল সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই। শহরাঞ্চলগুলোতে জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা মূলত বাজার দরে বেসরকারি সরবরাহের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। এই মডেলের সাফল্যের পিছনে যে প্রধান উপাদান কার্যকর ছিল তাহলো বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য উচ্চ চাহিদা এবং বেসরকারি ব্যয়ের বিশাল পরিমাণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের এই সফল কৌশল অবধারিতভাবে অব্যাহত থাকবে এবং জনসংখ্যার অধিকাংশের জন্য স্বাস্থ্য সেবার বেসরকারি সরবরাহ উৎসাহিত করা হবে। সেই সাথে ইচ্ছাকৃত অবহেলা প্রতিরোধ করাসহ মানসম্মত সেবা বিতরণের জন্য জবাবদিহিতাও কার্যকর করা হবে। এছাড়া যে এলাকাগুলোতে বেসরকারি খাত সঠিকভাবে সেবা পৌঁছাতে পারে না, সেই অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি সরবরাহে প্রাধান্য দান ছাড়াও, নগরের দরিদ্রজন; গণসংক্রামক ব্যাধি; উন্নতমানের সরকারি হাসপাতাল ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টি কর্মসূচি বিস্তার করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কৌশলের প্রধান উপাদানগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- **সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিকের প্রসার ও মান উন্নয়ন:** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক উন্নত ও শক্তিশালী করা; বেসরকারি সরবরাহ দ্বারা যে এলাকায় সেবা পৌঁছানো যায় না, সেখানে স্বাস্থ্য ক্লিনিক সেবার বিস্তার এবং শহরের গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করে এই ক্লিনিকগুলোকে উচ্চ-ঝুঁকি রোগব্যাধির ক্ষেত্রে ই-পরামর্শ গ্রহণের জন্য জাতীয় গবেষণা হাসপাতালগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হবে।

- **জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সুবিধা শক্তিশালীকরণ:** বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ব্যয়ভার বহনে যাদের সক্ষমতা নেই বা সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে জাতীয় হাসপাতালগুলোতে যাদের অভিজ্ঞতা নেই তাদের জন্য সঠিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালসমূহ শক্তিশালী করা হবে। বয়স্ক জনসংখ্যার অংশ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে হাসপাতাল গুলোতে বার্ধক্যজনিত রোগী পরিচর্যার সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে। ২০৩০ এর মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার এসডিজি অর্জনে সরকার গৃহীত কৌশলের এটি হবে একটি অন্যতম উপাদান।

- **জাতীয় হাসপাতাল শক্তিশালীকরণ:** উন্নত মানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এবং জটিল ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বিদ্যমান সকল জাতীয় হাসপাতাল শক্তিশালী করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দান করা হবে।

- **শিশু পুষ্টি ঘাটতি অবসান:** ২০৪১ সালের মধ্যে খর্বতা ও ওজন স্বল্পতার সংঘটন নির্মূল করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ ও সম্পদ বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারি পুষ্টি সহায়ক কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালী করার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা নেয়া হবে। শহরের বস্তিবাসী শিশু সহ গ্রামঞ্চলের গরিব পরিবারের শিশু ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুদের কাছে সুফল পৌঁছে দিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুষ্টি শিক্ষা অভিযান শক্তিশালী করা হবে।

- **বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** সৃজনশীল স্বাস্থ্য সেবা বিতরণে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নমনীয় লাইসেন্স প্রথা, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পেশাজীবীদের ব্যবহার সংক্রান্ত নমনীয় নীতিমালাসহ স্বাস্থ্য সেবায় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) উৎসাহ, রোগীদের অধিকার ও পরিচর্যার মান সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি-বিধানের সাথে পূর্ণ আনুগত্য নিশ্চিতকরণ এবং সেবা বিতরণে ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে।

- **স্বাস্থ্য বিমা স্কিম প্রবর্তন:** নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণেই দারিদ্র্য রেখার বাইরে থাকা গরিব জনগোষ্ঠীর অনেককেই আবার দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকা পড়তে হয়। এজন্যেই একটি সুষ্ঠু স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিমা স্কিমে সরকারি আর্থিক সহায়তা ও স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচির বেসরকারি সরবরাহের মধ্যে সুষম সমন্বয় সহ

এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। সরকারি স্বাস্থ্য বিমা সহায়ক কর্মসূচি হবে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির একটি অংশ এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা স্কিমে অভিগম্যতার মতো এই স্কিমগুলোতে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসৃত হবে। ইউএইচসি'তে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য বিমা স্কিম অত্যাবশ্যক।

- **স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি:** উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবার জন্য ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সেবা পেশাজীবী অর্থাৎ ডাক্তার ও নার্সদের পর্যাপ্ত সরবরাহ। স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পেশাজীবীদের উন্নয়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলে অন্তর্ভুক্ত হবে সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল শিক্ষাসহ সরকারি জাতীয় গবেষণা ও শিক্ষা হাসপাতালের মাধ্যমে অধিকতর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উচ্চতর বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে অনলাইনে প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য ও বিনিময় উদ্যোগ গ্রহণ এবং জাতীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

- **স্বাস্থ্য খাত প্রশাসন শক্তিশালী করা:** সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে ঔষধ প্রশাসন এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে আইনগত কাঠামোসহ প্রমিতায়ন ও স্বীকৃতি প্রত্যয়ন হালনাগাদ/স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন দ্বারা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি ও তদারকি ভূমিকা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা হবে।

- **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন:** ই-স্বাস্থ্য, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সকল রিপোর্টিং কেন্দ্র থেকে সময়মতো মানসম্মত রিপোর্টিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা বিনির্মাণ ও তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারসহ নিয়মিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সিস্টেম উন্নত করার মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (এমআইএস) এর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

- **মেডিক্যাল বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ:** জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি সুচিন্তিত মেডিক্যাল বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টিতে যথাগুরুত্ব প্রদান করা হবে।

- **ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা:** এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তার সাফল্যের ঝুড়ি সমৃদ্ধ করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বেসরকারি বিনিয়োগে তার সমর্থনকে শক্তিশালী করবে এবং একই সঙ্গে একটি সবল পরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও বিতরণের জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেও সমৃদ্ধ করবে।

- **জনস্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি:** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এই সত্যটিকে স্বীকার করে নেয় যে, উন্নয়নের প্রথম পর্যায়গুলোতে জনস্বাস্থ্যের জন্য যে স্বল্পব্যয় বিতরণ বিকল্পগুলো বাংলাদেশকে অত্যন্ত ভালো সেবা দিয়েছিল, সেগুলো এখন নিঃশেষিত-প্রায়। ফলে জনস্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মূলত অধিকতর জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নসহ নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবার আওতা বৃদ্ধি এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণে অর্থায়নের স্বার্থেই। তদনুযায়ী, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অন্বিষ্ট হবে সরকারের জনস্বাস্থ্য ব্যয় বর্তমানে জিডিপির ০.৭% থেকে ২০৩১ এ অন্ততপক্ষে জিডিপির ১.৫% এ এবং ২০৪১ এ জিডিপির ২.০% উন্নীত করা।

৫.৬ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল

সারণি ৫.১ এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। তদনুযায়ী, বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তম কর্মচর্চা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ভিত্তিতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মান সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সতর্ক বিতরণ কৌশল এবং এর অর্থায়ন চাহিদাও হবে বিশাল। আরেকটি বড় সমস্যা হলো চলমান জনমিতিক বৈশিষ্ট্যকে যেখানে মোট জনসংখ্যার তুলনায় সক্রিয় জনসংখ্যার (১৫-৬৪ বছর বয়সী) অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, একটি যথার্থ উন্নয়ন লভ্যাংশে রূপান্তর করা। এখানে প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান, তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লভ্যাংশে রূপান্তরিত হয়ে যাবে না। এজন্য এই বয়স-ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে একটি সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিতে রূপান্তরের জন্য একটি সতর্ক কৌশল অনুসরণ করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে শিক্ষা ও চাকুরিভিত্তিক প্রশিক্ষণে উপযুক্ত পরিমান বিনিয়োগ ও প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে। বিতরণ সক্ষমতা ও অর্থায়ন উভয় প্রেক্ষিত থেকে, এককভাবে সরকারি খাতের পক্ষে এই বিপুল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়

এবং এজন্য সহায়ক নীতিমালা ও সমন্বিত বিনিয়োগসহ একটি শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। এই অংশীদারিত্ব হবে কৌশলগত, যেখানে উচ্চ শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বেসরকারি খাত এবং সরকারি খাতের প্রাধান্য থাকবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং সার্বিক শিক্ষায় ন্যায্যতার বিবেচনাসমূহের নিশ্চয়তা বিধানে। উভয় পর্যায়ের বিতরণ ব্যবস্থায়, গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করা হবে।

এই কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো হবে নিম্নরূপ:

ক. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কৌশল

- ***সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা:*** প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিতরণে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ২০৪১ এর অধীনে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব অধিকতর শক্তিশালী করা হবে। সরকারি খাতের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে প্রতিটি শিশু যাতে ২০৩১ সালের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। যাদের সক্ষমতা আছে তাদের জন্য বেসরকারি স্কুলের সরবরাহ বৃদ্ধিকে আরো উদ্দীপ্ত করতে নীতি ও নিয়ন্ত্রণমূলক সহায়তা দান করা হবে। শহরের বস্তিবাসী শিশু, দুর্গম এলাকার শিশু ও স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য যথাযথ নীতিমালা গ্রহন করা হবে।
- ***শিক্ষার মান বৃদ্ধি:*** শিক্ষা চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার মান দ্রুত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এটি শুরু হবে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা উপকরণাদির মান বৃদ্ধির মাধ্যমে যার অন্তর্ভুক্ত হবে ভৌত সুবিধাবলির উন্নয়নসহ শিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, পাঠক্রম, বই, বিভিন্ন সরবরাহ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে অভিভাবকদের সংশ্লিষ্টকরণসহ সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। সমগ্র দেশে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে মূলধারায় নিয়ে আসা হবে এবং এজন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে একটি পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞান, গণিত ও ভাষাগত দক্ষতার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আইসিটি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হবে।
- ***শিক্ষার অপচয় রোধ:*** সম্পদের অপচয় রোধে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার ২০৩১ সালের মধ্যে নিরসন করা হবে এবং সকলের জন্য ১২ বছরের শিক্ষা সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানগত উন্নয়ন ঝরে পড়া হার কমাতে সহায়ক হবে। শিক্ষা বিতরণের বিকেন্দ্রীকরণসহ স্কুল ব্যবস্থাপনায় অভিভাবকদের জড়িত করা হলে সেটিও এতে সহায়তা করবে। বাল্যবিবাহ রোধে সরকারের পক্ষ থেকে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা ছাড়াও বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং অভিভাবকদের পরামর্শমূলক সেবা দান, সামাজিক অংশগ্রহণ ও অভিযানের মাধ্যমে তথ্য বিস্তারের মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ***মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষ করে তোলা:*** মাদ্রাসা শিক্ষাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রত্যয়নসহ শিক্ষার মূল ধারায় নিয়ে আসা হবে এবং এজন্য এমন একটি শিক্ষাক্রম গ্রহণ করা হবে যাতে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি ও আইসিটি দক্ষতা শিক্ষার বিধান সন্নিবেশিত হবে। স্কুল সুবিধাবলি উন্নয়নের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নত করার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া হবে।
- ***জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন:*** জনমিতিক সম্ভাবনাকে এটি যথার্থ লভ্যাংশে রূপান্তর করার জন্য দুটি কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে দ্রুত বিস্তার এবং কর্মশক্তি, বিশেষ করে নারী কর্মশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা। এ ব্যাপারে ন্যায্যতা সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমশক্তির ২৩ শতাংশের অনেকেই যারা বর্তমানে অশিক্ষিত, সুবিধার অভাবসহ নানাবিধ কারণে তারা শৈশবে স্কুল শিক্ষার বাইরে থেকে যায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বিশেষ জোর দেয়া হবে ২০৪১ সালের মধ্যে দ্বাদশ মান পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর। এটিই হলো জনমিতিক সম্ভাবনাকে লভ্যাংশে রূপান্তর নিশ্চিত করতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ। এজন্য একটি পর্যায়-ক্রমিক পদ্ধতি প্রয়োজন। প্রারম্ভিক বছরগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের (শুধুমাত্র ভর্তি নয়) প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। বারো বছরের এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বিশেষ জোর দেয়া হবে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার, শহরের বস্তি ও দুর্গম অঞ্চলের শিশুদের এই অভিযানে যুক্ত করার ওপর। গরিব পরিবার থেকে আসা এই শিশুদের জন্য বিনে পয়সায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ, স্কুলে বিনা পয়সায় খাবারসহ বৃত্তি আকারে প্রণোদনা দানের বিষয়ে জোর দেয়া হবে।

- ***স্কুল সেবা বিতরণের বিকেন্দ্রীকরণ প্রবর্ধন:*** বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বদান সহ সরকারি শিক্ষার বর্তমান কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বিশেষভাবে উপলব্ধি করে যে, এ ধরনের একটি বিশাল ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক জনতার জন্য রাজধানীতে কেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে শিক্ষা প্রশাসনের একটি উচ্চ কেন্দ্রীভূত কাঠামো কখনোই দক্ষ হতে পারে না। উচ্চ-আয় দেশগুলোর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারাই শিক্ষার সবচেয়ে ভালো বিতরণ সম্ভব। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষা চাহিদা বিষয়ে সামাজিক আদান-প্রদানসহ সবচেয়ে ভালো ধারণা রাখে এবং স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে এদের দায়বদ্ধতাও রয়েছে। জাতীয় সরকার থেকে নীতি প্রণয়ন ও অর্থায়ন সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা হবে। সময়ের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বাড়লে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সমাবেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে সরকারি শিক্ষায় অর্থায়ন হবে জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে একটি যৌথ দায়িত্ব।
- ***উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা শক্তিশালী করা:*** প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা শক্তিশালী করে বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সরকারের সকলের জন্য শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের ওপর। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে: আইসিটি ভিত্তিক অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য শিক্ষা কেন্দ্রের একটি কমিউনিটি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক তৈরি; স্কুলে পড়ার “দ্বিতীয় সুযোগ” অব্যাহত রাখা; কার্যকর দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য সুবিধাবলির বিস্তার; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কৌশলের সকল দিক শক্তিশালী করা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠন।

খ. উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশল

- ***বেসরকারি খাতের ভূমিকা শক্তিশালী করা:*** বারো বছরের শিক্ষা-পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা হবে প্রাথমিকভাবে বেসরকারি খাতের দায়িত্ব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চ শিক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধি উৎসাহব্যঞ্জক এবং এই ভূমিকা গ্রহণ বেসরকারি খাতের সক্ষমতার নির্দেশক। উচ্চ শিক্ষায় সরকারি ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকবে, তবে যে ক্ষেত্রগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি রয়েছে, উচ্চ শিক্ষায় লৈঙ্গিক ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মেডিসিন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দান করা হবে।
- ***মান উন্নয়ন:*** উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজগুলোর প্রামাণিকতা ও মান বৃদ্ধি করা হবে এবং এজন্য লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও আইটি সুবিধাবলি সমৃদ্ধকরণসহ শিক্ষকদের জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশের সকল স্নাতকোত্তর কলেজে আইসিটি কোর্স চালু করা হবে। ভৌত সুবিধাবলি ও নিয়োজিত কর্মীদের মানের দিক থেকে বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মানের দিকগুলোতে যথাযথ দৃষ্টি দেয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা হবে।
- ***ন্যায্যতা উৎসাহিতকরণ:*** ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য যে সকল শিক্ষার্থী বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির মানদন্ড পূরণসহ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে তাদের জন্য চাহিদা-ভিত্তিক সরকারি বৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হবে।
- ***লৈঙ্গিক ব্যবধান অবসান:*** ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাসহ প্রতিটি জেলা পর্যায়ে সরকারি মহিলা কলেজ স্থাপনে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় লৈঙ্গিক ব্যবধান অবসানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ***বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) শক্তিশালী করা:*** বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও প্রাগ্রসর একাডেমিক গবেষণা শক্তিশালীকরণে নেতৃত্ব দানের জন্য ইউজিসিকে ক্ষমতায়িত করা হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নীতিগত বিষয়ে এর নেতৃত্ব দানের সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য ইউজিসি'র পুনর্বিন্যাস সাধন।

৫.৭ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা গঠনের জন্য কৌশল

- **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি ২০১১) এর সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** বারো বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়াও জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল পুরোপুরিভাবে আহরণের জন্য কর্মশক্তির দক্ষতা বৈশিষ্ট্য

উন্নয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। টিভেট কর্মসূচির ভোকেশনাল প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দানের মাধ্যমে কর্মশক্তির দক্ষতা ভিত্তি উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনো ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ এই নীতি সমস্যা সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হবে এনএসডিপি ২০১১ এর রূপকল্প ও কর্মদর্শন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে। আইসিটি খাতসহ উত্থানশীল দক্ষতা ব্যবধানের ক্ষেত্রে কারিগরি জনবল চাহিদা মেটানোর জন্য কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। অর্থনীতির অগ্রযাত্রার সাথে দক্ষ শ্রমবাজারে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানের জন্য প্রয়োজন বোধে এনএসডিপি হালনাগাদ করা হবে এবং এটি একটি নমনীয় নীতি সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

- **কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ সুগম করা:** আরেকটি নীতিগত প্রাধান্য হবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিক সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। কাজের বয়স হয়েছে এমন জনসংখ্যার বর্ধনশীল অংশের চলমান জনমিতিক রূপান্তরের সুফল আহরণের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। তবে, আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, আংশিকভাবে শিক্ষা ও শ্রম দক্ষতার অভাবে নারী শ্রম এখনো মাত্র ৩৬%। সুতরাং সকল ধরনের শিক্ষায় লৈঙ্গিক-ব্যবধান নির্মূল করা ছাড়াও ভোকেশনাল শিক্ষা ও দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে লৈঙ্গিক-ব্যবধান কমিয়ে আনা হবে এবং অবশেষে তা পুরেপুরি নির্মূল করা হবে।

- **গ্রামীণ প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দান:** গ্রামাঞ্চল প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা গঠন সুবিধার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান টিভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাপ্তব্য গ্রামীণ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন তথা আধুনিকায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। নারীদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে উচ্চ চাহিদাযুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে গ্রামীণ-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

- **প্রশিক্ষণ বিতরণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা:** বৈশ্বিক উত্তম কর্মপদ্ধতি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিতরণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আবশ্যক। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দান করবে। অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সরকারি অর্থায়ন প্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যবসায়-উদ্যোক্তাদের অংশীদারিত্বে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়া হবে। চাকুরি চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান টিভেট কর্মসূচিগুলোর সমন্বয় সাধন করা হবে। চাকুরি চাহিদা যেখানে বেশি এমন কর্মসূচির অনুকূলে নতুন সরকারি বিনিয়োগ করা হবে। সরকারি অনুদান প্রাপ্তির মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোগে চাহিদা-তাড়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা হবে।

৫.৮ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অর্থায়ন কৌশল

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি এবং সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। অর্থায়ন কৌশলের প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

- **বাজেট অর্থায়নে দ্রুত বৃদ্ধি সাধন:** সরকার ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৮৭.৬২০ কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছে যা বাজেটের ১৬.৭৫% এবং মোট দেশজ আয়ের ৩.০৪%। তাই কৌশল হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে তা ২০৩১ এ ৪% এ এবং ২০৪১ এ ৬% এ উন্নীত করা। সারণি ৫.১ এ প্রদর্শিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যথাযথভাবে তহবিল বরাদ্দ করা হবে।

- **স্থানীয় সরকার অর্থায়ন সমাবেশ:** শিক্ষা সেবার বিকেন্দ্রীকরণে অগ্রগতি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিমত্তা বৃদ্ধির সাথে স্থানীয় অর্থায়ন সমাবেশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সম্পত্তি কর সর্বাধিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র এবং সরকারের আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সমাবেশে এটি ব্যবহৃত হবে।

- **সরকারি ব্যয়ের মান উন্নতকরণ:** উপরিবর্ণিত কৌশলসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ সহ চলমান প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে শেষ করার ওপর প্রাধান্য দিয়ে ব্যয়ের মান উন্নত করার ওপর জোর দেয়া হবে। বিশেষ করে, ন্যায্যতার বিকাশ, লৈঙ্গিক ব্যবধান অবসান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মতো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলির সমর্থনে বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সমন্বয় করে সরকারি ব্যয়ের জন্য সতর্কতার সাথে নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র বাছাই করা হবে।

- **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বেসরকারি অর্থায়ন উদ্দীপ্তকরণঃ** শিক্ষায় বেসরকারি অর্থায়ন সর্বাধিক গুরুত্ববহ এবং তা সরকারি বিনিয়োগের চেয়ে বেশি। সরকারের পক্ষ হতে বেসরকারি শিক্ষায় ন্যায্যতা কর্মসূচিতে অনুদান মঞ্জুরিসহ কর রেয়াত এবং সহায়ক নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিসহ অধিকতর প্রণোদনা দান করা হবে।

৫.৯ মানব উন্নয়ন পেরিয়েঃ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য

একটি উন্নত জাতি সযত্নে লালন করে তার সুনাগরিকের কিছু সদাচরণ, যেমন- আইন মেনে চলা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস, সামাজিক আচার-আচরণ, নারী ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ, ভিন্ন মত এবং বিশ্বাসের প্রতি সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। একটি জাতির গঠন নির্ভর করে তার জনগণের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গড়নের উপর। জাতি গঠনে এসব কিছুই ব্যক্তির কাজকে প্রভাবিত করে, যেমন- ব্যক্তি কীভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, কীভাবে তার দক্ষতা ও উদ্যম কাজে লাগায়, কীভাবে জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিজের সংস্কৃতিকে বড় করে তুলে ধরার মানে হল একটি দেশের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি তুলে ধরা। মানুষ কীভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এবং জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করে তার উপর এইসব কিছুরই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস রয়েছে এবং এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সব প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। এছাড়াও, অনেক গুণীমানুষ রয়েছেন যারা সাহিত্য, সংগীত ও চারুকলায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আজকের বিশ্বায়িত ভুবনে, নাগরিকের দায়িত্ব হলো দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা; আগামী প্রজন্ম এবং পৃথিবীর অগ্রযাত্রায় অবদান রাখা। কোনো জাতিসত্তার আত্মপরিচয় অন্তর্নিহিত থাকে তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে, যা বাঙ্গালি জাতির সাংস্কৃতিক বুননের অবিচ্ছেদ্দ অংশ।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা এতিহ্যগতভাবে সহিষ্ণু, যেখানে নানান ধর্মীয় মত ও আচারের মানুষ সহাবস্থান করে। বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তির ধর্ম চর্চার অবাধ স্বাধীনতা এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ একটি জাতির উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে সক্রিয় থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার।

বাংলাদেশ যখন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়ন শুরু করতে যাচ্ছে, তখন এদেশে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মচর্চার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবক, এবং জনগণের এ অংশটিই আমাদের জাতির জনমিতিক সম্পদ। তাই বাংলাদেশের অবশ্য কর্তব্য হলো আগামী দিনে যুবকদের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের পূর্ণ শক্তিতে কাজে লাগানো এবং দেশের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সঠিক পথে চালিত করা। এছাড়া, জাতির সামনে উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ হলোঃ জলবায়ু পরিবর্তন, জঙ্গিবাদ, বয়স্কদের সংখ্যাধিক্য এবং অব্যাহত দারিদ্র্য। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আজ যারা তরুণ তাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে বিনিয়োগের বিকল্প নেই। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মতো উন্নয়ন লক্ষ্য এবং প্রতিশ্রুতি অর্জনের পথ তৈরিতে সহায়তার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি কাজে লাগিয়ে সরকার যুবকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং আগামী শতকে যুবকদের ভবিষ্যত গঠনের কাজে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে।

অধ্যায় ৬

একটি উচ্চ-আয় দেশে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য টেকসই কৃষি

একটি উচ্চ-আয় দেশে গ্রামীণ উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য টেকসই কৃষি

৬.১ প্রস্তাবনা

একটি অর্থনীতির উন্নয়ন পর্যায়ে সংঘটিত কাঠামোগত পরিবর্তনের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জিডিপিতে কৃষির অংশ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, যা ১৯৭০-এর দশকের প্রায় ৬০% থেকে নেমে ২০১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় মাত্র ১৩.৩১%। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই দশকে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল ২.৭৬% এর কম, যা ত্বরান্বিত হয়ে ২০১১-১৯ মেয়াদে প্রায় ৩.৯% এ উন্নীত হয়। এক সময় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ হিসেবে এর বিশাল জনসংখ্যার জন্য খাবার যোগাতে সারা বছর খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো। গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থবহ অবদান সরকারের কার্যকর নীতি এবং সমর্থনপুষ্ট হয়ে বাংলাদেশের মেহনতি কৃষককুলের মিলিত প্রচেষ্টায় সেই পরিস্থিতি আজ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। মোট দেশজ আয়ে কৃষির অংশে এই অবনমন সত্ত্বেও গ্রামীণ জনসংখ্যার সিংহভাগের জন্য খামার ও খামার-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ জনগণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উৎপাদনের খাত হিসেবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিতে এর প্রধান ভূমিকা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগের বসবাস এখনো গ্রামাঞ্চলে এবং জীবিকার জন্য তাদের একান্ত নির্ভরশীলতা কৃষির ওপর। এই বাস্তবতায় ভবিষ্যতে গ্রামীণ উন্নয়ন হবে একটি দক্ষতাসম্পন্ন ও উৎপাদনশীল কৃষির সমার্থক। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৃষি খাত কৌশলে এ বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে মৎস্য খাত বিগত কয়েক দশক যাবৎ বৈপ্লবিক কর্মঅভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও গতিশীল খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে তার অবস্থান দৃঢ় করতে পেরেছে। মোট দেশজ আয়ে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৫০% এবং তা কৃষি জিডিপির এক-চতুর্থাংশের সমান। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশবান্ধব নতুন মৎস্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের মাধ্যমে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য ফলাফল-মুখী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার "বিশ্ব মৎস্য ও মৎস্যচাষের অবস্থা ২০১৮" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে আহরিত উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং বিশ্ব মৎস্যচাষ উৎপাদনে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগেরও বেশি মানুষ তাদের জীবিকার জন্য এই খাতে পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন সময়ের জন্য কর্মনিয়োজিত। মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলোতে, বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে প্রায় ৮০% নারী-কর্মীর কর্মসংস্থান হয়। মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কর্মকান্ডে আগ্রহী নারীদের নিয়োজিত করে মৎস্য বিভাগ নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহ প্রদান করে।

প্রাণিসম্পদ খাত কৃষিজ দেশজ আয়ের ১.৪৭%, এবং কৃষি জিডিপির ১৩.৩১% যা পারিবারিক পুষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী ক্ষমতায়ন সুবিধা বিধানসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সার উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি নিবিড়ায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বর্ধিত উৎপাদন তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন, যা খাদ্যে অধিকার নিশ্চিত করে - এগুলোর মাধ্যমেও প্রাণিসম্পদ খাদ্য নিরাপত্তায় বিশেষ অবদান রাখে।

৬.২ খাদ্য ও কৃষি নিরাপত্তায় ব্যাপক রূপান্তরঃ

ধানের উচ্চ ফলনশীল জাত (উফশী), রাসায়নিক সারের ব্যবহারসহ সেচ-প্রযুক্তি সহযোগে বোরো শস্যের প্রাধান্য দ্বারা যে "সবুজ বিপ্লব" সূচিত হয়, তা বাংলাদেশকে তার দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়াতে সক্ষম করে তোলে। চাল উৎপাদন প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ এর ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে ২০১৯ তে ৩৬.৪ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়, যা বাংলাদেশকে চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এছাড়াও ভুট্টা, গম, আলু, তেলবীজ, ডালজাতীয় শস্য, শাকসব্জি ও ফলমূলের মতো ধান-বহির্ভূত শস্যের উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা খাদ্য ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা অর্জন-প্রক্রিয়ায় বিপুল অবদান রাখে। এটি খামারের আয় বৃদ্ধিসহ প্রকৃত কৃষি মজুরি বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়, এবং এভাবে তা গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনেও যথেষ্ট অবদান রাখে।

কৃষিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে একটি ব্যাপক রূপান্তর ঘটে চলেছে, যা ২০৪০-এর দশকেও অব্যাহত থাকবে। আয় বেড়ে যাওয়ার সাথে খাদ্যের জন্য চাহিদা কাঠামোতেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। মানুষ এখন বেশি করে ঝুঁকছে উন্নত পুষ্টিমানসম্পন্ন

খাদ্যসামগ্রীর প্রতি। ব্যাপকভাবে ভোগ্যবস্তুর বহুমুখীকরণ হয়েছে, মাথাপিছু চাল গ্রহণের মাত্রা কমে এসেছে এবং উচ্চ মূল্যমান সংবলিত খাদ্যবস্তু, যেমন মাংস, মাছ, দুধ, শাকসব্জি, ফলমূল ও ভোজ্য তৈল গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরবরাহ প্রতিক্রিয়া চাহিদায় রূপান্তর ধারাকে অনুসরণ করে ধান-কৃষি থেকে উৎপাদনের বহুমুখীকরণ করে ধান-বহির্ভূত শস্যের বর্ধিত উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে। শস্য-বহির্ভূত কৃষির প্রবৃদ্ধি - মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, পোল্ট্রি ও উদ্যান ফসল মিলিতভাবে শস্য-কৃষির প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিগত কয়েক দশক যাবৎ মৎস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি একটি মৎস্যচাষ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নসহ চাষী পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবাদানের ফলশ্রুতিতে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে এই দৃষ্টান্তমূলক সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। মোট মৎস্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে তা ২০০০-২০১৯ মেয়াদে ৪.৩ মেট্রিক টনে উন্নীত হয় (চিত্র ৬.১)। সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাথাপিছু দৈনিক ৬০ গ্রামের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাথাপিছু দৈনিক ৬২.৫৮ গ্রাম হারে মৎস্য গ্রহণ সহ বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে (এইচআইইএস, ২০১৬)।

চিত্র ৬.১: মৎস্য উৎপাদনে ক্রমবর্ধিত গতিধারা

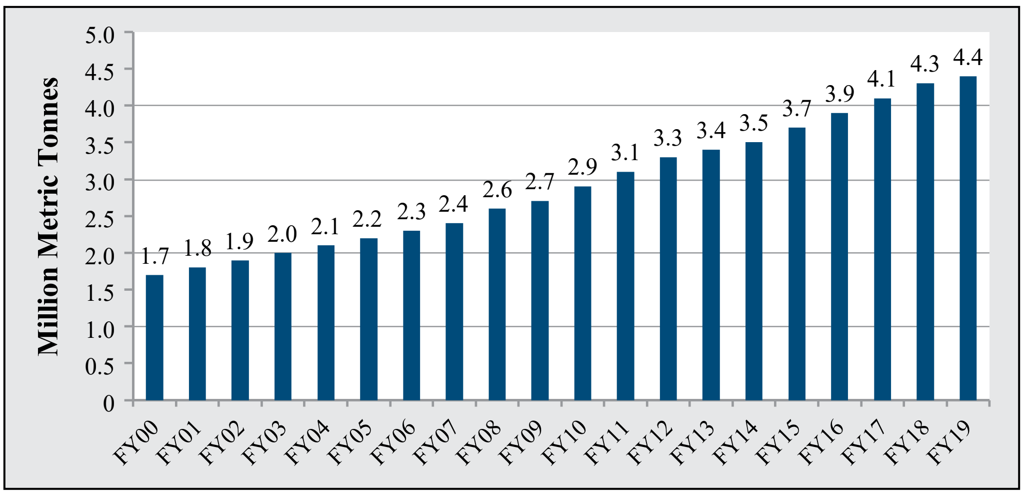

উৎস: বাংলাদেশের মৎস্য পরিসংখ্যানের বর্ষ বহি।

খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পসহ অ-শস্য উৎপাদনে বর্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বারা এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। চাহিদা-রীতিতে পরিবর্তনের প্রতি সরবরাহ প্রতিক্রিয়া কৃষি বহুমুখীকরণকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দানাদার ফসল বিন্যাস থেকে ধান-এবং-অ-ধান ভিত্তিক উচ্চমূল্য শস্যের ফসল বিন্যাস ও এর সাথে মূল্য সংযোজন পণ্য যুক্ত করা ও উদ্যান-ফসল, ডাল জাতীয় শস্য ও তৈলবীজ শস্যের বিস্তার ঘটানো। প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য, বর্তমানে কৃষির দ্রুততম বর্ধনশীল উপাদান, এ দু'টিকে বর্তমান গতি বজায় রেখে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে অথবা বর্ধিত চাহিদার সাথে তাল মেলাতে খাদ্য ও কৃষির ব্যাপক রূপান্তরসহ আরো বেশি উৎপাদনের গতি বাড়াতে হবে।

৬.২.১ পরবর্তী দশকগুলোর জন্য কৃষিতে ব্যাপক রূপান্তরের চালিকাশক্তি

চালিকাশক্তি ১: মাটির উর্বরতা ও সারের ব্যবহার: বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৃষিখাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি যাতে এর ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। সারের সুষম ব্যবহারই হলো শস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ মাটির স্বাস্থ্য ভালোভাবে বজায় রাখার চাবিকাঠি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ছাড়াও মাটির উর্বরতা হ্রাসের সবচেয়ে বড় কারণ সারের একপেশে ও ভারসাম্যহীন ব্যবহার। সারের সুষম প্রয়োগের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অধিকতর দক্ষ উপায়ে সার প্রয়োগের কলাকৌশলসমূহকে জনপ্রিয় করা গেলে তা মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ, ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে সহায়ক হবে। উফশী শস্যজাতের বিস্তার ও সারের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে এদেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যায়। পরবর্তী দশকগুলোতে বাংলাদেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ যথাসময়ে সারের প্রাপ্যতা ও সরবরাহের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সরকারি নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১২-১৩ থেকে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমেছে, পক্ষান্তরে টিএসপি এবং এমওপি'র ব্যবহার বেড়েছে। যদিও সরকার নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ও সার নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনে সারের সুষম ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তবু এখনো কৃষক পর্যায়ে উচ্চ মাত্রায় ভারসাম্যহীন সারের ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। জৈব ও রাসায়নিক সারের একত্র মিশ্রণ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করে সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি ব্যবস্থা (আইপিএনএস) অনুসরণ করে ফসলের মাঠে সার প্রয়োগ করতে হবে। খরাপ্রবণ এলাকায় মাটির ব্যবস্থাপনায় শস্যের অবশিষ্টের কিছু অংশ মাঠে রেখে দেয়ার মতো সংরক্ষণমূলক কৃষিরীতি এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। ফসল বিন্যাসে ডাল জাতীয় শস্যের অন্তর্ভুক্তি মাটির উর্বরতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক। নিরাপদ শাকসব্জি ও ফলমূলের ফলন ঘরে তোলার জন্য দূষণ থেকে মাটি ও পানিসম্পদ সুরক্ষার জন্য জৈব চাষাবাদ রীতিকে উৎসাহিত করা হবে। সুপারিশকৃত মাত্রায় সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের মাঝে জ্ঞানের অভাব রয়েছে। পরবর্তী দশকগুলোতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সুষম সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বজায় রাখাসহ টেকসই কৃষি উৎপাদনের জন্য জৈব সার ও বায়ো-সার (বায়োফার্টিলাইজার) ব্যবহার জনপ্রিয় করার নিয়মানুগ প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

চালিকাশক্তি ২: সেচ: কৃষি উন্নয়নের জন্য সেচ সুবিধা সহজীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত কৌশলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যবহার করে উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ। বস্তুত বেসরকারি খাতের বিনিয়োগপুষ্ট ক্ষুদ্র সেচ বিস্তারের জন্যই দেশে কৃষি প্রবৃদ্ধির ধারা অগ্রসরমান। ১৯৮২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে সেচ প্রবৃদ্ধিতে ক্রমবর্ধিত গতি পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র সেচ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির বেসরকারিকরণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা কৃষিতে সেচের ব্যবহারে ব্যাপক উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

বাংলাদেশে কৃষিতে ব্যবহৃত পানির ৯৩% এবং মোট সেচে ব্যবহৃত পানির ৯০% ব্যয়িত হয় ধান উৎপাদনে। ধান উৎপাদনে ব্যয়িত সেচের প্রায় পুরোটাই এককভাবে বোরো ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ২০০০ সালে বাংলাদেশে বোরো ধান উৎপাদনের জন্য মোট সেচ-পানির চাহিদা ছিল হেক্টর প্রতি ২৬৫ মিলিমিটার হারে সর্বমোট ১১.৮ বিলিয়ন ঘনমিটার। ২০৩১ সালের মধ্য বোরো ধানের ক্ষেত্রে পানির চাহিদা ১৭.২৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং তা ২০৪১ পর্যন্ত বজায় থাকবে। এক্ষেতে ১৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি পাওয়া যাবে ভূগর্ভস্থ উৎস হতে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য শস্য উৎপাদনে পানির দক্ষ ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে এবং ভূ-উপরিস্থ পানি সেচের ব্যবহার বাড়াতে হবে। সেচ কার্যক্রম এর জন্য ৭৫% এর অধিক উৎস হলো ভূগর্ভস্থ পানি। ২০১০ সালে ভূগর্ভস্থ পানির অবদান ছিলো ১৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে নিম্নগামিতা ও পানির গুণগত মানের বর্তমান অবস্থায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ সম্ভাবনার সঠিক ব্যবহার আগামীতে অত্যন্ত কঠিন হবে। ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে বেশ কিছু নিবিড় এলাকায় আর্সেনিক বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্ট হয়েছে, ফলে বোরো ধানে সেচের জন্য শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন সম্ভবত দেশের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। তাই ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে বোরো মৌসুমে অ-ধানশস্য বিশেষ করে ভুট্টা ও মুগডালের চাষাবাদকে উৎসাহিত করা হবে। কৃষকদের মাঝে, বিশেষ করে উদ্যান-ফসল উৎপাদনের জন্য সেচের দক্ষতা বাড়াতে প্লাবন সেচের পরিবর্তে নির্দিষ্ট স্থানে সেচ দেয়ার পদ্ধতি, যেমন চৌকস এবং সেন্সর-ভিত্তিক সেচ সুবিধা প্রবর্তন করা হবে।

চালিকাশক্তি ৩ : উফশী বীজ: বীজ নীতি ১৯৯৩, বীজ সংশোধনী আইন ১৯৯৭ ও ২০০৫ এবং বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ এর সাথে ১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০০-এর দশক মেয়াদে বীজ বাজার উন্মুক্ত করা হয় এবং বীজ উৎপাদন, আমদানি ও বিতরণে বেসরকারি উদ্যোগের উত্থান ও অংশগ্রহণের জন্য বাজার উন্মুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সকল শস্যের মানসম্মত বীজের জন্য জাতীয় চাহিদা ছিল ১২.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আগামী দশকগুলোতে তা ১২.৫২ লক্ষ মেট্রিক টনের চেয়ে আরো বেশি হতে পারে। উফশী বীজের ব্যাপক বিস্তার ও ব্যবহারের ওপর কৃষি প্রবৃদ্ধি একান্তভাবে নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি এক্ষেত্রে বড় সমস্যা।

পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি সুবিধা বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ধিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিছু সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বীজ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার ফলে বীজের প্রাপ্যতায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তবে কিছু বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ রয়েছে। কৃষকদের জন্য মানসম্মত বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা কর্মসূচি, বীজ প্রত্যয়ন সংস্থার সক্ষমতা ও বিএডিসি'র বীজবর্ধন কর্মসূচির শক্তিশালীকরণ অপরিহার্য। চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত বীজ

সরবরাহ সমস্যার উত্তরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কৃষকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কমিয়ে আনা। খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই ধান উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে কারিগরি জ্ঞান ও উপকরণ সহায়তা দিয়ে কমিউনিটি-ভিত্তিক কৃষকদের বীজ উৎপাদন দলগুলোতে বীজ উৎপাদন বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

চালিকাশক্তি ৪: কৃষি ঋণ: বাংলাদেশের কৃষিকে টেকসই পর্যায়ে উন্নীত করতে একটি উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি খাতের উন্নয়নের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। নতুন নতুন প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্য শস্যজাত বিস্তারের সঙ্গে যখন ঋণ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এর সরবরাহের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী, সরকারি খাত হতে মোট গ্রামীণ ঋণ বিতরণের প্রায় ২৫ শতাংশ প্রদান করা হয়। বাকি ৭৫% বিতরণ করা হয় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) থেকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো থেকে ঋণ বিতরণের পরেও ঋণের চাহিদা অনেক বেশি।

চালিকাশক্তি ৫: প্রযুক্তি উদ্ভাবন: কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্পসমূহের মধ্যে মাটির উর্বরতা, উন্নত শস্যজাত, জলবায়ু-সহনীয় প্রযুক্তি ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব অপরিমেয়। নতুন উফশী জাতগুলো রোগ-প্রতিরোধী ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু হওয়া উচিত। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ সংরক্ষণ, মাটির উর্বরতার দায়িত্ব এবং জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগে সমধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। এসডিজি ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার উদ্যোগগুলো সামনে রেখে জলবায়ু পরিবর্তনে সহিষ্ণুতাসহ নিবিড়ায়ন ও বহুমুখীকরণের উন্নতি বিধানের অনুকূলে পর্যাপ্ত সমর্থন দানের প্রয়োজন হবে। এ কৌশল পরবর্তী দুই দশকে অব্যাহত রাখা হবে। এ ধরনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞানীদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে এবং যথাসময়ে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের "আমার গ্রাম আমার শহর" কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রামবাংলার বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানগুলোতে ব্যবসায় সেবা ও গ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সেবা বিস্তার করা হবে। এছাড়াও, এটি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ কৃষি খামার এবং অ-কৃষি খামারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পরিপূরকতা তৈরিতেও সহায়তা করবে।

চালিকাশক্তি ৬: কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য শিকল ও রপ্তানি: খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের পরিমাণ ২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের, যা ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মধ্যে বার্ষিক গড় ৭.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রগতির সাথে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতও অব্যাহত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাসহ একইভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্য পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীন প্রভৃতিসহ ৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ইইউ-ভুক্ত দেশগুলো অবশ্য বাংলাদেশের মাছ ও মৎস্যপণ্যের প্রধান আমদানিকারক। বাংলাদেশ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক মূল্যের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য ও পানীয় রপ্তানি করা হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি চিংড়ি ও মৎস্যপণ্য। আকর্ষণীয় ও টেকসই প্যাকেজিং দ্বারা মান বজায় ও সুরক্ষা সহ প্রক্রিয়াজাতকৃত মূল্য সংযোজিত কৃষিজ খাদ্য পণ্যের উৎপাদনে শিল্পপতি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে। বিগত দশকে বাংলাদেশ থেকে তাজা ফলমূল ও শাকসব্জির রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সহায়ক বাণিজ্য নীতিমালা সহযোগে এই গতি আগামীতেও বজায় রাখতে হবে। রপ্তানির জন্য ভুট্টা, আলু, টমেটোর মতো কৃষি দ্রব্যাদি মূল্য সংযোজন সমৃদ্ধ খাদ্যপণ্যে রূপান্তরকল্পে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা বাড়াতে স্বীকৃত মানের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষণের মাধ্যমে পণ্যের মান অবশ্যই নিশ্চিত করা হবে।

উপকরণের উৎপাদনশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে: আবাদি কৃষি জমির আয়তনে ক্রমনিম্ন গতিধারার প্রেক্ষাপটে, কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির চাবিকাঠি হিসেবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর সমধিক জোর দেয়া হয়। এটি বেশ সহায়ক হয় এবং বাংলাদেশে ধানের মোট উপকরণের উৎপাদনশীলতায় (টিএফপি) দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। মোট ধান উৎপাদনের টিএফপি ২০০৪-২০১৪ মেয়াদে ১.৯% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ এই যে, ২০০৪ এ ব্যবহৃত উপকরণের একই মাত্রা ব্যবহারের তুলনায় ২০১৪ তে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধানের আরো বেশি ফলন উৎপাদন করা হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, গত দশকে কৃষকদের গড় কারিগরি দক্ষতার অসামান্য উন্নতি হয় (চিত্র ৫.২)। ধান উৎপাদনে অদক্ষতা হ্রাসের প্রধান চালক ছিল কৃষকদের মানব পুঁজি, অর্থাৎ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কৃষকদের অভিজ্ঞতা।

চিত্র ৬.২: নমুনা চাষীদের খামার-নির্দিষ্ট গড় কারিগরি দক্ষতা

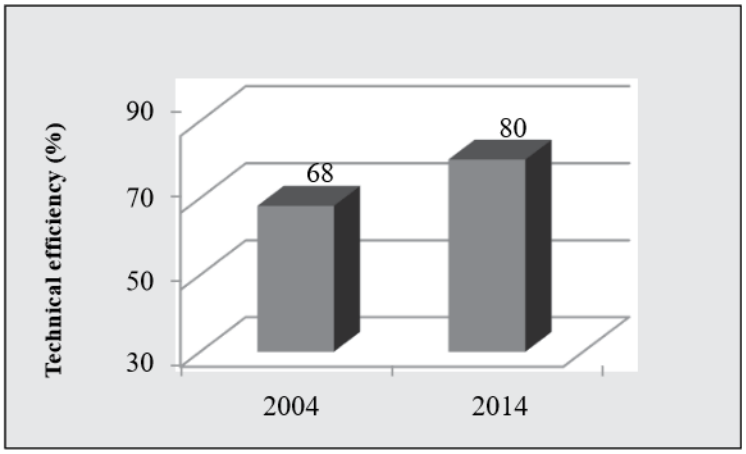

উৎস: কৃষি খাতের উপর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্যাডি।

মাথাপিছু চাল গ্রহণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে: প্রত্যাশা অনুযায়ী, মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ার সাথে, বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা কাঠামোতেও পরিবর্তন দৃশ্যমান। ধারাবাহিক এইচআইইএস রিপোর্টগুলোতে দেখা যায়, ব্যাপকভাবে ভোক্তা বহুমুখীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে মাথাপিছু চাল গ্রহণ কমেছে এবং মাংস, মাছ, শাকসব্জি, ফলমূল, দুধ ও ভোজ্য তেল প্রভৃতির মতো উচ্চমূল্য খাদ্যসামগ্রীর গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে (এইচআইইএস, ২০০৫ ও ২০১০)। নিম্নে চিত্র ৬.২ ক-ঘ তে দেখানো হয়েছে যে, মাথাপিছু চাল গ্রহণের মাত্রায় একটানা ক্রমনিম্নতা বজায় রয়েছে যদিও মাথাপিছু মোট খাদ্য গ্রহণের মাত্রা ক্রমশ উর্ধ্বগামী, যাতে প্রতিফলিত হয় যে ভোগ ও উৎপাদনের ধরনে একই ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে।

চিত্র ৬.২ক: বাংলাদেশে মাথাপিছু চাল গ্রহণে ক্রমনিম্নতা

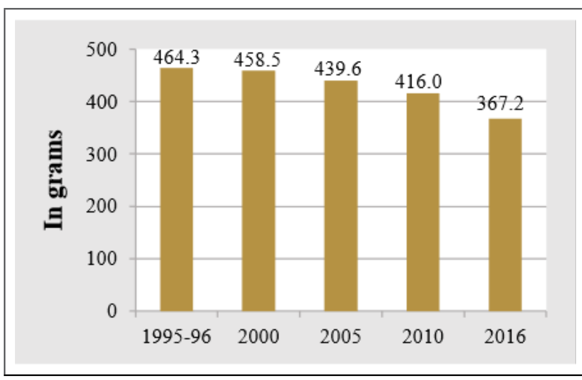

চিত্র ৬.২খ: বাংলাদেশে মাথাপিছু শাকসব্জি গ্রহণে উর্ধ্বগামিতা

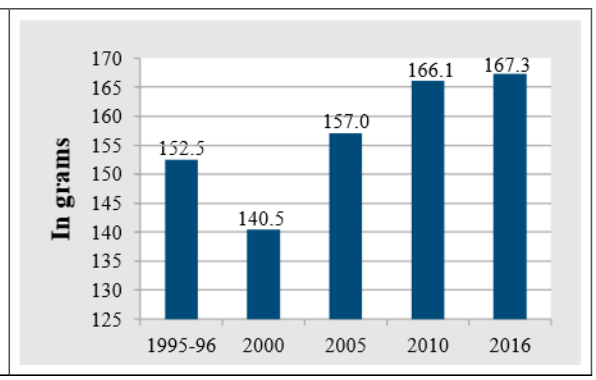

চিত্র ৬.২গ: বাংলাদেশে মাথাপিছু ডিম গ্রহণে ঊর্ধ্বগামিতা

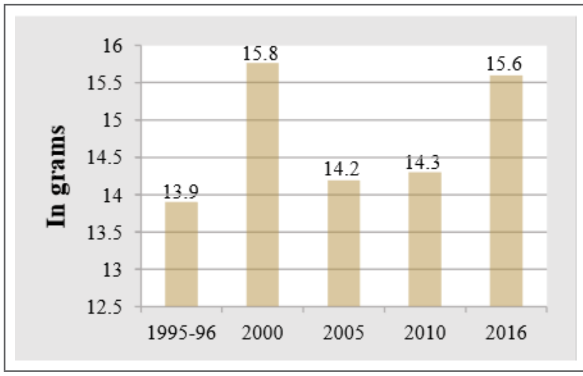

চিত্র ৬.২ঘ: বাংলাদেশে মাথাপিছু মৎস্য গ্রহণে ঊর্ধ্বগামিতা

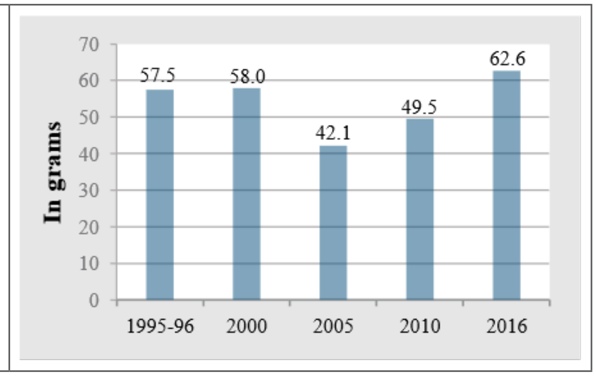

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) ২০১৬, বিবিএস

কৃষি খাতে বহুমুখীকরণও হচ্ছে আসছে: এ সময়ে আলু, তৈলবীজ, ভুট্টা ও ডাল জাতীয় শস্যের মতো ধান-বহির্ভূত শস্যসহ বিশেষ করে, ফলমূল ও শাকসব্জি-কেন্দ্রিক বাণিজ্যিকভাবে উচ্চমূল্য শস্যের বর্ধিত উৎপাদনের সাথে ধান-কৃষি থেকে কিছু মাত্রায় বহুমুখীকরণও সম্পন্ন হয়। ২০০৭-০৮ হতে ২০১৮-১৯ মেয়াদে গম, ভুট্টা, তৈলবীজ, মশলা, আলু ও শাকসব্জির আবাদি এলাকা বর্ধিত হয়। আলুর উৎপাদনে অর্জিত হয় অসামান্য সাফল্য। এর উৎপাদন ২০০১-০২ এর ২.৯০ মিলিয়ন টন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ তে ৯.৬৫ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়। শাকসব্জি ও ফলমূলের উৎপাদনও বেড়েছে। তবে খানিকটা ধীর গতিতে ২০০১-০২ এ যথাক্রমে ১.৫৯ মিলিয়ন টন ও ১.৪৭ মিলিয়ন টন থেকে তা ২০১৮-১৯ তে এসে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩.২ মিলিয়ন টন ও ৪.৫ মিলিয়ন টনে।

অ-শস্য কৃষি: প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১১-২০২০) শস্য-কৃষি খাতের চেয়ে অ-শস্য কৃষি খাতগুলোর অর্জন তুলনামূলকভাবে ভালো। ২০১৩-১৪ তে মৎস্য, বন, প্রাণিসম্পদ ও শস্য উপ-খাতগুলোর প্রবৃদ্ধি হার যথাক্রমে ৬.১৯%, ৫.০৫%, ২.৮৩% এবং ১.৯১%। প্রাণিসম্পদ খাদ্য ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখা ছাড়াও বাংলাদেশের সহায়-সম্পদহীন প্রাণিসম্পদ পালনকারীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকার ও ভিত্তি গঠন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয়। এগুলোর মাঝে রয়েছে জীবন্ত প্রাণি, কাঁচা পশুচর্ম, প্রক্রিয়াকরণকৃত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যসামগ্রী, জেলাটিন প্রভৃতি। অ-শস্য খাতের মধ্যে শস্য, মৎস্য ও বনের তুলনায় প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময় পরিধিতে মাংস এবং ডিমের উৎপাদনও অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পায়। তদুপরি, প্রাণিসম্পদ খাতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% এর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় এবং জনসংখ্যার ৫০% পরোক্ষভাবে এর বিভিন্ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রাণিসম্পদ পণ্যের বর্ধিত উৎপাদন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে এমন আয়বর্ধনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাত খাদ্য নিরাপত্তায় প্রভূত অবদান রাখতে পারে।

২০০১ থেকে ২০১৮ এই সময় পরিধিতে বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% এসে দাঁড়ায়। এতে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে উন্মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মৎস্যে প্রবল স্ফীতি। লোনা পানিতে চিংড়ি ও গলদা উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিবিড় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা আরো বাড়ানো সম্ভব। প্রতি বছর উৎপাদিত চিংড়ির ৭০% থেকে ৮০% রপ্তানি করা হয়ে থাকে। প্রায় ০.৫১ মিলিয়ন জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবিকা নির্বাহ হয় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে।

খাদ্য-প্রক্রিয়াজাত শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়ে উঠেছে বেগবান: অ-শস্য কৃষির প্রবৃদ্ধি খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বর্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বারা সমর্থিত হয়ে আসছে। খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ খাতের আয়তন ২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের এবং ২০০৪-০৫ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে বার্ষিক গড় ৭.৭ শতাংশ হারে এর বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাদেশে মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির অব্যাহত ধারার সমান্তরালে খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ খাত এভাবে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাসহ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ হতে

৭০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যমানের প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য ও পানীয় রপ্তানি করা হয়, যার ৬০% এরও অধিক হলো চিংড়ি ও মৎস্যপণ্য।

৬.৩ শস্য-কৃষির জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

শস্য ও অ-শস্য উভয় কৃষি খাতে যথেষ্ট উন্নয়ন সত্ত্বেও সামনে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। কিছু সংখ্যক সমস্যা বীজ, মাটির উর্বরতা, পানির পর্যাপ্ত ও স্থায়ী প্রাপ্যতা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রভৃতিসহ নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের সাথে সংযুক্ত। যা ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ভীতি দ্বারা অধিকতর জটিলরূপ ধারণ করবে। বর্ধনশীল শিল্পায়ন ও এর সহযোগী হিসেবে কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমানতা এবং ঋণ সুবিধায় অভিগম্যতা ও বর্ধিত বাণিজ্যিকায়নের জন্য সুযোগের মতো বিষয়াদি সমস্যা তৈরি করবে।

পূর্বেই যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে যে, ধান-বহির্ভূত উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদনে রূপান্তর সূচিত হয়েছে। তবে এ সকল উচ্চমূল্য ও শ্রমঘন শস্যের উৎপাদন-প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়বে যদি কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে যেমন, কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, (কর্তনোত্তর ক্ষতির পরিমাণ ১০% কমানো গেলে জাতির জন্য অতিরিক্ত ১০% খাদ্য যুক্ত হবে), প্রক্রিয়াকরণ ও গুদাম সুবিধা (যা বছর ব্যাপী স্থিতিশীল চাহিদা অনুযায়ী লাভজনকভাবে শস্য বিপণন সুগম করবে) পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা না হয়। এছাড়াও, ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্য-আয় মর্যাদায় উন্নীত হবার জন্য চ্যালেঞ্জ হবে আন্তর্জাতিক বাজার সুবিধা লাভজনকভাবে ব্যবহার করা এবং এজন্যে উন্নত কৃষি রীতি (জিএপি), স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারি মান (এসপিএস) এবং প্যাকেজিং-এর মতো ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে বিনিয়োগ করতে হবে।

সুনির্দিষ্ট কিছু সমস্যা যেগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আছে সেগুলোর পরিবর্তন প্রয়োজন: বিগত কয়েক দশকব্যাপী এই অগ্রগতির ধারায় বাংলাদেশে কৃষিখাতকে যে সমস্যাবলির মুখোমুখী হতে হয়, সংখ্যায় সেগুলি অনেক। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়; (২) সেচের জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অভাব; (৩) ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের অবনমন; (৪) পানিতে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাবহেতু দূষণ; (৫) নিষ্কাশন সমস্যা; (৬) জলাবদ্ধতা; (৭) পানি ব্যবহারে নিম্ন দক্ষতা; (৮) নিম্ন উৎপাদনশীলতা; (৯) সংরক্ষিত এলাকা গুলোর বন সম্পদের অবক্ষয়; (১০) জলবায়ু পরিবর্তন; (১১) উপকরণ সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা; (১২) কৃষকদের কাছে মানসম্মত বীজের অপর্যাপ্ত প্রাপ্যতা; (১৩) কৃষি ও ভেটেরিনারি সেবার সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা; (১৪) উচ্চ ফলনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি; (১৫) অপর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামো ও দুর্বল পরিবহন সুবিধাসহ বাজার ও মূল্য শৃংখলে অভিগম্যতায় প্রতিবন্ধকতা; (১৬) অপর্যাপ্ত কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন; (১৭) খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরবরাহ শৃংখলে অংশীজনের অপ্রতুল সক্ষমতা; (১৮) ক্ষুদ্র জোত ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সহজ ঋণ প্রাপ্তির অভাব; (১৯) কৃষির জন্য শ্রমের প্রাপ্যতায় প্রতিবন্ধকতা; (২০) কৃষি যান্ত্রিকীকরণে প্রতিবন্ধকতা; (২১) বনজ সম্পদের নিম্ন উৎপাদনশীলতা; এবং (২২) খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতা সংশ্লিষ্ট অপুষ্টি ও অন্যান্য অরক্ষণশীলতা। টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এর প্রতিটি সমস্যার মোকাবেলা করা অত্যন্ত জরুরি। জটিল প্রকৃতির কয়েকটি সমস্যার প্রতি নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

৬.৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও কৃষির জন্য আবাদি জমির ক্রম সংকোচন

বাংলাদেশে ভূমি ও পানি সম্পদের ক্রমবর্ধনশীল অবক্ষয় ভবিষ্যতে জাতীয় ও খানা পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহও ক্ষীণ হয়ে আসছে। অবক্ষয় সংশ্লিষ্ট প্রধান উদ্বেগগুলোর মাঝে রয়েছে কৃষিসহ নগরাঞ্চল ও শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য পানির স্বল্পতা, অবকাঠামোগত চাহিদা এবং আরো বিভিন্নভাবে ভূমির মানহ্রাস পাচ্ছে। আবাদি জমি প্রতি বছর প্রায় ১% হারে কমে যাচ্ছে। এছাড়া ভূমি ক্ষয়, নদী ভাঙ্গন, মাটির উর্বরতাহ্রাস, মাটির জৈব পদার্থহ্রাস, জলাবদ্ধতা, মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, প্যান পুঞ্জীভবন, অম্লায়ন ও বন নিধন প্রভৃতি কারণে নিয়মিত অবক্ষয় ঘটছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদাও অব্যাহতভাবে বেড়ে যেতে থাকবে। যদিও আমাদের আয় বৃদ্ধির সমান্তরালে খাদ্য তালিকায় তুলনামূলক পরিবর্তন ঘটবে। ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের ফলে পানি ধারণ ক্ষমতার অবনতি, কৃষক ও ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি আয় নিম্নমুখী হওয়াসহ খাদ্য সরবরাহ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি শুধু বন্ধ/শ্লথগতি করেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং সেই সাথে নিশ্চিত করতে হবে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, যাতে প্রাপ্য স্বল্পতর ভূমিতেই অধিকতর কৃষি পণ্য উৎপাদন করা যায়।

৬.৩.২ সেচের জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অভাব ও ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের অবনমন

আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর পানি প্রবাহ হ্রাস, জলাভূমির সংকোচন এবং নদীতে পলি জমে মূল প্রবাহ কমে যাওয়াসহ লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) দিয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সেচের বিস্তার নিশ্চল হয়ে পড়েছে। আন্তঃসীমান্ত ৫৭টি নদীর সবগুলোরই নিম্ন অববাহিকা হিসেবে বাংলাদেশকে তার নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ পলিমাটির ভার বহন করতে হয়। বিডিপি ২১০০ অনুযায়ী, প্রতি বছর ১.০ থেকে ১.৪ বিলিয়ন টন পরিমাণ পলিস্তর জমা হয়। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলোতে স্রোতের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্ট হয়। তবে, সেচের পানির জন্য বর্ধিত চাহিদা অব্যাহত থাকবে এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারে সুব্যবস্থার অভাবে বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর তীব্র চাপ অব্যাহত থাকবে।

সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের একটি ক্ষেত্র হবে নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রযুক্তির বিস্তার। যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সূক্ষ ও পরিমিত সেচ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বর্তমানে পানি সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা কম। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হবে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা। যা শুধু বৃষ্টির পানি ধরে রাখা সহ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ ও এ ধরনের পানি ধারণের জন্য বড় বড় জলাধার নির্মাণেই সহায়তা দান করবে না সেই সাথে অনিয়ন্ত্রিত সেচ পানির অপচয় কমিয়ে আনতেও প্রভূত সহায়ক হবে। এই সমস্যা প্রশমনের একটি উপায় হতে পারে সেচ পানি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল সলিউশনের সাথে আইসিটি'র ব্যবহার যা আগামী দশকগুলোতে সেচের জন্য টেকসই পানি প্রাপ্যতা অর্জনেও সহায়ক হবে।

প্রাপ্য পানি অপব্যবহারের প্রাথমিক উৎস হলো সেচের আওতাভুক্ত আবাদি জমিতে ব্যবহৃত ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সেচ পদ্ধতি। ভূপৃষ্ঠস্থ পানি থেকে ২১% এলাকায় সেচ প্রদান করা হয়। বাকি এলাকায় (৭৯%) সেচ দেয়া হয় ভূগর্ভস্থ পানি থেকে। পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ পদ্ধতি, যা নিম্নচাপযুক্ত পাইপের মাধ্যমে সরাসরি উদ্ভিদের মূলদেশে পানি ছিটিয়ে দেয়। তবে এর নিবিড় যত প্রয়োজন এবং এ পদ্ধতি ব্যয়সাধ্য। এজন্য এমন একটি নীতি গ্রহণ করা দরকার, যা ড্রিপ সেচে উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রণোদনা দান করবে। বর্তমানে বেশ কিছু প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ব্যবস্থা চালু আছে, যেগুলো ক্লাউডের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হয়ে স্বয়ংক্রিয় হয় এবং সেন্সর দ্বারা চালিত হয়ে নির্দিষ্ট শস্য চাষের জমিতে প্রয়োজনীয় পানির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করে। জমির সক্ষমতা মাত্রা অনুযায়ী ধান ছাড়া অন্যান্য ফসলে সেচ প্রদান করা উচিত। ভবিষ্যতে মূল্যবান পানি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনাসহ পানি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ শস্যের পানি চাহিদা ও সেচকর্ম পরিচালন সূচি যথাযথভাবে সমন্বয় ও সংস্কার করা হবে।

৬.৩.৩ বাজার সুবিধায় অভিগম্যতা ও মূল্য শিকলে প্রতিবন্ধকতা

উর্ধ্বমুখী আয়, দ্রুত নগরায়ণ, অধিকতর উদার বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তি যা বাংলাদেশের জন্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনকল্পে প্রত্যয়দীপ্ত, তা উচ্চমূল্য, সতেজ ও প্রক্রিয়াকরণকৃত নিরাপদ কৃষি পণ্যসামগ্রীর চাহিদাকেও অনেক বাড়াবে। একটি অধিকতর উদার বাণিজ্যিক পরিবেশে বর্ধিত আমদানি দ্বারা এর কিছু অংশ হয়তো মেটানো সম্ভবপর হবে। তবে এই বর্ধিত উচ্চতর মূল্যসমৃদ্ধ কৃষি পণ্যসামগ্রীর বড় অংশই পেতে হলে তা অবশ্যই উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, বৈজ্ঞানিকভাবে গুদামে সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাত করণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৩.৪ কৃষি-প্রক্রিয়াকরণের মূল্য শিকলে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ

কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এর প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। পচনশীল পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এর অপচয় হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সংযোগ জোরদার করতে আগামী দশকগুলিতে কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত অধিক গুরুত্ব পাবে। যদিও কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছে, তথাপি এর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা অর্জনে আরও নীতি, প্রবিধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার প্রয়োজন হবে যা নতুন কৃষি প্রযুক্তির জ্ঞান সরবরাহসহ মূল্য শিকলের বিভিন্ন অংশে বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহী করতে পারে। এক্ষেত্রে নীতি, প্রবিধান ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাসমূহ দূর করতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুণগত মান বজায় রেখে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে পারে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য নীতি, প্রবিধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি সরকার তার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সংক্রান্ত আইনের অধীনে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৬.৩.৫ বাজার অবকাঠামো ও দুর্বল পরিবহন সুবিধা

প্রতিযোগিতার সুযোগ অবারিত করে এমন একটি চমৎকারভাবে কার্যকর বাজার ব্যবস্থা কৃষির মূল্য শৃংখলের সুষ্ঠু প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হতে পারে। দুর্বল পরিবহন ও অপর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামো দ্বারা বাজারের পরিকৃতি প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিসহ বাজার মূল্যে অস্থিরতা তৈরি করে। উন্নত বাজার অবকাঠামো খাদ্যমূল্য হ্রাসসহ খাদ্য সরবরাহের অনিশ্চয়তা দূর করে এবং এভাবে দরিদ্র ও দরিদ্র নয় এমন খানাগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত করে। সড়ক নেটওয়ার্ক ছাড়াও বিভিন্ন নদী ও খাল পুনঃখনন দ্বারা নৌপথ উন্নয়নের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার (বিডিপি-২১০০)। রেলপথে পরিবহন সুবিধাদি চাহিদার অনেক পেছনে পড়ে আছে, তাই কম খরচে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য এর আরো বিস্তৃতি ও আরো উন্নতি প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

- কৃষকগণ যাতে তাদের ঘামঝরানো শ্রমে উৎপন্ন কৃষি পণ্যসামগ্রীর জন্য প্রকৃত মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে বিধিমালা ও নিয়মকানুন জারি।
- খামার পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যাতে কৃষকরা পণ্যের সঠিক মূল্য পায়।
- গ্রামের রাস্তা ও অবকাঠামো ঠিক রেখে সড়ক ব্যবহারকারীর খরচ সম্ভাব্য সর্বনিম্ন রাখা হবে। এতে করে কৃষিপণ্য পরিবহনের খরচ সাধ্যের মধ্যে রাখা যাবে।
- চরাঞ্চল ও অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলগুলোতে জাতীয় বেসরকারি ব্যবসায় নেটওয়ার্কে দরিদ্রদের জন্য বাজার চরাঞ্চলের জন্য বাজার পদ্ধতির বিস্তারে প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান।
- স্থানীয় উদ্যোগ প্রবৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনে সমর্থন প্রদানসহ আঞ্চলিক ও জাতীয় মূল্য শৃংখলের সাথে এই স্থানীয় উদ্যোগগুলোর অন্তর্ভুক্তি/সমন্বয় সাধন।
- পুঁজির যোগান, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও উদ্যোগী ভূমিকার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি।

৬.৩.৬ ক্ষুদ্র চাষী ও অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীর অনুকূলে সহজ ঋণ সুবিধার অভাব

কৃষি উন্নয়নে ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সকলের বিশ্বাস এই যে, ঋণ কর্মসূচির বিস্তার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ ক্ষুদ্র চাষী ও ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। এছাড়া এটি দারিদ্র্য বিমোচন, জীবিকার বহুমুখীকরণ এবং ক্ষুদ্র চাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধিরও চাবিকাঠি। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং, কৃষি ঋণ বিতরণের বিস্তৃতি ঘটানো, বিশেষ করে ক্ষুদ্র চাষীরা অগ্রাধিকার পাবে। এ ধরনের সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, নিম্ন সুদ হারের চেয়ে সময়মতো ঋণ মঞ্জুরি ও ঝামেলা-মুক্ত অগ্রিম ছাড় কৃষকদের কাছে অধিকতর কাম্য। বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে প্রায় ১৬৩ বিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ঋণ বিতরণ করা হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাষ্য অনুযায়ী কৃষিপণ্যের সরবরাহের সাথে যুক্ত গরিব ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন প্রকার ঋণ বিতরণকৃত হয়নি। সুতরাং, সরবরাহ শিকলে সম্পৃক্ত গরিব চাষী ও গরিব ব্যবসায়ীদের অনুকূলে সঠিক সময়ে ও ঝামেলা-মুক্ত ঋণ সুবিধা বিস্তৃত করা সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

৬.৩.৭ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে জলবায়ু-অরক্ষিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। পরবর্তী দশকগুলোতে বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের যে সকল বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখী হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো হলো বন্যা, খরা, লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশের ক্রমবর্ধনশীল গতিধারা, উজানের পানি প্রবাহ হ্রাস ও সেচের নিবিড়ায়নের জন্য জলাভূমি শুকিয়ে যাওয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে শুষ্ক মৌসুমে বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক অবক্ষয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচাইতে বিপদসংকুল অবস্থানগুলি হলো বাংলাদেশের চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, হাওর এলাকা, বন্যাপ্রবণ অঞ্চল ও খরা অঞ্চলসমূহ।

বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণাদি থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্য নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিবে। শস্য ও উদ্যানফসল, বন, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যসহ কৃষি হলো সবচেয়ে জলবায়ু-সংবেদনশীল খাত। তাই একে অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে অভিযোজিত হতে হবে, যাতে ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে এর খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা উন্নততর করা যায়। পানি কৃষির

জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, আমাদের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো জাতীয় কৌশলের সাথে সমন্বয় করা হবে। বাংলাদেশে কৃষির জন্য এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা এবং এটিকে সরকারের ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অধীনে সার্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) কর্তৃক গৃহীত মাঝারি দৃশ্যকল্প অনুযায়ী ২০৫০ এর মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং শতাব্দীর শেষে এর সাথে যুক্ত হতে পারে আরো ৩-৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস (চিত্র ৬.৩)। এমনকি মাঝারি দৃশ্যকল্পে বাংলাদেশ ব-দ্বীপে, বিশেষ করে কৃষিকে কতিপয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে, যেমন- শস্যের নিম্নফলন, কৃষি জমি হ্রাস, ভূগর্ভস্থ-পানির মান হ্রাস, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি এবং চরম আবহাওয়াগত ঘটনাপঞ্জি-যার সংমিশ্রিত প্রভাব কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট পেশার ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে।

চিত্র ৬.৩: আঞ্চলিক তাপমাত্রায় পরিবর্তন (১৯০০-এর তুলনায়)

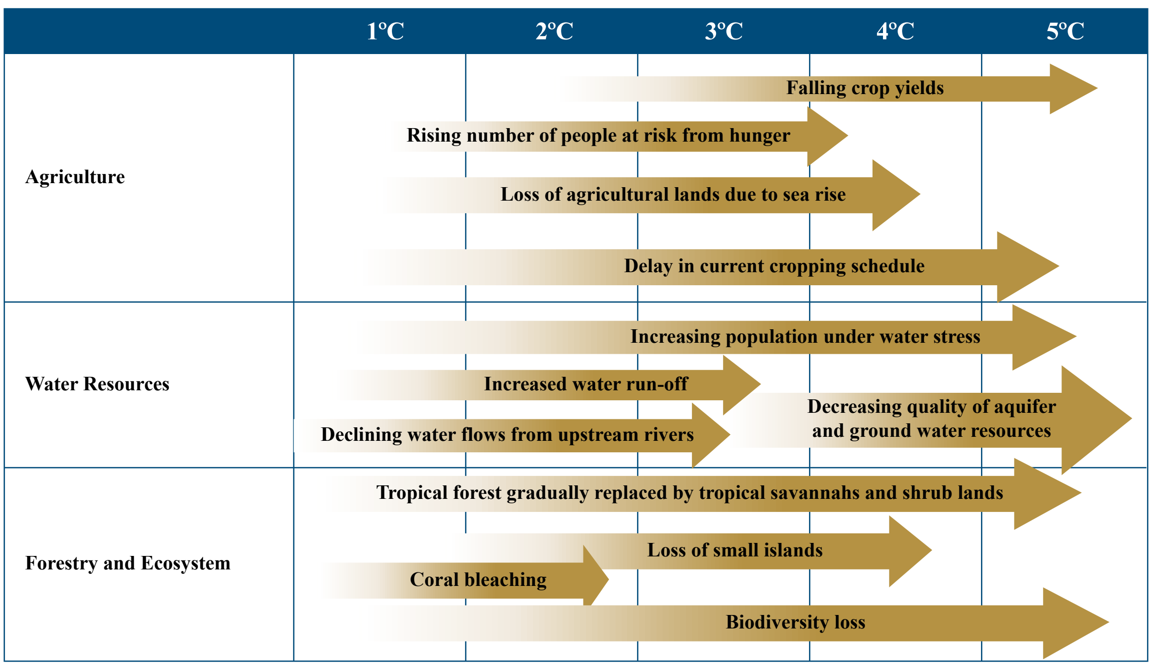

উৎস: দি স্টার্ন রিভিউ (২০০৭)

৬.৪ খাদ্য নিরাপত্তায় অগ্রগতি

কৃষি উৎপাদনে অর্জিত সাফল্য খাদ্য নিরাপত্তা সম্পৃক্ত ঝুঁকি নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, তবে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয় দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বাংলাদেশের অভিযাত্রায় এখনো জটিল সমস্যা রয়ে গেছে। খাদ্য নিরাপত্তা একটি বিস্তৃত ধারণা। এর দু'টি প্রধান দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়ক্ষমতা। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি তেমন একটা কাজে আসে না, যদি তা জনগণের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিতরণ না করা হয়। এছাড়াও, এর সাথে আরো একটি সম্পৃক্ত বিষয় হলো সার্বিক মান ও পরিমাণ বজায় রেখে সেই খাদ্য জনগণের ক্রয়সাধ্যতার মধ্যে রাখা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বাংলাদেশ এখনো অপুষ্টি সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। এর অর্থ এই যে, মানুষ যদিও এখন অনেক বেশি খাবার পায়, তবে জনসংখ্যার অনেক অংশই সঠিক পরিমাণ ও ধরনের খাদ্য পাচ্ছে না যদিও খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বর্জ্য হিসেবে বিনষ্ট হয়। উদ্বুদ্ধকরণ কাজের মাধ্যমে গতানুগতিক খাদ্য অপচয়ের এই অভ্যাস বদলানো দরকার। অর্থনৈতিক ও কৃষি প্রবৃদ্ধিতে ত্বরান্বিতকরণ খাদ্য গ্রহণের বহুমুখিতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং প্রধান খাদ্য থেকে সরে আসছে । এই সময়ে মাথাপিছু চাল ও গমের মধ্য দিয়ে কার্বোহাইড্রেট ভোগের মাত্রা ক্রমনিম্নমুখী হয়। পক্ষান্তরে শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ ও মাংস ভোগের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশে খাদ্য ভোগের ধরনে কালের ধারায় বৈচিত্র্য এসেছে। খাদ্যশস্যই এখনো ক্যালোরি গ্রহণের প্রধান অংশের যোগানদাতা। তবে মোট ক্যালোরি ভোগে এদের অংশ হ্রাস পেয়ে ১৯০০ এর ৯২% থেকে ২০১০ সালে ৮৯% এ নেমে এসেছে। প্রক্ষেপণে দেখা যায় যে, এটি আরো কমে গিয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে ৮৭% এবং ২০৫০ এর মধ্যে ৮৬% হবে। ১৯৯০ হতে ২০১০ সালের মধ্যে আলু, শাকসব্জি, পশু ও মৎস্য খাদ্য থেকে ক্যালোরি গ্রহণে অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং এই বৃদ্ধির ধারা ২০৩১ হতে ২০৪১ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রাণিজাত পণ্য (মাংস, দুধ, ডিম ও মাছ) এবং খাদ্যশস্য-বহির্ভূত ফসল (আলু, শাকসব্জি ও ফলমূল) ভোগের ক্ষেত্রে ১৯৯০ থেকে ২০৩১ মেয়াদে একই রকমভাবে বৃদ্ধির ধারা অনুসৃত হবে। প্রাণিজাত পণ্যের জন্য নিরঙ্কুশ চাহিদা ১৯৯০ সালে দৈনিক জনপ্রতি ৫২.৫ কিলোক্যালরি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে দৈনিক জনপ্রতি ৮৩.৫ কিলোক্যালরিতে উন্নীত হয়। এটি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩১ সালে দৈনিক জনপ্রতি ৯২.৮ কিলোক্যালরি এবং ২০৫০ সালে দৈনিক জনপ্রতি ১১২.৭ কিলোক্যালরিতে উন্নীত হবে। সারণি ৬.১ এ ২০৪১ সাল পর্যন্ত খাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহের প্রক্ষেপণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬.১: ২০৩১ এবং ২০৪১ সালের খাদ্য চাহিদা ও সরবরাহের প্রক্ষেপণ

বছর	চাল	গম	ভুট্টা	আলু	ডাল	সবজি	ফল	মাংস	ডিম*	দুধ	মাছ
খাদ্য চাহিদা (মিলিয়ন মেট্রিক টন)											
২০৩১	৩৮.৮	৬.৬৬	৫.৬৮	৬.৬৭	২.২৬	১৭.৭	১২.৫৭	১০.৯৩	৩২৯৩৪	১৯.৬৭	৬.৩৭
২০৪১	৪২.০	৭.০৭	৬.২৭	৭.২২	২.৪	১৮.৫৭	১২.৮৬	১১.৬৩	৪৬৪৮৮	২৪.৪৭	৮.৩৩
খাদ্য সরবরাহ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)											
২০৩১	৪০.৭	১.৪	৪.৫৫	১০.৯৮	১.১৪	১৭.৬৭	১২.০২	১১.০০	৩৩০০০	২০	৬.৫
২০৪১	৪৪.১	১.৪৬	৫.০২	১১.৫৯	১.২১২	১৮.৫৩	১২.২৮	১২.০০	৪৬৫০০	৩০	৮.৫
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)											
২০৩১	১.৯	-৫.২৬	-১.১৩	৪.৩২	-১.১২	-০.০৩	০.৫৫	০.০৭	৫৭	০.৩৩	০.১১৩
২০৪১	২.১	-৫.৬১	-১.২৫	৪.৩৭	-১.১৯	-০.০৪	-০.৫৮	০.৩৭	১২	৫.৩৩	০.১৬৭

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় * ডিম (মিলিয়ন)

বিশ্ব ব্যাপী খাদ্যের সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতি আবার নতুন করে দেশের বহু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানের গুরুত্বের গভীরতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। চাল উৎপাদনে অতীত অগ্রগতি থেকে এ ধারণা হয় যে, দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে যদিও বাংলাদেশের খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জনের সক্ষমতা থাকে, তবু ভবিষ্যতে এটি এককভাবে পর্যাপ্ত হবে না। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর সমধিক গুরুত্বদান চাষীদের প্রণোদনার সাথে খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যাবলির সমন্বয় সাধনেবিশেষভাবে সহায়ক হবে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় সংবেদনশীলতা মোকাবেলা করার জন্যই এটি জরুরি। এছাড়া, ধনী মানুষদের দ্বারা মূল্যবান খাদ্যসামগ্রীর অভ্যাসগত অপচয়সহ ফলনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাও জোরদার করতে হবে। এ জন্যে ছয়টি কৌশলগত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে: (ক) বৈরী কৃষি পরিবেশগত ব্যবস্থাকে উৎপাদনশীল টেকসই কৃষি পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা; (খ) মাটির গুণাগুণ বজায় রেখে উৎপাদনশীল কৃষি জমিতে শস্য চাষাবাদের নিবিড়ায়ন; (গ) টেকসই উপায়ে নিবিড় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার; (ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি; (ঙ) কৃষিজ উৎপাদন ও জীবিকার বহুমুখীকরণ এবং আরো বেশি সংখ্যক শস্য জাত বা প্রাণি জাতসহ খামার-বহির্ভূত কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো; এবং (চ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অভিযোজন কার্যক্রমের ধরণ ও আকার নির্ধারণে অনিশ্চয়তার সাথে মানিয়ে চলা।

৬.৪.১ দারিদ্র্য মাত্রার নিম্নগামিতা খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছে

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির অনুকূলে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের ফলে দারিদ্র্য অব্যাহতভাবে কমে আসে। ২০১০ থেকে এখন পর্যন্ত ৯ মিলিয়ন মানুষকে চরম দারিদ্র্যের বাইরে নিয়ে আসা হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি'র দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ উন্নয়ন সহায়তা করে। দারিদ্র্য নিম্নগামীতা সহযোগী হিসেবে দরিদ্রজনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা

সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পায়, যা মৌলিক খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্তিতে তাদের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। দারিদ্র্য হারের হ্রাস যুক্তিযুক্তভাবেই অত্যন্ত শক্তিশালী চালক হয়ে পড়ে, যার ফলে উন্নততর খাদ্যসামগ্রীতে অধিক সংখ্যক মানুষের অভিগম্যতা ও ক্রয়সাধ্যতার বৃদ্ধি ঘটে। যে প্রধান অর্জনগুলো খাদ্যে অধিকতর অভিগম্যতায় অবদান রাখে, সেগুলি হলো: (১) বিগত ১০ বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; (২) সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায়; এবং (৩) চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২০০০ সালের ৪৪ মিলিয়ন থেকে ২০১৯ সালে ১৭.৬ মিলিয়নে নেমে আসে।

৬.৪.২ অগ্রগতি সত্ত্বেও, খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টি এখনো উদ্বেগের বিষয় একটি কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা

শিশুদের অপুষ্টি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনো ছয় মাস ও পাঁচ বছরের মধ্যবর্তী বয়সী প্রায় ৯ মিলিয়ন শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত। এ শিশুদের ৪১ শতাংশ খর্বতা, ৩৬ শতাংশ ওজনস্বল্পতা এবং ১৬ শতাংশ অপূর্ণতায় ভুগে থাকে। গ্রামবাংলার ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন "এ" পায় না এবং আয়রন ঘাটতির শিকার। তবে নারীদের পুষ্টিগত অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো।

একই সময়ে, মোট খানার প্রায় ৩০ শতাংশেরই জমিতে কোন প্রকার মালিকানা নেই এবং অন্য ৩০ শতাংশের মাত্র অর্ধ-একর পর্যন্ত জমির মালিকানা রয়েছে। এ ধরনের ক্ষুদ্র জোতের মালিকানা চার থেকে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি খানার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত। প্রান্তিক চাষীদের একটি বড় অংশকেই খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাজারের দ্বারস্থ হতে হয়, কেননা খানার চাহিদা মেটাতে তাদের নিজস্ব উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের অরক্ষণশীলতার প্রেক্ষাপটে কৃষি খাতের উন্নয়নের সাথে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যেতে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি শক্তিশালী করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৪.৩ ভবিষ্যতের জন্য কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার

টেকসই কৃষি ও সবুজ প্রবৃদ্ধির জন্য সুযোগ সৃষ্টি: টেকসই কৃষির জন্য ২০১৫ তে বিশ্বের সকল সরকার প্রধান জাতিসংঘের ১৭টি টেকসই অভীষ্টের প্রতি তাদের সর্বসম্মত সমর্থন ব্যক্ত করে। ক্ষুধা অবসান সংশ্লিষ্ট এসডিজি'তে টেকসই কৃষি প্রবর্ধনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ২০৩০ এর জন্য গৃহীত অভীষ্টের একটি লক্ষ্যমাত্রা হলো: খামারজাত ও গৃহপালিত পশু, চাষাধীন উদ্ভিদ ও বীজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সমান্তরালে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও ক্ষুদ্র খাদ্য-উৎপাদনকারীদের আয় দ্বিগুণ করতে পারে এমন একটি স্থিতিস্থাপক রীতি ও টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। কৃষিতে বর্তমান অর্জনের ওপরই গড়ে তোলা হবে টেকসই কৃষি, যা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কৌশলী ব্যবহার দ্বারা কৃষির উচ্চ ফলন ও উচ্চ মুনাফা বজায় রাখে এবং একই সাথে সম্পদ সংরক্ষণকেও অক্ষুন্ন রাখে। এ সবের ওপর কৃষি ব্যবস্থা একান্তভাবে নির্ভরশীল। টেকসই কৃষির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এমনভাবে করা হবে যে, তা হবে সম্পদ সংরক্ষণশীল, সামাজিকভাবে সমর্থনযোগ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবেশগতভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

শস্য-জোনিং, ভূমিব্যবহার পরিকল্পনা এবং নিখুঁত (প্রিসিশন) কৃষির বিকাশ: ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা বিবেচনায় রেখে খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও এর সংরক্ষণ উৎসাহিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাটি ও পানির সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন এবং ভূমি উন্নয়নও পুনরুদ্ধারমূলক কর্মসূচিসমূহে বিশেষ জোর দিতে হবে। শস্য জোনিং এর ভিত্তিতে উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং একই সঙ্গে যেখানে সম্ভব নিখুঁত কৃষি রীতি প্রবর্তন করা হবে। নিখুঁত কৃষি পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস ও সম্পদ সংরক্ষণ ছাড়াও উপকরণাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। লেজার যন্ত্রের সাহায্যে ভূমির সমতলায়ন, সংরক্ষণ ও ন্যূনতম চাষে জমি তৈরি, ভূগর্ভস্থ পাইপের সাহায্যে সেচ, ছিটানো সেচ পদ্ধতির, বিশেষভাবে তৈরি বেডে চারা রোপণ, ভাসমান কৃষি, জৈব চাষ, ইউরিয়া সুপার গ্র্যানিউল (ইউএসজি) ব্যবহার, সম্বন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, এবং সমন্বিত উদ্ভিদ ও পুষ্টি পদ্ধতি হলো নিখুঁত বা নির্ভুল কৃষির কিছু সংখ্যক উদাহরণ। এ পদ্ধতি উপকরণাদির অপচয় থেকে রক্ষা করবে, ফলন ও মুনাফা বৃদ্ধি করবে এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উন্নত করবে।

কৃষি উপকরণাদি -বীজ ও সার: বিএডিসি ছাড়াও বর্তমান বীজ নীতিতে সংকর ও উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজের গবেষণা ও উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। টেকসই কৃষি অর্জনকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হবে যাতে করে প্রজননকারী, ভিত্তি বীজ ও প্রত্যয়িত বীজসহ উৎপাদনের সকল পর্যায়ে

মানসম্মত বীজ/মানসম্মত চারা উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় এবং একই সাথে চাষীদের মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও কৃষক থেকে কৃষকে বীজ বিনিময়ে উৎসাহিত হয়। জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ উৎপাদন তৎপরতা বিস্তৃত করা হবে। সংকরজাতের বীজ উৎপাদন, বিপণন ও উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোসহ আধুনিক সুবিধাদি তৈরির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বীজ উৎপাদন, পরীক্ষণ ও সংরক্ষণের উন্নত পদ্ধতি বিস্তৃত করতে কৃষক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা অব্যাহত রাখা হবে।

শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণাদির মধ্যে সার অন্যতম একটি উপকরণ। নিবিড় চাষের সাথে আধুনিক কৃষি রীতি সম্প্রসারণের ফলে সারের জন্য বর্ধিত চাহিদা তৈরি হবে। এই বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন হবে সময়মতো সারের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। টেকসই কৃষির জন্য মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণসহ শস্যের উচ্চতর ফলন পাবার জন্য সার ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত উদ্ভিদ পুষ্টি পদ্ধতি অনুসরণ করাই সমীচীন। জৈবসারের উৎপাদন ও এর বর্ধিত ব্যবহার সহজীকরণের ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সারের সুষম ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সারে ভর্তুকির পুর্নবিন্যাস থেকে কিছু সুফল পাওয়া গেছে। সুতরাং. মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য চাষীদের সুষম সার ব্যবহারে উৎসাহিত করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে আশু প্রায়োগিক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

কৃষি বহুমুখীকরণে প্রণোদনা এবং উদ্যানভিত্তিক উৎপাদনের প্রসারণ: কৃষি বহুমুখীকরণ ফসল বিন্যাসে পরিবর্তন আনবে এবং খাদ্যশস্য-খাদ্যশস্য ফসল বিন্যাসের স্থলে খাদ্যশস্য-অ-খাদ্যশস্য ভিত্তিক উচ্চমূল্য ফসল বিন্যাসকে বিকশিত করবে। যার সহযোগী হিসেবে উদ্যানতাত্তিক ডাল ও তৈলবীজ ফসলের বিস্তারসহ মূল্যসংযোজন পণ্যও অর্ন্তভুক্ত থাকবে। কৃষি বহুমুখীকরণ প্রবর্ধনকালে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সহায়তা দানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উদ্বৃত্ত পণ্য লাভজনক দরে বিক্রয়ের সুবিধার্থে তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সংযুক্ত করতে নীতি সমর্থন দান করা হবে। স্থানীয় বাজারে বিক্রয় বা রপ্তানির জন্য পাট, তুলা, ইক্ষু, উন্নতমানের চা উৎপাদনের অধিকতর উন্নয়ন এবং সুগন্ধি চাল ও বাণিজ্যিকভাবে ফুল উৎপাদন। এগুলোর বিপণন ও সংশ্লিষ্ট মূল্য শিকলের উন্নয়ন দ্বারাও কৃষি বহুমুখীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হবে।

পানিসম্পদের ব্যবহার ও পানি সম্পৃক্ত অর্থনীতি: টেকসই কৃষি এবং শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি একটি অতি আবশ্যক উপকরণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচের পানি আর পাচ্ছে না। সুতরাং, ফসল নিবিড়তা তথা ফলনের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্যই একটি সু-পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা আবশ্যক। প্রাপ্ত পানিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উৎসাহিত করা হবে। এ কৌশলের অংশ হিসেবে বৃষ্টিবহুল/ উপকূলীয়/পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে পানি সংরক্ষণাধার, বৃষ্টির পানিধারণ ও সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদির বিশেষ যত্নসহ কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রায়তনের পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিবীক্ষণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি (বিশেষ করে এলজিইডি)/বিডব্লিউডিবি/বিএমডিসি/বিএমডিএ প্রভৃতির মাধ্যমে) গড়ে তোলা হবে।

উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি) প্রবর্তন ও জনপ্রিয়করণ: নতুন কৃষি নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের কৃষি-পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উত্তম কৃষি চর্চার প্রটোকল উন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের নতুন কৃষি নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও মানসম্পৃক্ত চাহিদা পূরণকল্পে অনুরূপ আরো কয়েকটি প্রটোকল যথা ব্যবহারবিধি প্রণয়ন, প্রমিতকরণ ও নিয়মাবলি বাস্তবায়ন করা হবে। কৃষি উত্তম চর্চার চারটি স্তম্ভ রয়েছে: অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও মান। এই প্রক্রিয়া বিকাশের জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্তৃক যৌথভাবে প্রচেষ্টা গৃহীত হবে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ: কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং উৎপাদনশীলতা বর্ধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার কাজের দক্ষতা বাড়ায় এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে; শস্য উৎপাদন নিবিড় করাসহ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরে সাহায্য করে; এবং ভূমি, শ্রম ও উপকরণের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধি করে। কৃষি যন্ত্রাদির ব্যবহার ফসল উত্তোলন এবং উত্তোলন-উত্তর ক্ষয়ক্ষতিসহ উৎপাদন ব্যয় ও কৃষি শ্রমিকদের কায়িক শ্রমের চাপ যায় এবং সময়মতো কর্মপরিচালনা, দ্রুততর গতি, উচ্চতর নির্ভুলতা ও উন্নত ফলন নিশ্চিত করে। যান্ত্রিকায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে;

উন্নততর জীবিকাসহ কৃষি পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি করা ছাড়াও মোট আয় বাড়িয়ে দেয়। তদুপরি, উচ্চ সংরক্ষণ ব্যয়, প্রাণিখাদ্যের স্বল্পতা ও গোচারণভূমির অভাবে কৃষি কাজে পশুশক্তির ব্যবহার প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ মানুষ কাজের জন্য ও উন্নততর সুবিধার আশায় শহরাঞ্চলের অভিবাসী হচ্ছে; এর ফলে কৃষি খামারগুলোতে কৃষি শ্রমিকদের ঘাটতি ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সাথে জ্বালানি সরবরাহের চাহিদাও বেড়ে যাবে। সেচসহ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সাথে সংযুক্ত জ্বালানি সরবরাহের বেশির ভাগ আসবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসগুলো থেকে, বিশেষ করে সৌর বিদ্যুৎ থেকে। অবশ্য নির্বাচিত ও চাহিদা ভিত্তিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারাদির ব্যবহার জনপ্রিয়করণ এবং কৃষি উৎপাদনে সৌর বিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার সহজীকরণে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা: কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ সুযোগ বৃদ্ধি ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি কমানোসহ কৃষকের আয় বাড়াতে পারে। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এখনো উন্নয়নের একেবারে প্রারম্ভিক স্তরে রয়েছে। খামারের পণ্যসামগ্রী ও উপজাত পণ্যসমূহের আদান-প্রদান, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং এর জন্য প্রযুক্তি ও সুবিধাদির অধিকাংশই নিম্নমানের ও সেকেলে এবং সেগুলো দিয়ে প্রাথমিকভাবে দেশীয় বাজার চাহিদা মেটাতে হয়। এ ছাড়াও এখানে অ-ব্যবহৃত বা অর্ধ-ব্যবহৃত সক্ষমতার মাত্রাও উদ্বেগজনক। দেশে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এখন প্রচুর পরিমাণে প্রযুক্তি নাগালের মধ্যে আসছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলোর ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদানসহ উচ্চ পর্যায়ে বেসরকারি খাত বিনিয়োগ সুবিধা বাড়াতে সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

মূল্য শিকল উন্নয়ন: উৎপাদকের খামার ও ভোক্তার মধ্যে কৃষিপণ্যের মূল্য যুক্তিসঙ্গত করতে বিপণনের সরবরাহ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ সনাক্ত করার জন্য মূল্য শিকল উন্নয়ন একটি নতুন হাতিয়ার। এর সকল পর্যায়ে বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর একটি টেকসই ও উন্নত মূল্য শিকল নির্ভরশীল। একটি কার্যকর বেসরকারি খাত চালিত মূল্য শিকল উন্নয়নসহ জটিল উৎপাদন ও বিপণন প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং আর্থিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ শিথিল করার নীতি অনুসরণ করতে হবে। কৃষিসামগ্রীর মূল্য শিকল উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যবসায় মডেল উন্নয়নের মাধ্যমে সরবরাহ শিকলের সর্বত্র হিম-শিকল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। দূরবর্তী স্থানে বহনযোগ্য প্যাকেজিং সামগ্রী যেমন প্লাস্টিক ক্রেট, করোগেটেড ফাইবার বোর্ড প্যাকেজিং এর মতো টেকসই প্যাকেজিং সামগ্রী, ন্যূনতম প্রক্রিয়াকৃত পণ্য উন্নয়ন প্রযুক্তি জনপ্রিয় করা হবে।

কৃষি ঋণ প্রবাহ আরো কার্যকর হওয়া দরকার: দীর্ঘ দিন থেকেই দরিদ্র কৃষক ও পল্লীবাসীদের জন্য ঋণ প্রাপ্তির অভাব ব্যাপক। চাষীদের নিজস্ব পুঁজির অপর্যাপ্ততা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সীমাবদ্ধতা গ্রামীণ দরিদ্র চাষীদের উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। নিজেদের টিকিয়ে রাখার নিমিত্ত গ্রামের মানুষের ঋণ দরকার তাদের কৃষি কাজে ও ক্ষুদ্র কৃষিব্যবসার জন্য, কৃষি উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য, বেঁচে থাকার মতো খাদ্য ভোগে ব্যয়ের জন্য এবং অর্থনৈতিক সংকট ও আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য। যেহেতু আনুষ্ঠানিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের প্রবেশাধিকার নেই, তাই তাদের পুরোপুরিভাবে ব্যয়বহুল অনানুষ্ঠানিক ঋণ উৎসের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। কৃষি ঋণ সুবিধা দানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থাগুলো সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এটি আরো শক্তিশালী করা সহ কৃষি ঋণের চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে বাজার চাহিদার উপযোগী করা হবে।

কৃষি গবেষণা: গবেষণা সংস্থাসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন (জাত ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন) ও তথ্য সরবরাহ এবং প্রয়াস পরীক্ষণসহ উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলোর অধিকতর উন্নয়ন। এটিকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা (পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয়, হাওর ও বরেন্দ্র অঞ্চল) মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্তভাবে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। কেননা এই অঞ্চলগুলো আবহাওয়াগত বৈরিতার সহজ শিকার এবং আনুপাতিকভাবে এই অঞ্চলগুলোতেই সবচেয়ে বেশি গরিব ও অরক্ষিত মানুষের বসবাস। গবেষণা প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে সেই সকল প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও পরিশীলন যা বহুমুখীকরণ বিকাশ ও ফলন ব্যবধান কমানোর সেতুবন্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, কৃষি উৎপাদকের জন্য বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি ধারণ ও সংরক্ষণ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, ফসলের মানসম্মত ফলনের জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, উচ্চমূল্য কৃষি পণ্যসামগ্রীর ফলনোত্তর প্রযুক্তিসহ উন্নত জাত/পদ্ধতি উদ্ভাবন, যান্ত্রিকীকরণ প্রভৃতি কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। এছাড়াও টেকসই কৃষি ও পরিবেশের জন্য জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল সংশ্লিষ্ট সমস্যারও মোকাবেলা করা হবে। বেসরকারি খাতে গবেষণা উৎসাহিত করা হবে।

৬.৫ কৃষি সম্প্রসারণ

উপযুক্ত সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শস্য উৎপাদন কর্মসূচির বহুমুখীকরণ ও নিবিড়ায়নের অপরিমেয় গুরুত্ব রয়েছে। সঠিক সময়ে ও স্থানে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও ব্যবস্থাপনা সহায়তা দানের জন্য সম্প্রসারণ সেবাকে তৎপর করে তোলা হবে। নতুন প্রযুক্তির প্রসার ও ব্যবহারের জন্য গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সংযোগ আরো শক্তিশালী করা হবে। বিপনন সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে; বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে ফসল কাটা পরবর্তী সময়ের ব্যবস্থাপনার উপর।

৬.৬ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির স্থায়িত্বের জন্য ভবিষ্যৎ কৃষিনীতি

অতীত অগ্রগতি ও চলমান ব্যবস্থা সত্ত্বেও, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধনশীল ঝুঁকির সাথে পাল্লা দিতে আরো বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া দরকার। বিশেষ করে কৃষি পণ্যের ফসল সংগ্রহ পরবর্তী বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ সেবা অবশ্যই উন্নত করতে হবে। কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সাথে চারটি কৌশলগত পদ্ধতির সম্পর্ক রয়েছেঃ

৬.৬.১ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা টেকসইভাবে নিবিড়করণ

দারিদ্র্য নিরসনসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা দিতে কৃষি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনগুলোর জন্য একটি মূলনীতি হলো টেকসই কৃষি নিবিড়ায়নের প্রয়োজনীয়তা, যা বেশ কিছু পদ্ধতিতে এগিয়ে নেয়া যায়, যেমন-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য তালিকায় পরিবর্তনের ফলে আগামী বছরগুলোতে খাদ্য উৎপাদনে অব্যাহত বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিতে নতুন জমি আনয়ন ছাড়াই বর্ধিত উৎপাদন প্রয়োজন হবে (উৎপাদনশীলতা বাড়ানো)।
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হবে সহিষ্ণুতা বাড়ায় এমন একটি ইকোসিস্টেম সেবা বিনির্মাণে অধিকতর যত্নবান হওয়া।
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়ন, সম্পদের বৈধ অধিকার বৃদ্ধি এবং অপচয় কমানো হলে কৃষি বিনিয়োগ হতে আরো বেশি উৎপাদন ও আরো স্থিতিশীল ফলন আহরণ সম্ভব।
- স্থায়িত্বের সাথে ফলন বাড়াতে হলে কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সকল চলমান ব্যবস্থা থেকে বিশেষ করে জৈব নীতিমালা, স্থানীয় ও উদ্ভাবনমূলক উদ্ভিদ প্রজনন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি থেকে লব্ধ জ্ঞান গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
- বন্যা উপদ্রুত/ব্যাপকভাবে প্লাবিত জমি, হাওর, চরাঞ্চল, পাহাড়ি, বরেন্দ্রভূমি, ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর মতো প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে ফসল আবাদের ক্রমবর্ধনশীল ব্যবস্থাকে অধিকতর বিস্তৃত করা অত্যন্ত জরুরি।
- কৃষকবান্ধব কৃষিনীতি প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন।
- দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিস্তারের মাধ্যমে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা।
- প্রণোদনা ও সংস্কারের মাধ্যমে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করা।
- প্রতি শ্রম এককে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার পাশপাশি ক্ষুদ্র চাষীদের আয় দ্বিগুণ করা হবে।
- ক্ষুদ্রচাষীদের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষাবাদ করতে উৎসাহিত করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস ও পুষ্টিগত মান উন্নয়ন সহ কৃষকদের কল্যাণ তৎপরতা বাড়ানো হবে।
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৬.৬.২ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উপাদান উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক দক্ষতা ও সহিষ্ণুতা বাড়ানো সম্ভব:

- উদ্ভিদের চাহিদার সাথে পুষ্টিমানের অধিকতর সতর্ক ও সূক্ষ সম্মিলন, ফসলের উচ্ছিষ্ট ও কম্পোস্ট সারের মাধ্যমে যথোপযুক্তভাবে মাটি ও মাটির পুষ্টিমান ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রিত-ছাড় ও গভীরে স্থাপিত প্রযুক্তি ফসলের ফলন ও সহিষ্ণুতা বাড়াতে পারে এবং একই সাথে প্রায়শই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক সারের চাহিদাও কমাতে পারে । (পাশাপাশি গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমানো সম্ভব)।

- পানি আহরণ ও ধারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন (মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি, আইল সংরক্ষণ, জলাশয় ও পুকুরের ব্যবহার) এবং পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (সেচ ব্যবস্থা)।
- আগাছা, কীটপতঙ্গ, ও রোগবালাই সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞানে প্রচুর ঘাটতি পরিদৃশ্যমান। এ ব্যাপারে বর্ধিত জ্ঞান পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে এগুলোর উন্নততর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।
- পানি সঞ্চয়ের জন্য পর্যায়ক্রমে সিক্ত ও শুষ্ককরণ পদ্ধতি, ফসলের উচ্ছিষ্ট সংরক্ষণ ও জমিতে স্বল্প চাষ সংবলিত সংরক্ষণমূলক কৃষি উৎসাহিত করা হবে।

৬.৬.৩ জীবিকা ও কৃষির উৎপাদন বহুমুখীকরণ

খামারে বা খামারি-গোষ্ঠীর কার্যক্রমে যখন অধিকসংখ্যক শস্যজাত ও পশুর প্রজাতি যুক্ত হয় তখন কৃষিতে বহুমুখীকরণ সহজতর হয়। এতে কাঙ্ক্ষিত ভূমি বিন্যাস অন্তর্ভুক্ত যাতে বিভিন্ন শস্য ও ফসল বিন্যাস সংগঠিত হয়ে থাকে। জীবিকা বহুমুখীকরণ দ্বারা বুঝানো হয় যে, কৃষি খানাসমূহ বিভিন্ন (কৃষি-বহির্ভূত) কাজে জড়িত, যেমন শহরে কোন চাকুরি করা, কোন দোকান চালু করা বা কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট কাজ শুরু করা। জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের জন্য বহুমুখীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বহুমুখীকরণ আয়ের ওপর আবহাওয়াজনিত ঘটনার প্রভাব কার্যকরভাবে কমাতে পারে এবং এছাড়াও তা ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষকদের সামনে অনেক বিকল্প উপায় মেলে ধরতে পারে। এই সকল সম্ভাব্য উপকারের প্রেক্ষাপটে বহুমুখীকরণকে প্রায়শই উপস্থাপন করা হয় একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে।

মৎস্যচাষ উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকার কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা হয়:

- খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি টেকসই করার জন্য মৎস্যস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল, মৎস্যচাষ নীতি, সামুদ্রিক মৎস্যনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- মৎস্যচাষ নিবিড়ায়ন ও প্রজাতি বহুমুখীকরণ বিকশিত করা হবে।
- মৎস্যচাষ উৎপাদন টেকসই ও বহুমুখী করার জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও মৎস্যচাষের উলম্ব বিস্তারে প্রধান অগ্রাধিকার দান করা হবে।
- মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সুনীল অর্থনীতির তৎপরতা থেকে সুফল আহরণের জন্য যৌথ সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- দরিদ্র খানাগুলোর পুষ্টিগত মান উন্নত রাখার ক্ষেত্রে জীবনধারণের জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যচাষ ও অন্যান্য উৎস হতে মৎস্য আহরণ অসামান্য অবদান রাখে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করতে মৎস্যচাষ ভিত্তিক কৃষি তৎপরতা আরো বিস্তৃত করা হবে।
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মূল্য শৃংখলের জন্য বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হবে।
- উন্নত চাষ প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষক/উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- আধুনিক ল্যাবরেটরি ও প্রসেসিং শিল্প স্থাপনা পরিচালনার জন্য উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা হবে।
- প্রশিক্ষণ ও মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায়/গরিব মৎস্যচাষীদের জন্য মৎস্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও অভিযোজনমূলক মৎস্যচাষ প্রযুক্তির প্রবর্তন।
- জেলে সম্প্রদায় যেহেতু একান্তভাবেই জলজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যার পরিবেশ অতীব অরক্ষিত ও ভঙ্গুর, তাই তাদের জীবিকা/উপজীবিকার ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা/গুরুত্বদান করা হবে।
- মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা আরো শক্তিশালী করা হবে।

৬.৬.৪ প্রতিক্রিয়া উন্নয়নে অনিশ্চয়তার মোকাবেলা

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনের মাত্রা ও পরিণতির প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাপক অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। এর সাথে পাল্লা দিয়েই আমাদের টিকে থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন হলো বিদ্যমান ব্যবস্থায় ক্রমাগত

পরিবর্তন বা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অধিকতর পরিবর্তন যা প্রায়শই বহুমুখীকরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং নতুন ও অজানা ঝুঁকির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ তৈরি করে। কৃষিতে রূপান্তরধর্মী পরিবর্তন নতুন নয়। খাদ্যশস্যের পরিবর্তে জৈব জ্বালানি শস্যের চাষ, জীবনধারণ ভিত্তিক কৃষির পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বাণিজ্যিক কৃষির প্রবর্তন আবশ্যক। এ কারণে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে (অনুচ্ছেদ ১২.২) একটি অভিযোজনমূলক ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬.৭ ভবিষ্যতের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত বাণিজ্যিক কার্যাবলি। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। বিগত দশকে বাংলাদেশে যদিও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে, তবু নাগরিক সেবা ও সুবিধার দিক থেকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এখনো ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি অগ্রাধিকার হবে গ্রাম-শহরের এই বিভাজন পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা। এই লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে:

ক. আমার গ্রাম, আমার শহর: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নাগরিক সুবিধাবলি নিশ্চিত করা:

- অগ্রাধিকার দেয়া হবে প্রত্যেকটি গ্রাম পর্যন্ত এমন সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা জলবায়ু পরবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং যা উচ্চ-মধ্যম আয়ের অর্থনীতি সহায়ক হবে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ একটি উপজেলা মাস্টার প্লান তৈরী করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (এলজিআই) মাধ্যমে সে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যাতে করে গ্রামগুলো সঠিক উপায়ে, বদলে গিয়ে শহরে পরিনত হয় এবং অর্থনীতির প্রতিবেশকে পুনর্বহাল করে। এলজিডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে যাতে করে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে মাস্টার প্লান তৈরী ও বাস্তবায়ন করা যায়।
- সকল গ্রামে, বিশেষ করে লবনাক্ত পানির ঝুকিপূর্ণ চর এলাকা, আর্সেনিকের ঝুঁকির এলাকা, পাহাড়ী, ও হাওর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশের ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামেগুলোতে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের আওতায় আনা হবে। সেই সাথে বিশেষ নজর দেয়া হবে স্যানিটেশন ও মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর যাতে করে গ্রামীন জলাধারের নির্মল অবস্থা ফিরে আসে।
- গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র/বাজার ও গ্রামের জন্য কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। গ্রামের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এলজিআই-গুলোর সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- 'আমার গ্রাম-আমার শহর' প্রোগ্রামের আওতায় গ্রামগুলোতে কমুনিটি স্পেস এবং বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বলিত অবকাঠামো তৈরী করা হবে।
- গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃজনকল্পে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সহায়ক সেবাসহ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে এবং যুবকদের জন্য বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য যারা হবে ভবিষ্যতের মানব সম্পদ - তাদের কাজের সুযোগ তৈরি করতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।
- গ্রামীণ যুবকদের জন্য তাদের পারিবারিক চাহিদা ও চাকুরির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং শিক্ষাগত মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। যারা দক্ষ তাদের জন্য ঋণ সহায়তার দান করা হবে।
- গ্রামীণ আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি নিশ্চিত করা হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কর্মসূচি থাকবে।
- গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।
- উৎপাদনে ও ব্যবসায়ী কার্যক্রমে ব্যাংক ঋণে অভিগম্যতা উন্নত করা হবে।
- কৃষিজমির অনুচিত ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে কঠোর আইন প্রবর্তন করা হবে।

- জমির রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে ডিজিটায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বেদখলকৃত সরকারি জমি, বিশেষ করে ইতোমধ্যে খাল ও নদীর পাড়ে মাটি ভরাট করে অবৈধ দখলসহ বেহাত হয়ে যাওয়া খাস জমি পুনরুদ্ধারকল্পে কর্মসূচি নেয়া হবে।
- উপজেলার প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল গ্রামের সংযোগ স্থাপন করা হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছানোর জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ উপজেলাকে শক্তিশালী করবে।
- বর্তমানে সারা দেশে ২১০০ গ্রামীন প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র আছে। ১৯৯০ এর দশকে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এইসব প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র বানানো আর সেগুলোকে মানসম্মত সড়কের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। অর্থনীতির উন্নয়নের চলমান অবস্থায় সারাদেশে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো খুব দরকার। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর জন্যও সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা জরুরী।

উপরিবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামের ভিত্তি আরো শক্তিশালী ও আরো উৎপাদনশীল করা হবে এবং এভাবে গ্রাম-শহরের বিভাজন পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা হবে।

খ. গ্রামগুলোতে কৃষিভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প স্থাপনসহ কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপন উন্নত করা:

- সমবায়মূলক খামার ব্যবস্থা দ্বারা গ্রামাঞ্চলে হিমাগার সুবিধা গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানাদির সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।
- গ্রামাঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পকারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে, যেমন,
  - o জ্যাম, জেলি, জুস, সস, আচার, চিপস্, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প;
  - o ফিশ বল, ফিশ বার্গার, ফিশ পেস্ট, ফিশ স্টিক, ফিশ নুডুলস্ প্রভৃতি ম্যানুফ্যাকচারি;
  - o দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং হিম-শিকল যোগাযোগ ব্যবস্থা।

গ. সুনীল অর্থনীতি নিশ্চিত করে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সুরক্ষায় অবদান রাখার জন্য বিশাল সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার:

- কৃষি খাতে সী-উইড ব্যবহার করে জৈবসারসহ কেক, জেলি, স্যুপ, রোল, সালাদ তৈরি করা হবে।
- মিঠা পানি ও সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে মৎস্য আহরণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হবে।

৬.৮ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখা

সামনে এগিয়ে যাবার প্রাক্কালে নীতিপ্রণেতাগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিবেচনায় রাখবেন যে, ভবিষ্যৎ জলবায়ু যে সমস্যা বিস্তার করবে তা ইতিহাসের অভিজ্ঞতারও বাইরে। তাই টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ জীবিকা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এখনই অভিযোজন ও প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষির মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর জলবায়ু-সংবেদনশীল খাতগুলোতে কারিগরি ও অ-কারিগরি অভিযোজনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এগুলোর অভিযোজনমূলক সক্ষমতা বিনির্মাণ ও উন্নয়ন করা বাংলাদেশের জন্য সবচাইতে জরুরি অগ্রাধিকার। এছাড়াও, মাটি ও প্রাণিসম্পদ, বনসম্পদ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদসহ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান খাতগুলোতে অভিযোজনমূলক কর্মব্যবস্থা পরিচালনার জোর প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

কৃষিখাতে অগ্রাধিকার হলো- সরকারি পণ্য ও সেবা সুবিধা দিয়ে স্থানীয় অভিযোজনমূলক সক্ষমতা শক্তিশালী করা। এই সুবিধাদিতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে - উন্নততর জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য ও আবহাওয়ার পুর্বাভাষ, জলবায়ু-সহিষ্ণু কলাকৌশল ও তাপসহিষ্ণু শস্যজাত উদ্ভাবন ও গবেষণা, আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থা এবং দক্ষ সেচ ব্যবস্থা; সম্ভাবনাযুক্ত প্রাণিসম্পদ প্রজাতি ও গবাদি খাদ্যের ঘাস জাতের অনুসন্ধান, এবং সূচক-ভিত্তিক বিমা স্কিমের জন্য উদ্ভাবনমূলক ঝুঁকি-ভাগাভাগি-করার কৌশল অন্বেষণ।

পানিসম্পদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হলো পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান উত্তম রীতিসমূহের অধিকতর উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ স্কিম, বন্যার উন্নত আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা, সেচ উন্নয়ন ও এর চাহিদা ব্যবস্থাপনাসহ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা আরো ব্যাপকভাবে প্রয়োগ। যেহেতু পানি, এনার্জি ও খাদ্যের উপাদানের মধ্যে একটা মেলবন্ধন আছে তাই এর মাধ্যমে, খাদ্য, জ্বালানী নিরাপত্তাসহ 'পানির নিরাপত্তা' ও নিশ্চিত করা হবে।

বন খাতে অগ্রাধিকার হলো বনায়ন ও পুনর্বনায়নের জন্য কার্যকর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বাস্তবায়ন।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ খাতে অগ্রাধিকার হলো ম্যাংগ্রোভ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণসহ সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। এ ছাড়াও মূল্য সংযোজিত পণ্য উন্নয়ন, মৎস্য আহরণোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের টেকসই ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মাছের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুফল (এমইওয়াই) হবে এর দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অংশ।

দেশের ভেতরে এবং বিদেশে স্বাস্থ্যসম্মত শুঁটকি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত শুঁটকি মাছ উৎপাদনের জন্য বিএফডিসি'র উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আধুনিক শুঁটকি মহাল গড়ে তোলা হবে। মৎস্য খাতের উন্নয়ন থেকে বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্প উদ্দীপনা পাচ্ছে। নির্মাণ/মেরামত/ডকিং/আনডকিং সুবিধাদির জন্য বহুসংখ্যক মাছ ধরার ট্রলার, বার্জ, টাগবোট ও জলযান প্রয়োজন। বিএফডিসি ইতোমধ্যেই চট্টগ্রাম মৎস্য পোতাশ্রয় ও পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ডকইয়ার্ড স্থাপন করেছে। এই সুবিধা বাড়ানোর জন্য আরেকটি দুই চ্যানেল বিশিষ্ট স্লিপওয়ে সম্প্রতি চট্টগ্রাম ফিশ হারবারে নির্মিত হয়েছে। মাছ ধরার নৌকার জন্য ডকিং সুবিধা বিস্তারের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে আরো ডকইয়ার্ড স্থাপন করা হবে।

সকলের জন্য লাভজনক কিছু ব্যবস্থা রয়েছে যা জলবায়ু মোকাবেলা এবং সেই সাথে উত্তম টেকসই উন্নয়ন চর্চার ও সহায়ক। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন করতে পারে এবং তাদের অভিযোজনমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য প্রণোদনা দানসহ কার্যকর নীতিকাঠামোগত সুবিধাদানে সরকারের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও, শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের (যেমন উপকূলীয় হটস্পট জোন) ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একটি অধিকতর সার্বিক পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঝুঁকিতে এটি তাদের সহিষ্ণুতা বিনির্মাণসহ স্থানীয় অর্থনীতি ও জীবিকা বহুমুখী করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যা ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

অধ্যায় ৭

একটি ভবিষ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান

একটি ভবিষ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান

৭.১ একবিংশ শতাব্দীতে শিল্প ও বাণিজ্য

৭.১.১ শিল্প নীতি এবং শিল্পায়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তার গতি বৃদ্ধি যখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন বাণিজ্য এবং শিল্পনীতির মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক বিরাজ করে। ১৯৮০-এর দশকে উন্নয়ন তত্ত্ব চর্চায় উদ্ভব হয়েছিল একটি নতুন উন্নয়ন ধারণা - রপ্তানিচালিত প্রবৃদ্ধি। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির কৌশল রচনায় এ ধারণাটির ভিত্তিতে এমন একটি বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থা চালু করা হয় যার লক্ষ্য ছিল বহির্মুখী সুবিধা অর্জন (রপ্তানিমুখী) অর্থাৎ দেশের শিল্প প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিশ্ববাজারের সুবিধা কাজে লাগানো। এর ফলে, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যনীতি এদেশের উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনে বাণিজ্য (অর্থাৎ রপ্তানি এবং আমদানি) হবে দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: একদিকে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় কাজে লাগবে এমন পণ্য, যেমন- অত্যাবশ্যক কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য (খাদ্য এবং কাঁচামাল) সরবরাহ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রধান চালক শিল্পখাত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশীয় নীতি তৈরির সময় বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো দুটি ধারায় ভাগ করা যায়: আমদানি-বিকল্প শিল্প উন্নয়ন এবং রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন। শিল্পনীতি দুই ধারার পরিপূরকতার পাশাপাশি বাণিজ্যনীতির দুই ধারা- আমদানি প্রতিস্থাপন আর রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রণোদনা নির্ধারণে দ্বন্দ্বের কারণে, বাণিজ্য নীতির সাথে মিল রেখে শিল্পনীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিমুখী শিল্পায়ন নীতির মৌলভিত্তির অংশ হিসেবে মোটাদাগে দুটি পরস্পর প্রতিযোগী কৌশল সামনে চলে আসে একটি বেছে নেয়ার প্রশ্ন: তুলানামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুসারি (সিএএফ) কার্যক্রম অথবা তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব বিরোধী (সিএডি) অবস্থান। সিএএফ শিল্প ও বাণিজ্য নীতি এমন সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ জোগায় যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের তুলনামূলক সুবিধা (যেমন, শ্রমঘন উৎপাদন) বিবেচনায় রাখে। অন্যদিকে সিএডি নীতিসমূহ বাণিজ্যে তুলনামূলক সুবিধা (যেমন, শ্রমনির্ভর অর্থনীতির অধিক সুরক্ষা বিবেচনায় রেখে প্রযুক্তিঘন আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান) - এর কথা বিবেচনা নাও করতে পারে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদকালে বাণিজ্য এবং শিল্পনীতি প্রণয়নের সময় এই দুটি ধারার কথা বিবেচনায় নেয়া হবে।

একটি বিচক্ষণ শিল্পনীতি বাজার শক্তি কাজে লাগানোর পরিপূরক হওয়া উচিত, যেন তা শিল্পখাতের অগ্রগতির সর্বাধিক সুফল কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসৃজনে অবদান রাখতে পারে। বাস্তবে বাংলাদেশের শিল্পনীতির রয়েছে বহুবিধ উদ্দেশ্য, যেমন- কর্মসৃজন, শিল্পায়িত অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তনে উৎসাহ প্রদান, প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্পখাতে কাজের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা, পশ্চাদপদ এলাকায় বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, এবং আয়-বন্টনে অধিক সমতা আনয়নে সহযোগিতা করা। ব্যাপক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের অভিপ্রায় থাকলেও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এর শিল্পনীতিতে ফলপ্রসু কিছু অগ্রাধিকার নির্ধারণের উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বহুবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে পর্যাপ্ত নীতি না থাকার কারণে জরুরী হলো, সীমিত সংখ্যক সুস্পষ্ট কিছু উদ্যেশ্য ঠিক করে নিয়ে কাজ করা। অনেক বেশি উদ্দেশ্য থাকলে একটি সাথে আরেকটির আন্ত:সঙ্গতির সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মেয়াদে আমাদের শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য হবে কাঠামোগত রূপান্তর, যেন ২০৩১ সালের মধ্যে জিডিপিতে শিল্পের অংশ ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তা ২০৪১ সালের মধ্যে জিডিপির ৩৩-৩৫% নেমে আসবে। যাতে বিপুল অনিয়োজিত শ্রমশক্তিকে কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। এছাড়াও, শিল্পখাতকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা সক্ষম করার কৌশল হিসেবে শিশু শিল্প সুরক্ষার জন্য সময়াবদ্ধ এবং ফলাফলভিত্তিক মানদন্ড চালু করতে হবে। বাংলাদেশে শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় হলো একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

অবশেষে, একুশ শতকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উত্তর বাংলাদেশে ডব্লিউটিও-এর সাথে সংগতিপূর্ণ শিল্পায়ন নীতি কেবল লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ার বদলে ব্যাপক বিস্তৃত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বিনিয়োগ অথবা রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত শিল্পায়নের প্রণোদনা নীতির আওতায় কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নিম্নতম ব্যবস্থাসমূহ চালু করার সুযোগ থাকবে। শিল্প উন্নয়নের জন্য উৎসাহপ্রদানমূলক সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নীতির মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো, মানব সম্পদ উন্নয়ন, উদ্ভাবন, এবং প্রযুক্তির প্রসার। আর এসব কিছুই রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১.২ বিশ্বায়নের যুগে বাণিজ্য বিন্যাস ও কাঠামোগত রূপান্তর

আমরা আজ এমন একটি বিশ্বে বসবাস করছি, যা প্রতিনিয়ত প্রায় কল্পনাতীতভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল। ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি হারের যে অভিজ্ঞতা বিগত শতাব্দীগুলোতে সঞ্চিত হয়, এর সম্পূর্ণ বিপরীতে আজ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর জন্য বার্ষিক ৭, ৮ বা ৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছে দ্রুত সংহতিশীল একটি বৈশ্বিক অর্থনীতির ফলে সামর্থ্য বৃদ্ধির কারণে। বৈশ্বিক অর্থনীতি দুটি বিষয়ের উদ্ভব করে। একটি হলো বিশাল বাজার যা সময়ের ধারার সাথে আরো সম্পৃক্ত হচ্ছে। প্রথমত, যদি কোন অর্থনীতির কিছু প্রতিযোগ-দক্ষতা থাকে যা বাংলাদেশের আছে - তবে তা বাড়বে মূলত যতো দ্রুত সে বিনিয়োগসহ উৎপাদনশীল সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি এই যে, বৈশ্বিক অর্থনীতি আমাদের সামনে মেলে ধরে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান। ডিজিটায়িত তথ্যের তাৎক্ষণিক সঞ্চালনের সাথে বিশ্বায়নের সম্মিলন জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষণ প্রবাহকে ত্বরান্বিত ও প্রসারিত করে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ক্লাউস স্কোয়াব এর অভিমত অনুযায়ী, ডিজিটাল যুগে এমন পরিবর্তন ঘটবে "যা মানব সম্প্রদায় অতীতে কখনো দেখেনি, বা ভাবেওনি"। এই বৈশ্বিক শক্তিগুলোকে সঠিক ভাবে আয়ত্তে আনা গেলে তা বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে আরো উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থ করে তুলবে, যা ইতোপূর্বে সম্ভবপর ছিল না।

বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং উচ্চতর উৎপাদনশীলতার এখনো একটাই উপায় রয়েছে। সেটি হলো কৃষি থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ রূপান্তর। এই রূপান্তরের ধারা পরবর্তী দশকগুলোতেও অব্যাহত থাকবে ও আরো বেগবান হবে। ভবিষ্যতে এই রূপান্তরের ওপর চাপ আসবে উদ্ভাবনের জন্য এবং শিল্পসম্মত প্রতিযোগ-দক্ষতা অর্জনের জন্য, কেননা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ৭০% আসে ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য থেকে। এটি স্পষ্ট যে, প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার সদ্ব্যবহার দ্বারা আয় বৃদ্ধিসহ উত্তম কর্মসুযোগ তৈরিতে বর্হিমুখী শিল্পায়নেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। এজন্য শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যৎ উন্নয়ন চাহিদা এবং বৈশ্বিক ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন জরুরি। বিশেষ করে আমাদের নীতি-প্রণেতাদের এটি বিবেচনায় নেয়া দরকার যে, কম দক্ষতাসম্পন্ন ও স্বল্প মজুরি শ্রমের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে আমরা যে প্রতিযোগিতা-সুবিধা ভোগ করছি তা একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যাপক বিস্তারে অত্যন্ত হুমকির মুখোমুখী হবে।

এই বৈশ্বিক ধারা বিবেচনায় নিয়ে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের বর্তমান অবস্থার ওপর আস্থা রেখে বাংলাদেশকে একটি নিম্ন-মধ্যম-আয় দেশ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম-আয় দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-আয়-দেশে রূপান্তরের পথ নকশা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ তুলে ধরা হয়েছে । এটি এমন একটি পরিকল্পনা যা ইতিহাসে একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দ্রুততম রূপান্তরগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা রয়েছে তেমনি সম্ভাবনাও বিদ্যমান, যদি দেশের মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনকে একটি গতিশীল পথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। দেশের তুলনামূলক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে কৌশলগত বাণিজ্যিক সমন্বয় হবে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির একটি প্রধান পথ।

আগামী ২০৪০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে, এর কিছু বিষয় নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা গেলেও অন্য বিষয়গুলো শুধু অনুমানই করা যায়। বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে যাচ্ছে, এমন বিষয়ে বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রথমে একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্পক্ষেত্রে বিবর্তন ও রূপান্তরের একটি রূপকল্প বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে এবং এর পরে বিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প বিষয়ে একইভাবে আলোকপাত করা হবে।

পরবর্তী সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় জুড়ে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সিংহভাগ হবে বহুমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে, যা বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতাসক্ষম, রপ্তানিমুখী এবং উত্থানশীল বাজারগুলো দখলে আনতে অধীর এবং একই সাথে বিশ্বের উন্নত অর্থনীতিতে এর বাজার সম্প্রসারণের জন্যও আগ্রহী। এ ব্যাপারে কৌশলগত পদ্ধতি হবে এই সত্য মেনে নেয়া যে, বাণিজ্য ও শিল্প নীতিমালা পারস্পরিকভাবে শুধু স্বতন্ত্রই নয় বরং স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতাও প্রদর্শন করে। এভাবে একটি শিল্পায়ন কর্মসূচি ও উপযুক্ত বাণিজ্যনীতির দৃষ্টান্ত একই উন্নয়ন কৌশলের অংশ বিশেষ। ভবিষ্যতের জন্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি কৌশলের সঞ্চালক নীতি হবে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের সাথে বহির্মুখী বাণিজ্যনীতির সামঞ্জস্য বিধান করা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প সম্ভাবনা যেহেতু (ক) বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য, (খ) বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ এবং (গ) ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবার ভবিষ্যৎ রূপান্তর দ্বারা নির্ধারিত বাণিজ্য নীতিমালার উদ্ভবের প্রক্ষেপিত ধারার সাথে জটিলভাবে সম্পৃক্ত হবে, তাই বাংলাদেশের কর্মসুযোগ সৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ একটি সমন্বিত বাণিজ্য ও শিল্প কৌশল গ্রহণ করা হয়। এই কৌশল গড়ে ওঠে চারটি আন্তঃসংযুক্ত ও কৌশলগত শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপর, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে পারে এবং ২০৪০ এর দশকে বাংলাদেশকে উচ্চ-আয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে:

ওয়াশিংটন ডিসি'র প্রিন্সটন ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স-এর অরবিন্দ সুব্রামানিয়াম ও মার্টিন কেসলার বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের অবস্থা ও সমকালীন বৈশ্বিক গতিধারা প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে যথার্থভাবেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন, যেগুলো ভবিষ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যে কোন দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা রাখতে পারে।

১. উচ্চ-বিশ্বায়ন ও সর্বজনীনকরণ: বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাসে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সর্বোচ্চ উদারতাসহ বিশ্বায়নের ব্যাপকতর বিস্তার।

২. বৃহৎ ব্যবসায়িক সম্প্রদায়: অন্যান্য উত্থানশীল বাজার অর্থনীতিসহ চীন ও ভারতের উত্থান।

৩. বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি: বৈশ্বিক বাণিজ্যে সেবার ক্রমবর্ধনশীল গুরুত্ব।

৪. আঞ্চলিক ও প্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি: এ ধরনের চুক্তি সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি ও বৃহৎ আঞ্চলিক চুক্তি বিষয়ে চলমান আলোচনার অগ্রগতি।

বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ: বিশ্বে বহু শতাব্দী যাবৎ বিশ্বায়ন ঘটছে। তবে বিগত ২৫ বছরে বিশ্বায়ন হয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, এমন এক গতিতে যা অতীতে কখনোই ঘটেনি যা উচ্চ-বিশ্বায়ন রূপে বর্ণিত হয়ে থাকে। বৈশ্বিক বিশ্লেষকবৃন্দের প্রায় সকলের ধারণা এই যে, আগামী ২০ বছর বিশ্ব এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে যেখানে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক উদারতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি বৈশ্বিক অবকাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তি, পুঁজি ও জ্ঞানের আন্তঃসীমান্ত প্রবাহ দ্বারা চালিত ত্বরান্বিত বিশ্বায়নের ।

চীন ও ভারতের উত্থান: বিশ্ব ব্যাংক (গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস, ২০০৭) প্রক্ষেপণ করে যে, পরবর্তী ২০ বছর উচ্চ-আয়ের দেশগুলো তাদের জিডিপি দ্বিগুণ হতে দেখবে। এ সময় বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত চালিত হবে চীন ও ভারতের বিস্তৃতির কারণে এবং এর দ্বারা সৃষ্ট প্রভাবের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপি বাড়বে তিনগুণেরও বেশি। এ পথে এগিয়ে যেতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত অনেক বাধা আসবে, যেগুলো বিশ্ব নেতৃবৃন্দকেই অর্থনৈতিক সুশাসনের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সামাল দিতে হবে। চীন একটানা রপ্তানি ও বৃহৎ বাণিজ্যের তীর্থভূমি হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখার সম্ভাবনা বেশি। এই সকল আন্তর্জাতিক ওঠানামার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতিপ্রণেতাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ সে সময়ে আমাদের অর্থনীতি এখন যে অবস্থায় আছে তার চাইতে আরো গভীরভাবে একীভূত হবে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে।

আঞ্চলিক ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (আরটিএ ও পিটিএ) সংখ্যাধিক্য: প্রতীয়মান হয় যে, বিগত ২৫ বছরে বিশ্বায়নের সাথে আঞ্চলিক ও প্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তির সংখ্যাও বেড়েছে। গত ১৯৯০ থেকে, প্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তির সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে এবং এবং শীর্ষ ৩০টি রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির অংশীদারদের কাছে যায়। বাংলাদেশের ঘরের কাছে আঞ্চলিক চুক্তির মধ্যে রয়েছে আসিয়ান+, যা অচিরেই পূর্ব এশীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক কমিউনিটি হতে যাচ্ছে (আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব) মূল ১০টি অর্থনীতি নিয়ে (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস্, ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার) সাথে যুক্ত হয়েছে আরো ৫টি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনীতি

(চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া) এবং ভারত। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ শুধু একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, সাফটা - এর সদস্য। সুতরাং, দক্ষিণ এশিয়ার কাছাকাছি বড় বড় বাজারে প্রবেশ করার জন্য অপরাপর আঞ্চলিক জোটগুলোর সাথে কর্মসংযোগ বাড়ানোর জোর প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

৭.১.৩ বৈশ্বিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য গতিধারা

বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্পের প্রেক্ষাপটে, বাণিজ্য-বিশ্লেষকবৃন্দ (অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স ও এইচএসবিসি গবেষণা, গ্লোবাল ট্রেড রিভিউ ২০১৫) বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এমন কয়েকটি প্রধান গতিধারা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য একটি সিদ্ধান্ত হলো সেবা-চালিত শিল্প আগামীতে প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং সুস্পষ্ট স্থায়িত্বের লক্ষ্য সংবলিত ব্যবসায় সাফল্য লাভ করবে। অর্থাৎ, ব্যবসায় এটি নিশ্চিত হতে হবে যে এর সরবরাহ শৃংখল বা চেইনগুলো টেকসই। সেবার বাণিজ্য হবে ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ফলে আমরা যেভাবে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করি, এতে পরিবর্তন আনা দরকার - যেমন মূল্যসংযোজিত সেবায় বাণিজ্যের জন্য হিসাবরক্ষণ। এর কারণ বাণিজ্যকৃত বহু পণ্যের মধ্যেই সেবা উপাদান নিহিত। উদাহরণ, একটি স্মার্টফোনের অতিক্ষুদ্র অংশ হলো হার্ডওয়্যার। এর সাথে সফটওয়্যার আপডেট আকারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সেবা যুক্ত হয় এটিও বিবেচনায় রাখা দরকার। একইভাবেই ভবিষ্যতের বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা ও শিক্ষা সেবার ক্রমবর্ধমান রপ্তানি তার জায়গা করে নেবে। অর্থাৎ, বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী যে ছয়টি উল্লেখযোগ্য গতিধারা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, সেগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে:

- ***বাণিজ্য উদারীকরণ অব্যাহত থাকবে:*** বৃহৎ আঞ্চলিক জোটে'র উত্থানকে উৎসাহিত করতে এবং বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে মান ও নিয়ন্ত্রণের অব্যাহত সঙ্গতিবিধান ও মুক্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে বাণিজ্য উদারীকরণের গতি অব্যাহত রাখা হবে। অধিকতর স্থিতিশীল রাজনৈতিক আর্থিক পরিবেশ বজায় রাখা হবে, যা বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের জন্য বাণিজ্যকে সহজতর করবে।

- ***বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যয় হ্রাসসহ বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করবে:*** প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহে উন্নতির মাধ্যমে বাণিজ্যের উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে। বন্দরের বিস্তার ও একাধিক বৃহৎ আয়তনের জাহাজ ব্যবহারের সুবিধা দিয়ে জাহাজীকরণ ব্যয় কমিয়ে আনা হবে। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অধিকতর নৈপুণ্য এবং বর্ধিত জ্বালানি দক্ষতার সাথে নতুন বিমানবন্দরগুলো বাণিজ্যকে আরো গতিশীল করবে এবং বিমান পরিবহন ব্যয়ও হ্রাস করবে। এছাড়া, পরিবহন প্রযুক্তি ও অবকাঠামোতে অব্যাহত অগ্রগতি সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন নৌ বাণিজ্যের পথও উন্মোচন ঘটবে।

- ***বৈশ্বিক মূল্য শৃংখলের উদ্ভব হবে এবং সংহত হবে:*** বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক মূল্য শৃংখলের সাথে একীভূত হবার ক্ষেত্রে যে সুযোগ বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যায় তা পুনরুদ্ধারের জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, নানা ধরনের বিপুল পরিমাণ মধ্যবর্তী পণ্য ও সেবা বাণিজ্যসহ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহণের জন্যই বাংলাদেশ এই সুযোগ হারায়। এই পদ্ধতি আমাদের সামনে রপ্তানি বহুমুখীকরণের দিগন্ত খুলে দিবে।

- ***শিল্প ও বাণিজ্যে ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং টেকসহিতার চালক:*** ডিজিটাল উদ্ভাবন ব্যবসায় ও ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ প্রদান অব্যাহত রাখবে। নতুন প্রযুক্তি নতুন পণ্য ও ব্যবসায়-মডেল তৈরি করে, যা অবস্থানের গুরুত্বকে লঘু করে বিভিন্ন বাজারের জন্য অভিযোজন করা যায়। ক্রমবর্ধিতভাবে আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত অর্থনীতিসমূহ বিশ্বব্যাপী ধারণার ক্ষেত্রে আনবে দ্রুত পরিবর্তন ও সঞ্চালন। সরবরাহ শৃংখলেও দরকার উদ্ভাবন যাতে তা বৃহত্তর পরিবেশগত টেকসহিতার জন্য চাহিদা ও বর্ধনশীল প্রত্যাশার সাথে সচল থাকতে পারে।

- ***বৃহৎ আকারে ভোক্তা উপযোগীকরণ:*** ভবিষ্যতের কারখানাগুলো বড় ও অনমনীয় না হয়ে হবে ছোট ও নমনীয় প্রকৃতির এবং এগুলোর অবস্থান হবে গ্রাহকদের একেবারে কাছাকাছি (ফ্যাক্টরিজ অব দি ফিউচার ২০২০ ইউরোপিয়ান ফ্যাক্টরিজ অব দি ফিউচার রিসার্চ এসোসিয়েশন)। ডিজিটায়নের সাথে সহজেই বড় আকারে ভোক্তাদের উপযোগী হয়ে পণ্য বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হতে পারে, এভাবেই গণ-উৎপাদন গণ-চাহিদা ভোক্তা উপযোগীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়।

- ***ক্ষুদ্র-বহুজাতিক সংস্থার উত্থান ও উন্নতি ঘটবে:*** ডিজিটায়ন ও শক্তভাবে সংযুক্ত বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার জন্য সমতল ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ পাবে। থ্রিডি প্রিন্টিং-এর মতো নতুন প্রযুক্তি ক্ষুদ্র অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বের যে কোন প্রান্তে পণ্য বিপণনের সুযোগ খুলে দিবে। অর্থনীতির মানদণ্ডের ক্ষেত্রে এটি একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর। এটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করবে।

- ***উদার বাণিজ্য ব্যবস্থা:*** একটি সুসংহত বিশ্ব অর্থনীতিতে রপ্তানি সাফল্য এগিয়ে নিতে বাণিজ্যের উদারতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কমিশনের চেয়ারম্যান নোবেল পুরুস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ মাইকেল স্পেন্স যৌক্তিকভাবে বলেন যে, বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির সম্পদ ও চাহিদার উন্নতি দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে অর্থনীতিতে অব্যাহত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। উন্নয়নশীল ও উত্থানশীল অর্থনীতিগুলো যখন উন্নত ও উচ্চ-আয় দেশের স্তরে উন্নীত হতে চেষ্টা করে, তাদের অগ্রগতিতে তখন বাণিজ্যের প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকা আরো বেশি সংহত ও বেগবান হয়। উন্মুক্ত বাণিজ্যি তাই উন্নয়নের আরেকটি স্তম্ভ, যাকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সাথে সার্বিকভাবে একীভূত করতে হবে। অন্য কথায়, পরবর্তী ২০ বছর ব্যাপী বাংলাদেশের মধ্যম-আয় ও উচ্চ-আয় মর্যাদার দিকে অগ্রযাত্রায় প্রধান চালিকাশক্তি হবে একটি উচ্চ পরিকৃতিসম্পন্ন রপ্তানি খাত, যা বিশ্বায়নের চরম একটি ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা রাখে।

৭.২ বিশ্বায়নের নতুন যুগে বাণিজ্য

৭.২.১ বাংলাদেশের রপ্তানি পরিকৃতি ও বাণিজ্য ব্যবস্থা

১৯৯০ দশকের গোড়ার দিক থেকে বাণিজ্যিক উদারতায় অগ্রগতি স্পষ্টভাবে উন্নততর রপ্তানি অর্জনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৯৯০ সাল থেকে জিডিপিতে বাণিজ্যের অংশ যখন থেকে উর্ধ্বমুখী তখন তা ছিল মাত্র ১৯ শতাংশ। কর্মসংস্থান ও আয়ের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর তার ক্রমবর্ধিত নির্ভরশীলতাসহ বাংলাদেশ যে এখন একটি বাণিজ্যিক জাতিতে পরিণত হয়েছে, তারই সমর্থনে চিত্র ৭.১ এ এর রপ্তানি, আমদানি ও সামগ্রিক পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যে উর্ধ্বমুখিতা প্রদর্শিত হয়েছে।

তবে ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাণিজ্যিক উদারতার অগ্রগতি মন্থর হয়ে আসে, ফলে দক্ষিণ এশিয়া ও উত্থানশীল এশীয় দেশগুলি গড় বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাতের দিক থেকে বাংলাদেশকে বেশ পেছনে ফেলে, তবে তা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের কাছাকাছি থাকে (সারণি ৭.১)। পূর্ব এশীয় দেশগুলির জন্য বৃহত্তর বাণিজ্যিক একীকরণ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ কর্মসংস্থানের দিক থেকেও সুফল বয়ে আনে। ভবিষ্যতের কৌশল হিসেবে বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততা অনুরূপ মাত্রায় পৌঁছাতে পারলে তা বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো উন্নত করবে।

চিত্র ৭.১: জিডিপি'তে বাণিজ্যের উর্ধ্বমুখী অংশ

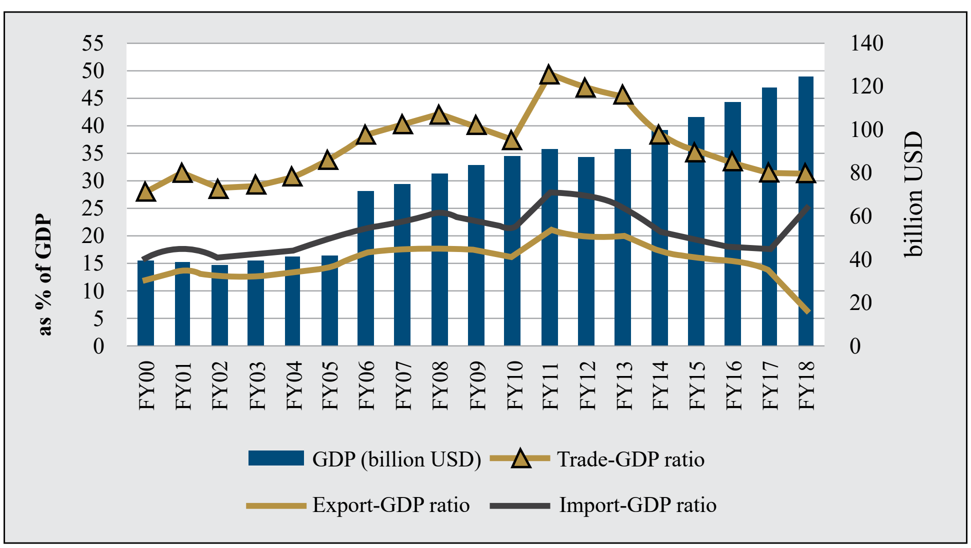

উৎস :ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস।

সারণি ৭.১: বাংলাদেশ: এশিয়ায় বাণিজ্যিক উদারতা ২০১৬ (বাণিজ্য-জিডিপির অনুপাত)

	রপ্তানি	আমাদানি	মোট
বাংলাদেশ*	১৪.১	১৭.৬	৩১.৭
দক্ষিণ এশিয়া	১১.৫	১৬.৯	২৮.৪
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৪.৭	৪২.২	৮৬.৯
উত্থানশীল এশিয়া**	২০.২	১৭.১	৩৭.৩
নিম্ন-আয়ের দেশসমূহ	১২.৭	২৭.৮	৪০.৫

উৎস: ডব্লিউটিও, বিশ্বব্যাংকের ডব্লিউডিআই ডেটাবেজ,

** বাংলাদেশ সংক্রান্ত উপাত্ত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের*

*** এই জোটের অন্তর্ভুক্ত চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম*

এই বিকাশমান বাণিজ্যিক ধরনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনীতির প্রধান খাত হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্প এবং তৈরিকৃত বস্ত্র রপ্তানির উত্থান। ২০১৫ এর মধ্যে, চীনের পরেই বাংলাদেশ বিশ্বে তৈরি পোশাক শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক একক দেশ হয়ে ওঠে। তবে প্রকৃত অবস্থা এই যে, তৈরি পোশাক শিল্প-বহির্ভূত রপ্তানির চেয়ে তৈরি পোশাক শিল্প -রপ্তানি গড় বার্ষিক হারে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে (চিত্র ৭.২)। ফলে রপ্তানি-ঝুড়িতে তৈরি পোশাক শিল্পের অংশ উর্ধ্বমুখী হওয়ায় রপ্তানিতে এর আরো ঘনীভবন ঘটছে। এটিকে অবশ্যই বিপরীতমুখী করতে হবে। রপ্তানি বহুমুখীকরণের সমস্যা সমাধান করতে হবে, কেননা (ক) একক রপ্তানি পণ্যে অতি-নির্ভরতা অর্থনীতির বৈদেশিক অভিঘাত সহিষ্ণুতা দুর্বল করে তোলে এবং (খ) একটি বৈচিত্র্যময় রপ্তানি পণ্যের সমাহার হলো স্থিতিশীল রপ্তানি রাজস্ব ও এর প্রবৃদ্ধির অপরিহার্য শর্ত।

চিত্র ৭.২: তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়

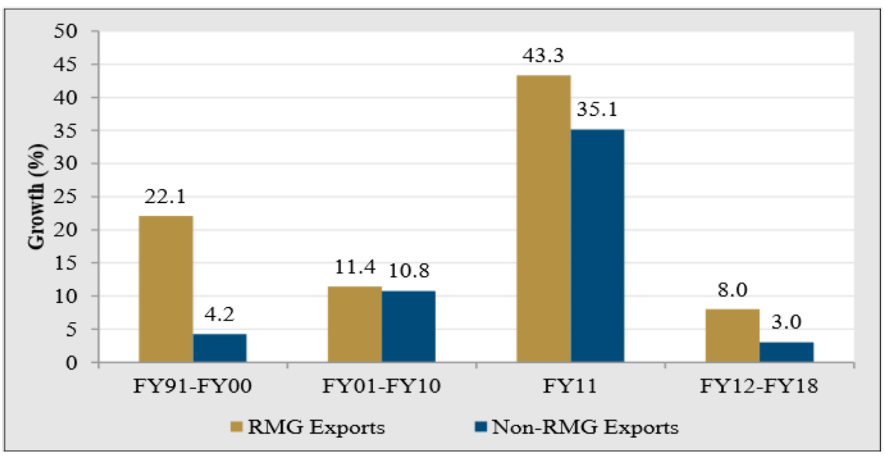

উৎস: ইপিবি, ২০১৯

এ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির রেকর্ড সত্ত্বেও বাংলাদেশের জন্য এর রপ্তানি ভিত্তি ও রপ্তানি বাজার বেশ খানিকটা সংকীর্ণ হয়ে আছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। পণ্য বা বাজার উভয় দিক হতে বৈচিত্র্যহীন রপ্তানি উন্নত বৈচিত্র্যযুক্ত রপ্তানির তুলনায় নানা ধরনের অভিঘাতে সহজেই অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের জন্য তাই প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোর বহুমুখীকরণ। রপ্তানি ভিত্তির প্রসার ঘটিয়ে বহুমুখিতা স্থিতিশীল করা যায়, রপ্তানি রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়, মূল্য সংযোজনও বাড়ানো যায় এবং এভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বেগবান করা সম্ভব। অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকাশনা থেকেও জানা যায় যে, বর্ধিত বহুমুখীকরণের মাধ্যমে যে দেশগুলো রপ্তানিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পন্ন করেছে, সেগুলোতে দ্রুত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হয়। নিম্নে বাণিজ্য ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার, দক্ষতার ক্ষেত্রে যে-অপরিমেয় ঘাটতি রয়েছে তৈরি পোশাকের সাফল্যই তা আমাদের সামনে তুলে ধরে। তৈরি পোশাকের বাজার উন্নীতকরণ এবং তৈরি পোশাক-বর্হিভূত রপ্তানি (অর্থাৎ বহুমুখীকরণ) সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো সামগ্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ব্যাপক দক্ষতা ঘাটতির সাথে অত্যন্ত জটিলভাবে সম্পৃক্ত। অপর্যাপ্ত বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ, যা সাথে নিয়ে আসে উন্নত ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও পুঁজি, যা আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টায় আরেকটি বড় ধরনের সংযোগ-ঘাটতি [৬]।

৬ ভিয়েতনামের রপ্তানি সাফল্যের পেছনে চালিকাশক্তি বৈদেশিক বিনিয়োগ, ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানির ৬০% এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

বাণিজ্য ব্যবস্থা ও রপ্তানি: আন্তর্জাতিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, রপ্তানি সাফল্য ও এর উপজাত হিসেবে রপ্তানি বহুমুখীকরণে অগ্রগতি বহুলাংশে বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থারই ফলাফল যা রপ্তানি উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্য নীতিকে আবার প্রণোদনা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়, যা দেশজ বাজারে বিক্রয়ের জন্য রপ্তানি বনাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। একটি রপ্তানিমুখী উন্নয়ন নীতির চাবিকাঠি নিহিত এমন একটি বাণিজ্য ব্যবস্থায় যেখানে আমদানি বিকল্প উৎপাদনের চেয়ে রপ্তানি অধিকতর আনুকূল্য পেয়ে থাকে। যেখানে সুরক্ষা নীতি আমদানি বিকল্প উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি[৭] দেয়। রপ্তানি সেখানে নিরুৎসাহিত। বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে রপ্তানির দিকে একটু ঝুঁকতে হবে এবং এখানে এখনো অনেক কিছু করার রয়েছে।

বিগত দুই দশক ব্যাপী বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা এই প্রস্তাবনাকেই সমর্থন করে যে, রপ্তানি অর্জনের ওপর বাণিজ্যিক উদারতা সবসময়েই ইতিবাচক প্রভাব রাখে। তবে তৈরি পোশাক রপ্তানির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মুখে থমকে আছে রপ্তানি বহুমুখীকরণ। এ এমন এক পরিস্থিতি যা রপ্তানি ঘনীভবনকে তীব্রতর করেছে। যেমন, বাণিজ্য নীতির অতিরিক্ত আরো একগুচ্ছ উপাদান আছে যেগুলো রপ্তানি সাফল্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে অনেক বিশেষ উপাদান ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, যা অন্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যায় এই বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা তাদের গুরুত্ব তুলে ধরে। যে মূল উপাদান ও নীতিমালা তৈরি পোশাকের রপ্তানির গতিশীলতা ব্যাখ্যা করে সেগুলো নিম্নরূপ:

- *মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট (এমএফএ):* এমএফএ ১৯৭৪-২০০৫ সময়কালের হঠাৎ উন্নয়নে এটি একটি বহিঃস্থ তবে প্রাথমিক চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। কোটা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের মুখোমুখী হয়ে কোরীয় ফার্ম ডাইয়ু বাংলাদেশে পোশাক উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের দেশ গার্মেন্টেস এর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে এবং এজন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে অব্যবহৃত বাংলাদেশের কোটা ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় বাজারগুলোতে উন্নত বাজার সুবিধা প্রাপ্তির জন্য একটি বিপুল গতিসঞ্চারী শিল্পের বীজ বপন করা হয়। অচিরেই দলে দলে উদ্যোক্তাবৃন্দ এই লাভজনক উদ্যোগে যোগ দিতে শুরু করেন।
- *বন্ডেড ওয়্যারহাউস সিস্টেম:* সদ্যোজাত বস্ত্রশিল্পের সমর্থনে বিশ্ব-মূল্য-মানের উপকরণ সুবিধা দিতে বাংলাদেশ সরকার বন্ডেড ওয়্যার হাউস সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের জন্য শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা অনুমোদন করে। এটি আরএমজি খাতে একটি শুল্কমুক্ত পরিবেশ তৈরি করে যদিও অর্থনীতির বাকি অংশকে বিপুল পরিমাণ শুল্ক ও অ-শুল্ক বিধিনিষেধের মোকাবেলা করতে হয়। তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি উদ্দীপনের জন্য তৈরি পোশাক খাতে এই মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- ব*্যাক-টু-ব্যাক লাইন অব ক্রেডিট (এলসি):* ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ব্যবস্থা থাকায় তৈরি পোশাক খাতের পক্ষে এর উৎপাদন ব্যয় কম রাখা সম্ভবপর হয়, কেননা এই ব্যবস্থার আওতায় রপ্তানি আদেশের বিপরীতে উপকরণ আমদানির কাজ সম্পন্ন হয়। এতে করে এই শিল্পে চলমান মূলধনী ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাশ্রয় করা যায় ।
- *সস্তা শ্রম:* বাংলাদেশ একটি শ্রম উদ্বৃত্ত দেশ হওয়ায় তৈরি পোশাকে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই বিপুল উদ্বৃত্ত শ্রমসুবিধা ব্যবহার সম্ভব হয়। বিশেষ করে, তৈরি পোশাক খাত নারীশ্রমের ওপর নির্ভর করেছে বেশি, কেননা এর অংশগ্রহণ হার কম, আবার মজুরি চাহিদাও কম। তদুপরি এই শ্রম অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সুশৃংখল। অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন, ভারত, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনামের তুলনায় এই ব্যয়সাশ্রয়ী শ্রমসুবিধা প্রাপ্তির পাশাপাশি অন্যান্য দেশগুলোতে, বিশেষ করে চীনে শ্রম মজুরি বেড়ে যাওয়ায় তৈরি পোশাক খাত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আরএমজি রপ্তানি উৎপাদনে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে এক অতি আকর্ষণীয় গন্তব্য।
- *শ্রমিক প্রশিক্ষণ:* তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম প্রশিক্ষণ, যা সহজেই অভ্যন্তরীণভাবে বা কাজের ফাঁকে ব্যবস্থা করা যায়।
- *প্রযুক্তি:* প্রাথমিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ঘটে যখন কোরীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা সুবিধা গ্রহণের জন্য আসে, সাথে নিয়ে আসে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও বাণিজ্য পরিচালনার কলাকৌশল। তবে প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে সহজ হওয়ায় দক্ষ ব্যবস্থাপক ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ক্রয়ের মাধ্যমে তা দ্রুততার সাথে অভিযোজিত ও হস্তান্তররিত হয় অন্যান্য (স্থানীয়) বিনিয়োগকারীদের মাঝে।
- *অবকাঠামো:* এখানে নীতি অগ্রগতি সীমিত, বিদ্যুৎ ও পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই। বিদ্যুতের দিক থেকে তৈরি পোশাক উৎপাদকগণ বিদ্যুৎ-রেশনিং ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বাস্তবতার সাথে মানিয়ে চলতে ব্যাক-আপ জেনারেটর ব্যবহার

৭ সুরক্ষামূলক শুল্ক আমদানি বিকল্প উৎপাদনে ভর্তুকির সমান।

করছেন। তবে তৈরি পোশাকের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি।

- *কর প্রণোদনা:* তৈরি পোশাক থেকে আয়ের ওপর কর নির্ধারণে সরকার অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এবং তৈরি পোশাক হতে আয়ের ওপর অতি নিম্নমাত্রার কর হার আদায় করা হয়।

তৈরি-পোশাকের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে রপ্তানি বহুমুখীকরণের একটি কৌশল গ্রহণ করা দরকার। সকল দিক বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, বাংলাদেশ স্বল্প মজুরি শ্রমে বিশ্বে যে নেতৃত্ব দেয়, তার বড় অংশই অদক্ষ বা অর্ধ-দক্ষ। সার কথা এই যে, নিম্ন উৎপাদনশীলতার জন্য কার্যকর ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয় স্বল্প মজুরি দিয়ে। ফলে সর্বশেষ বিশ্লেষণে, বাংলাদেশ হতে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে ওঠে ব্যয়-প্রতিযোগী।

এই প্রতিযোগিতা-সুবিধা অন্যান্য পণ্য বিশেষভাবে অধিকাংশ শ্রমঘন পণ্যের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। এ কারণেই জুতা শিল্প উদীয়মান পণ্যসমূহের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ২০০০ এর প্রথম ভাগের তুলনায় বেশ কিছু পণ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা ভোগ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভোজ্য ফলমূল, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ ফ্যাট ও তৈল, নানা ধরনের খাদ্যশস্য, ময়দা, শ্বেতসার বা দুগ্ধ ও পেস্ট্রি, রন্ধনকৃত পণ্য, নানা ধরনের সবজি, ফলমূল, বাদাম, খাদ্যশিল্প হতে বর্জ্য, রবার, রবারজাত পণ্য, তামা ও তামাজাত পণ্য, এবং আসবাবপত্র।

অন্তত্পক্ষে মধ্যমেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও তৈরি পোশাক-বহির্ভূত পণ্যের রপ্তানিতে প্রতিযোগ-দক্ষতার উৎস হিসেবে স্বস্তা শ্রমের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। তবে নীতি-প্রণেতা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অব্যাহত প্রতিযোগিতাজনিত সুবিধা নিশ্চিত করতে আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাজারে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সংঘটিত হতে যাচ্ছে, সেগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা (এবং গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকা) হবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে শ্রমঘন উৎপাদনে লেগে থাকা হবে একটি কৌশলগত ভুল। বিশ্ব ম্যানুফ্যাকচারিং-এ বর্তমানে যে-ধরনের দ্রুতগতিতে পরিবর্তন ঘটছে (এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রক্ষেপণেও), বাংলাদেশ তার রপ্তানিতে বর্তমান উপকরণ-ঘনত্বে শ্রমনিবিড় লেগে থাকার মতো অবস্থায় থাকবে না। অনুমান করা যেতে পারে কমপক্ষে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে কোরিয়া, তাইওয়ান ও মালয়েশিয়ার মতো প্রযুক্তিঘন রপ্তানির দিকে যেতে হবে। তাই ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গুলোর উপযুক্ত দক্ষতা ও উপকরণ সরবরাহ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের কাজ এখনই শুরু করা দরকার।

৭.২.২ রপ্তানি বহুমুখীকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

তৈরি পোশাক-বহির্ভূত পণ্যসম্ভারে বোঝাই বহুমুখী রপ্তানি ঝুড়ি সহ একটি উন্নতমাত্রার রপ্তানি পরিকৃতি অর্জনের অন্বেষায় বাংলাদেশ সাফল্য বিবেচনা করতে হবে। সামগ্রিক অর্থনীতি বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্য যদিও অনির্দিষ্ট ধরনের, তবুও কিছু উপাদান রপ্তানি খাতের জন্য নির্দিষ্ট। আবার এর কিছু রপ্তানি বহুমুখীকরণের সাথে সম্পৃক্ত।

১. বাণিজ্যিক অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা

বাণিজ্যিক অবকাঠামোর আওতায় প্রতিবন্ধকতাগুলোর মাঝে রয়েছে সেই ধরনের উপাদানসমষ্টি যা ব্যয়ের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, যেমন প্রযুক্তি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা, বাণিজ্যের জন্য কার্যকর পরিবেশ, বাণিজ্যিক উপকরণ সরবরাহের অবস্থা, ব্যবসায় পরিচালনার সহজতা, অর্থায়নে অভিগম্যতা, দক্ষতার প্রাপ্তব্যতা। এগুলোর অধিকাংশই সরবরাহ-সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা। ব্যতিক্রম শুধু শুল্ক প্রশাসন ও বন্দরের দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা।

- *প্রযুক্তি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা:* এটি এমন একটি উপাদান যার প্রভাব ব্যয়ের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার ওপর আজো রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে। সাধারণভাবে প্রযুক্তির দিক থেকে বাংলাদেশ এখনো দুর্বল এবং এর শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতাও কম। এই দুটি ক্ষেত্র যেখানে বাংলাদেশের প্রচুর করণীয় রয়েছে দীর্ঘমেয়াদের জন্য তার রপ্তানির প্রতিযোগ-দক্ষতার উন্নতি সাধনের জন্য। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলাদেশ মূল্যবান শিক্ষা নিতে পারে। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পণ্যশ্রেণীর ব্যাপক বিন্যাসের জন্য প্রযুক্তি ও শ্রম উভয়ের উৎপাদনশীলতার দিক থেকে বাংলাদেশ তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদর (চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা) চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের পক্ষে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশসহ তার বাজারের

অংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প উদ্ভবের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের দেশ গার্মেন্টস ও কোরিয়ার ডাইয়ু'র মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর হয়। পরবর্তীতে, এই প্রযুক্তি তৈরি পোশাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অন্যান্য যৌথ উদ্যোগের সহায়তা নিয়ে জুতা ও চামড়া শিল্প, খেলনা, ইলেকট্রনিক্স-এর মতো রপ্তানি খাতগুলোতেও অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। দূর-ভবিষ্যতের জন্য একটি রূপকল্পের সাথে প্রযুক্তি গ্রহণ ও এর উন্নয়নের সমস্যা অত্যন্ত বাস্তব। ম্যানুফ্যাকচারিং-এ প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থা এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ও তৎপরবর্তী অবস্থার বিপরীতে আসন্ন রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ দুর্গম পথ।

- *বাণিজ্যের জন্য কার্যকর পরিবেশ* সক্ষমতার একটি মূল নির্ধারক। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন দেশে এখন এই দিকটিতে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। বৈশ্বিকভাবে এই কার্যকর পরিবেশের কয়েকটি নির্দেশক তৈরি করা হয়, যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অগ্রগতি নিরূপণের জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় শুল্কায়ন পদ্ধতির অদক্ষতা ও পরিবহন সেবা সংশ্লিষ্ট উচ্চব্যয়ের কারণে রপ্তানির প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য এই অবস্থা পাল্টানোই হবে অন্যতম কৌশল।

- *অবকাঠামোগত ঘাটতি:* অবকাঠামোগত মানের দিক হতে এশিয়ার অন্যান্য সমগোত্রীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই দেশগুলোকে প্রতিযোগ-সক্ষম করার জন্য মানসম্মত অবকাঠামো সুবিধার উপস্থিতি একটি মূল উপকরণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে জ্বালানি সংকট তেমন একটা বড় সমস্যা না হলেও পরিবহন অবকাঠামো এখনো একটি সমস্যা। দেশের স্থল ও সমুদ্র বন্দরগুলোর অব্যবস্থাপনা রপ্তানিকারকদের জন্য এখনো বাধা। সমস্থানীয় অন্যান্য দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশকে এক কাতারে উঠিয়ে আনার জন্য পরবর্তী দুই দশকে অবকাঠামোতে (প্রাক্কলিত ১০ বিলিয়ন ডলার বছরে) বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে।

- *বন্দর সেবা:* চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রায় ৮৫ শতাংশ সামলানোর কাজ করলেও তা শ্রমিক সমস্যা, দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও যন্ত্রপাতির অভাবে জর্জরিত। এর কন্টেইনার টার্মিনালের সক্ষমতা দিনে বার্থপ্রতি মাত্র ১০০-১০৫ লিফ্‌ট, যা আঙ্কটাড নির্ধারিত উৎপাদনশীলতা মানের দিন প্রতি ২৩০ লিফ্‌টের অনেক নিচে। জাহাজ ঘোরানোর সময় ৫-৯ দিন যা অনেক দক্ষ বন্দরের ১-দিন মানেরও অনেক বেশি। বন্দরের আধুনিকায়ন, পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন এবং একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডাভুক্ত হওয়া দরকার। ভবিষ্যতের জন্য আঞ্চলিক বন্দরগুলোর অধিকতর উন্নয়ন হবে লাভজনক বিকল্প।

- *সড়ক নেটওয়ার্কঃ* দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলগুলোতে উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হলো দুর্বল সড়ক ব্যবস্থা ও পরিবহন সুবিধার অভাব। প্রয়োজনের তুলনায় সড়ক সংরক্ষণে যে সরকারি ব্যয় হয় তা অনেক কম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য প্রধান পরিবহন করিডর গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঢাকা-চট্টগ্রাম সংযোগকারী মহাসড়ক। এই সড়কটিকে ৮ লেন বিশিষ্ট একটি মহাসড়কে উন্নীত করে আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা দরকার।

- *রেলপথ ব্যবস্থা:* ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে কন্টেইনারবাহী ট্রেন চলাচল আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয় শ্রেণীর জন্য যথেষ্ট সুবিধা দান করে থাকে। অবশ্য চট্টগ্রাম ও কমলাপুরে রোলিং স্টকের প্রাপ্তব্যতা সহ ইয়ার্ড-লেআউট ও অপারেশনে বেশ কিছু পরিচালনা সংশ্লিষ্ট সমস্যা রয়েছে। এগুলো ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতোখানি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো পর্যাপ্ত ট্রেন চলাচলের পৌনঃপুনিকতায় অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ট্রেন চলাচলে ব্যর্থতা। সুতরাং, দ্রুতগামী ট্রেন নেটওয়ার্ক স্থাপন ও এর আধুনিকায়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

- *বিমানে পণ্য পরিবহন ও বিমানবন্দরে মালামাল সংরক্ষণ সেবা:* বিমানে মাল পরিবহন সেবার অনির্ভরযোগ্যতা ও অপ্রাপ্যতা বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে উৎপাদকদের সক্ষমতায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, অথচ পণ্যের উচ্চ মান ও নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করতে উভয় পক্ষের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এটি ছিল সবচেয়ে জরুরি। নিয়মিত কার্গো বিমানে চলাচলের জন্য একটি মুক্ত আকাশ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিমানের অপর্যাপ্ত এয়ার কার্গো সক্ষমতার ফলে স্বল্প গড় কোটা আয়তনসহ একটি কোটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা আকাশপথে রপ্তানির বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

- ***ব্যবসায় পরিচালনার সহজতা:*** ব্যাপক পরিসরে রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতার আরেকটি নির্দেশক হলো একটি দেশে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবসায় পরিচালনার লেনদেন ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে এবং রপ্তানিরও ক্ষতিসাধন করতে পারে। উচ্চ প্রতিযোগিতামুখী বৈশ্বিক বাজারে ব্যবসায়ের সুযোগ ও অঙ্গীকারের প্রতি যথাসময়ে যথাদ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান নির্ধারক, যা বিশ্বের রপ্তানি বাজারে চাহিদা মেটাতে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ সক্ষমতার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবহন অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট ঘাটতি অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।
- ***শ্রমের নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা ব্যবধানের মোকাবেলা:*** শ্রমের দিক থেকে বাংলাদেশ অপর্যাপ্ত ও কম দক্ষতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিপুল শ্রম সরবরাহের কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই দক্ষতা ঘাটতির ব্যাপ্তি অনেক ক্ষতি করে, যা ব্যবস্থাপনা ও কর্মী পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের কার্যকর কর্মসূচির মাধ্যমে সমাধান করা জরুরি। শ্রম বাজারের নমনীয়তা স্বল্প ব্যয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও একত্রীকরণে তৈরি পোশাক খাতকে সহায়তা করে। বাংলাদেশে কর্মরত বহুসংখ্যক বিদেশি কর্মীর উপস্থিতি তদারকি ও মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ক্ষেত্রে ঘাটতি বোঝা যায়। সাধারণত মধ্যম-পর্যায় ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে ভাড়া করে আনা হয়, যা আধা-দক্ষ ও উচ্চ-দক্ষ কর্মীদের অভাব নির্দেশ করে। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া সহ অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে উদ্যোগ-ভিত্তিক কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ঘটনা অত্যন্ত কম। তৈরি পোশাক খাতে অভ্যন্তরীণভাবে আয়োজিত প্রশিক্ষণের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে আরো ব্যাপক পরিসরে এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তবে এই লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করতে হবে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে। যার অভীষ্ট লক্ষ্য হবে, শুধুমাত্র দক্ষতার উৎকর্ষ বিধান নয়, বরং ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে বহুমুখী দক্ষতা অর্জন। টিভেট-প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে একটি কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভিয়েতনাম বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। মালয়েশিয়াকে একটি উচ্চ-আয় জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য সেখানে শিক্ষা ও মানব সম্পদ প্রশিক্ষণে, বিশেষ করে পেশাগত ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, মালয়েশিয়ায় গড়ে উঠেছে এমন এক দক্ষতা-সম্ভার যা দ্রুতগামী ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি খাতের চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দক্ষতা ঘাটতি এককভাবে শুধু বেসরকারি খাতেই সীমিত নয়। সামনে ২০২৪ এ এলডিসি অবস্থান থেকে উত্তরণের সাথে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে উচ্চতর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সৃষ্ট দক্ষতা ব্যবধান সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি সামলানো বা মানিয়ে চলতে রীতিমত হিমশিম খেতে হবে। মেনে নিতে হবে যে, বাণিজ্য নীতি ও বাণিজ্যিক মধ্যস্থতা সম্পৃক্ত কৌশল গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতায় বেশ ঘাটতি আছে। বিশ্বব্যাপী উত্থানশীল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও বাণিজ্যিক রক্ষণশীলতার প্রেক্ষাপটে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা (যেমন ডব্লিউটিও) হুমকির মুখে পড়েছে এবং ডব্লিউটিও'র সহায়তায় বাণিজ্যিক বিস্তারকে ঘিরে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের জন্য তার আসন্ন এলডিসি-উত্তরণ থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলির কিছু অংশ সমাধানের উপায় হিসেবে দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিকভাবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যে দক্ষতা ঘাটতি আছে তা অবশ্যই নিরসন করতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্য সম্ভাবনা নির্ধারণ, বাণিজ্যিক উপাত্তের বিশ্লেষণ, ডব্লিউটিও চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক প্রিফারেন্সিয়াল প্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তির লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ, বাণিজ্য সুরক্ষার ব্যয়, রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতা নিশ্চিত করার অনুকূলে নীতিমালা এবং বহুমুখীকরণ বিকাশসহ অনুরূপ বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সক্ষমতার জরুরি ক্ষেত্রগুলোর জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হবে। বাণিজ্যিক মধ্যস্থতা কাজে জড়িত অপরাপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা থেকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণগত উপকরণ যেমন অন্য দেশগুলোর বাণিজ্য নীতি ও বাণিজ্যিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ডব্লিউটিও চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, এবং বাণিজ্যিক মধ্যস্থতার কর্মকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ। এজন্য প্রয়োজন উপরিবর্ণিত জরুরি অগ্রাধিকারসমূহের অংশ বিশেষ সংশ্লিষ্ট গবেষণা/কারিগরি সমীক্ষা কর্মসূচির জন্য সহায়তাদানসহ তাৎক্ষণিকভাবে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ। এছাড়াও, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও তৎপরবর্তী কালের বাংলাদেশে, মধ্যমেয়াদ থেকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য সার্বিক উন্নয়ন কৌশলে বাণিজ্য ও বাণিজ্য নীতিমালাকে মূলধারায় প্রতিস্থাপনের গুরুত্বকে যথাযথভাবে অনুধাবন ও তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২. বাণিজ্য নীতি ও প্রণোদনা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি

একটি উন্নততর রপ্তানি অভীষ্ট অর্জনের জন্য রপ্তানিমুখী বাণিজ্য নীতির গুরুত্ব যে কতো বেশি তা পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলোর সাফল্যজনক অর্জনের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয়ে আসে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে বাণিজ্য নীতি বাধা তৈরি বা সমর্থন দান করতে পারে। তবে এটি রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা নিশ্চিত করতে তা কীভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় তার ওপর নির্ভর করে। রপ্তানি প্রণোদনাসহ এটি রপ্তানি বনাম দেশজ উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার সাথে সম্পৃক্ত। এই নীতিমালা তিনটি প্রধান উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য নীতি এবং আর্থিক প্রণোদনা।

- *বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা* বিনিময় হারের দুর্বল ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বৈদেশিক মুদ্রার লক্ষণীয় অতিমূল্যায়ন (বা উপচয়) পরিহার করা সবচেয়ে বলিষ্ঠ করণীয়গুলোর অন্যতম, যা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত হতে পারে এবং বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানগত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার ঘটতি, অনুপার্জিত আয় ও দুর্নীতি, চলতি হিসাবে বিপুল ঘাটতি, লেনদেনের ভারসাম্য সংকট, সামষ্টিক অর্থনৈতিক চক্রের উঠা-নামা এগুলোর সাথে অতিমূল্যায়িত মুদ্রা জড়িত, যার সবগুলোই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষতিসাধন করছে। অতিমূল্যায়ন যেমন রপ্তানি ও প্রবৃদ্ধির ক্ষতি করে, ঠিক তেমনি অবমূল্যায়ন (অবচয়) একে সহজসাধ্য করে। অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই দ্রুত প্রবৃদ্ধির মেয়াদের সাথে অবমূল্যায়ন জড়িয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে চীনের প্রসঙ্গ টানা যায়, যেখানে অবমূল্যায়নের সূচকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭০ এর দশক থেকে চীনে মাথাপিছু মোট দেশজ আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি সংঘটনের সাথে প্রায় সমান্তরালভাবে অবমূল্যায়ন সূচকেও বৃদ্ধি ঘটে।

বাংলাদেশে ২০০৩ এর মে মাস হতে বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদে দূরদর্শী মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করায় বাংলাদেশ অধিকাংশ সময়ের জন্যই এর প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের উপচয় এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। রপ্তানি সমপ্রসারণের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে সঠিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা হবে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারের প্রকৃত উপচয় বা অনমনীয়তা পরিহার করা; রপ্তানির, বিশেষ করে তৈরি পোশাক -বহির্ভূত রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা ধরে রাখতে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারে পরিমিত অবচয় ভালো কাজ করবে। চিত্র ৭.৩ এ দেখানো হয়েছে, ২০১২ অর্থবছর থেকে "রিয়ার" (আরইইআর) উপচয়ের সহযোগী হিসেবে রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা কমে যাওয়ায় এই নীতির বিচ্যুতি ঘটে। এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাল্টানো দরকার। কেননা, এর ফলে ২০১২-১৮ মেয়াদে রপ্তানি পরিকৃতি নানা সমস্যায় আকীর্ণ হয়।

চিত্র ৭.৩: বিনিময় হারে গতিময়তা ২০১১-২০১৯ অর্থবছর

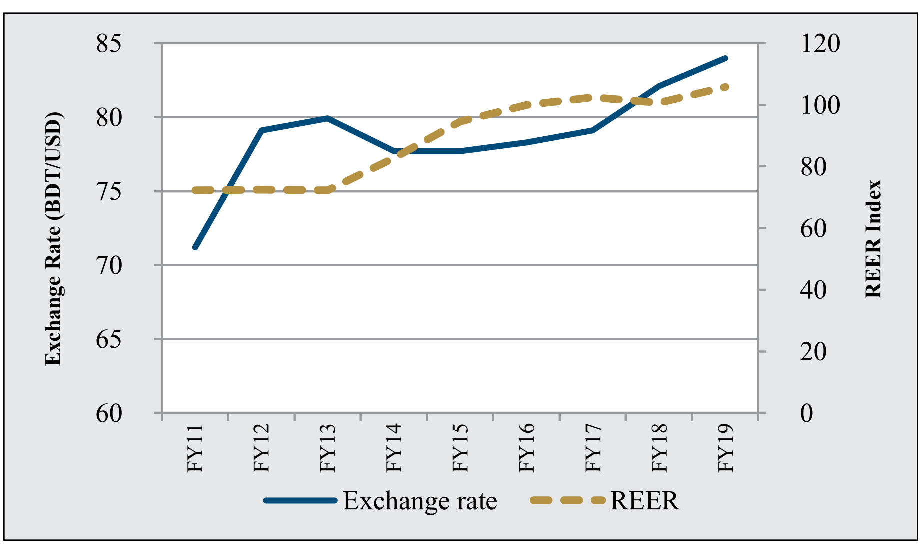

উৎসঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক
নোটঃ প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচকে উর্ধ্বগতি উপচয় নির্দেশ করে

- *বাণিজ্য নীতির অবস্থান:* বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা যদিও বাণিজ্য নীতির অপরিহার্য অংশ, এমন আরো অনেক ব্যবস্থা আছে যা রপ্তানি প্রণোদনায় প্রভাব ফেলে, যেমন শুল্কায়ন, আমদানির ওপর পরিমাণগত বিধিনিষেধ, ভর্তুকি ও অনুরূপ অন্যান্য। রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতার এককভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক সম্ভবত বাণিজ্য নীতি হতে উদ্ভূত প্রণোদনা ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও এই ধারণার সমর্থন দেয় যে, একটি উচ্চ-শুল্ক ব্যবস্থার চিহ্নিত খাতগুলোতে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানিতে কখনো সাফল্য আসতে পারে না। তবে বিদ্যমান ও সম্ভাবনাযুক্ত রপ্তানির অনুকূলে তৈরি পোশাকের মতো মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দানের মাধ্যমে এ ধরনের সাফল্য পাওয়া সম্ভব। এটিই হলো বড় নীতি চ্যালেঞ্জ। বহুমুখীকরণ বিস্তারের কোন সহজ উপায় না থাকলেও নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য তৈরি ও সেগুলি টিকিয়ে রাখতে বেশ কিছু সুবিন্যস্ত নীতিমালার প্রয়োজন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, একটি দেশের প্রেক্ষাপটে বহুমুখীকরণের সমস্যায় একক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তবে কিছু পণ্যসামগ্রী সবসময়ই সনাক্ত করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, উদাহরণ হিসেবে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে কিছু সুসংবদ্ধ পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে, যেমন

  - প্রথমত, রপ্তানির জন্য প্রয়োজন আমদানি। সুতরাং আমদানি ব্যবস্থাকে হতে হবে একেবারে নিটোল যাতে রপ্তানির জন্য শুল্কমুক্ত আমদানিকৃত উপকরণ সুবিধা সহজেই পাওয়া যায়। কোন শুল্কমুক্ত রপ্তানিকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা-সক্ষম করতে হলে অবশ্যই বিশ্ব-মূল্যমানের উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। শুল্কমুক্ত সুবিধা পেলে আমদানিকৃত পণ্য বিশ্ববাজার মূল্যেই কেনা সম্ভব হয়।
  - দ্বিতীয়ত, রপ্তানির জন্য প্রণোদনা কাঠামোতে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে (অর্থাৎ এর রপ্তানিবিরোধী পক্ষপাতিত্বের অপসারণ) এবং এজন্য রপ্তানি এবং আমদানি বিকল্প উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রণোদনা যাতে প্রায় একই ধরনের হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
  - তৃতীয়ত, রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সেবার (উন্নত বাণিজ্য ও পরিবহন উপকরণ সুবিধাদি এবং জ্বালানি অবকাঠামো) ব্যয়ভার কমাতে হবে।
  - চতুর্থত, অগ্রতৎপরতা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, যেমন বর্তমান পণ্যের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন, বিশ্বের নতুন বাজারে প্রবেশ, বিদেশে নতুন ধরনের ব্যবসায় সংহত করা এসবের অনুকূলে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান, যা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বড় ধরনের ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্ববাহী হতে পারে।

পণ্য বহুমুখীকরণের অগ্রগতিতে কিছুটা ভাটা পড়লেও, ভৌগোলিক বহুমুখীকরণে কিন্তু বাংলাদেশ বেশ ভালো এগিয়েছে। গত দশকে শীর্ষ ৫টি গন্তব্যে রপ্তানির অংশে উল্লেখ্যযোগ্য পুন হলেও এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের রপ্তানি সম্ভার ২০১৮ অর্থবছরে ১২২টি দেশে পৌঁছানো হয়, যা ১৯৯০ অর্থবছরে ছিল মাত্র ৬১টি দেশ। ভৌগোলিক বহুমুখীকরণের কৌশল থেকে আশা করা যায় ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের উদীয়মান বাজার অথনীতিতে আমাদের বাজার সম্প্রসারণ থেকে ভালো মুনাফা পাওয়া যাবে। একইভাবে, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল শুধু উৎপাদনশীলতাই বৃদ্ধি করবে না, সেই সাথে তৈরি পোশাকের মতো বর্তমান পণ্যসম্ভারের রপ্তানিতে উচ্চতর মূল্যসংযোজন প্রবর্তন করে তা মানগত বহুমুখীকরণও নিশ্চিত করবে।

- *রাজস্ব প্রণোদনা* রপ্তানি বিস্তৃতির জন্য ব্যাপৃত অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতোই রপ্তানির বিকাশে সরকার একটি ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ছাড়ের দিক থেকে তৈরি পোশাক খাত সর্বোচ্চ উপকারভোগী সকল রপ্তানিকারক 'ডিউটি ড্রব্যাক স্কিমের সুবিধা পেয়ে থাকে। এই সুবিধা ছাড়াও তৈরি পোশাক খাত তার আয়ের বিপরীতে নাম মাত্র আয়কর পরিশোধের বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। এছাড়া সরকার, বার্ষিক ভিত্তিতে ঘোষণা অনুযায়ী গতানুগতিকতা-বহির্ভূত পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন হারে সরাসরি নগদে ভর্তুকি প্রদান করে থাকে, যা চলতি বছরে (২০২০ অর্থবছরে) তৈরি পোশাক খাত ১% থেকে হালাল মাংস ও আলুর বেলায় ২০ শতাংশের মধ্যে উন্নীত হয়েছে। রাজস্ব প্রণোদনা সাময়িক হওয়া উচিত নয়। এর ভিত্তি হওয়া উচিত গবেষণার ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত প্রতিযোগিতা সুবিধা সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনার ওপর। রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল রাজস্ব প্রণোদনার বিপরীতে আমদানি বিকল্প খাত যে উচ্চ-শুল্ক সুরক্ষা পেয়ে থাকে, তার কোন তুলনা হয় না।

- *সেবা রপ্তানির ওপর গুরুত্ব প্রদান* প্রবাসী আয় ব্যতীত বাংলাদেশ সেবা খাতে বর্তমানে নেতিবাচক প্রবণতা বিদ্যমান। এটি রপ্তানি বিস্তারের জন্য আরেকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। সঠিক নীতিমালা ও বিনিয়োগসহ বাংলাদেশ শিপিং ও বিমান পরিবহন, বাংলাদেশে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নসহ আইসিটি ও পর্যটনশিল্প থেকে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে পারে। বিশেষ করে পর্যটনের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল, কেননা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রশিক্ষিত জনবলসহ পর্যটন সুবিধাবলির ব্যাপক বিস্তারে কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃজনে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সুতরাং, এই উচ্চ সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধি তৎপরতাকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ জরুরি।

পরিশেষে, রপ্তানি বহুমুখীকরণে উচ্চতর সামর্থ্য সঞ্চারসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বৈশ্বিক মূল্য শৃংখলের সাথে তা একীকরণের জন্য শিল্প নীতিতে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকা জরুরি। যে দেশগুলো তাদের রপ্তানির ঝুড়ি বহুমুখী করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে, তাদের অভিজ্ঞতাও এই পরামর্শ দেয় যে, বৃহত্তর রপ্তানি প্রতিক্রিয়া ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের স্থির লক্ষ্য নিয়ে সার্বিক নীতি সংস্কারের চাবিকাঠি হিসেবে সবার আগে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদাহরণ হলো - আমলাতন্ত্রের মান উন্নয়ন, সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, চুক্তি সংশোধন বা বর্জনের ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে চুক্তির কার্যকরতা নিশ্চিতকরণ ।

৭.২.৩ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও তৎপরবর্তী বাণিজ্য ব্যবস্থা

বিশ্ব অর্থনীতি এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বার প্রান্তে। পরবর্তী ২০ বছরের বাণিজ্য ও শিল্প প্রবৃদ্ধির পরিচালন-পদ্ধতি বিষয়ে সঠিক কৌশল নির্ধারণের জন্য চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কী (চিত্র ৭.৪), বাংলাদেশের জন্য তা কতটুকু অর্থবহ, বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যম আয়ের ও উচ্চ আয়ের দেশ (ইউএমআইসি ও এইচআইসি) হবার প্রতিযোগিতায় এটি কোন ধরনের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে - এ সকল ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

চিত্র ৭.৪: শিল্প বিপ্লবের গতিধারা নিরূপণ

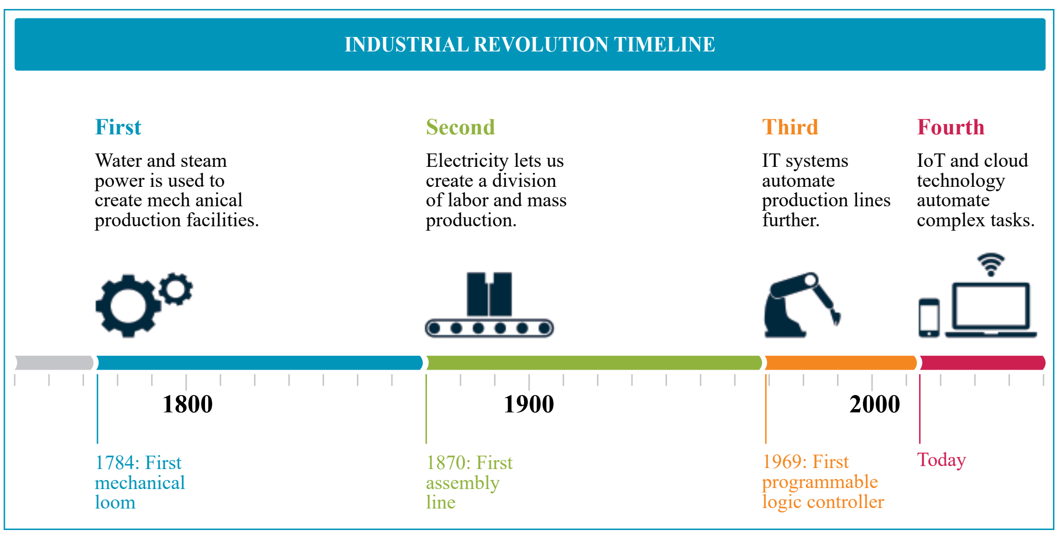

উৎস: এমজোলনার, 'রিয়ালাইজিং দি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন'

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব শেষ হয়েছে বহুদিন আগেই। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব সাথে নিয়ে আসে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। চতুর্থ বিপ্লব আরো বেশি ব্যাপক ও দূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে অধিকতর সপ্রতিভ ও স্বয়ংক্রিয়, যা ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির গতিশীল অন্তর্ভুক্তিতে অবদান রাখে। পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে আরেকটি, অর্থাৎ পঞ্চম শিল্প বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই একবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্য ও শিল্পে পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের সাথে সঙ্গতিশীল ও নমনীয় - এরূপ জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বিষয় এখনই বিবেচনায় নেয়া উচিত।

ওইসিডি অনুযায়ী, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে একগুচ্ছ প্রযুক্তি এক মোহনায় এসে মিলেছে, যার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি (যেমন, থ্রিডি প্রিন্টিং, ইন্টারনেট অব থিংস, উন্নত রোবটিক্স) থেকে নতুন বস্তুপুঞ্জ (যেমন, বায়ো এবং ন্যানো-ভিত্তিক) থেকে নতুন প্রক্রিয়া (যেমন উপাত্ত চালিত উৎপাদন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সিনথেটিক জীববিদ্যা)। অদূর ভবিষ্যতেই এইসব প্রযুক্তি সকল মানুষের হাতের নাগালে চলে আসবে (ওইসিডির মতে, আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যেই)। এই প্রযুক্তিগুলোর যেহেতু পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বিতরণে বিশাল প্রভাব রয়েছে, তাই উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, আয়-বন্টন এবং কল্যাণ ও পরিবেশের জন্য তা সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনবে।

জনপ্রিয় ধারণার বিপরীতে, বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট ফলাফল সাধারণভাবে ইতিবাচক, কেননা উৎপাদনশীলতা বর্ধনকারী প্রযুক্তি কিছু ক্ষেত্রে কর্মহীনতা ঘটায় আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টি করে। তবে কর্ম প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্প ও ব্যবসায়-উদ্যোগের সংখ্যা কর্ম-সংকোচনের অভিজ্ঞতা সংবলিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগে ক্রমান্বয়ে সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও উচ্চ ব্যয়বাধ্যকতার নিরিখে এখনো শ্রমঘন উৎপাদন অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বর্তমান ধারার সাথে তাল মেলাতে আরো কয়েক বছরের প্রয়োজন হবে, যদিও অদূর ভবিষ্যতে প্রযুক্তিঘন উল্লম্ফনশীল উদ্ভাবনও সংঘটিত হবে, তৈরি পোশাক খাতের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন দেখে এমনটাই মনে হয়। যন্ত্রায়ন হিসেবে বর্ণিত এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত সতর্কতা সাথে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কেননা এতে যন্ত্র-চালিত শ্রমের স্থানচ্যুতির ঝুঁকি আছে, যা শ্রম-ব্যয় সুবিধাকে দুর্বল করতে পারে, অথচ বাংলাদেশ এতদিন যাবৎ একান্তভাবেই এই সুযোগের ওপর নির্ভর করে আসছে।

> ***ডিজিটাল বিশ্বের বাণিজ্য ও শিল্প:*** ডিজিটাল প্রযুক্তির বিস্তার সকল ধরনের বৈশ্বিক প্রবাহে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে - পণ্য, সেবা, মুদ্রা, মানুষ সব কিছুতেই - তবে এই রূপান্তর মাত্র তার প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দলে দলে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের ডিজিটাল পণ্যের আন্তঃসীমান্ত তাৎক্ষণিক বিনিময়ে, বই থেকে সঙ্গীত থেকে ডিজাইন ফাইলে যা ভৌত বস্তুর থ্রিডি প্রিন্টিং সম্পন্ন করতে পারে। ইন্টারনেটের বিস্তারসহ দূরত্বের বাধা ও ব্যয় সহায়ক অবকাঠামো যা ছিল একসময় অনতিক্রম্য, ইতোমধ্যেই এর পুন শুরু হয়েছে। ডিজিটাল বাণিজ্য এই সকল বৈশ্বিক প্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যদিও এর পরিমাপ কঠিন। এর জন্ম, বিকাশ ও নতুন রূপ পরিগ্রহের প্রতিটি পর্যায় একই সাথে বিশ্বায়নের ধারাকে এগিয়ে নেয় এবং এতে পরিবর্তন আনে।

ডিজিটাইজেশন প্রান্তিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যয় কমিয়ে আনার পাশাপাশি বৈশ্বিক বাণিজ্যে প্রবেশের পরিসীমা বৃদ্ধি করে। শুধু বড় ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর জন্যই নয়, এটি ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্যও বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ব্যয় হ্রাস করে। ব্যবসায় মডেলের একটি উদ্দীপনা সঞ্চারী উদ্ভাবন হিসেবে এটি ইতিমধ্যেই সমাদৃত হয়েছে এবং তা ক্ষুদ্র-বহুজাতিক উদ্যোগ, ক্ষুদ্র-কর্মকাণ্ড, ক্ষুদ্র-সরবরাহ শৃংখলের মতো এক ঝাঁক উত্থানশীল সম্ভাবনার জন্মদান করেছে, যেগুলো বৈশ্বিক সুবিধাবলিতে সংযুক্ত হবার সক্ষমতা রাখে। ডিজিটাইজেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং এমনকি ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের জন্যও আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ও বিনিময়ে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, ফলে 'ক্ষুদ্র-বহুজাতিক সত্তার' এক নতুন যুগের আবির্ভাব হয়েছে। অনলাইন সুবিধা ব্যবহার করে এমনকি ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলোও এখন ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানিতে অংশ নিতে পারে। ডিজিটাইজেশন উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় শুরু করার নির্দিষ্ট ব্যয়ও কমিয়ে এনেছে, কেননা এখন চূড়ান্ত মুনাফার ভিত্তিতে বহুসংখ্যক উপকরণ ক্রয় সম্ভব। অতীতে ব্যবসার জন্য প্রয়োজন হতো সার্ভার কেনা এবং এগুলোর সিস্টেম প্রায় শূন্য থেকে গড়ে তুলবার জন্য বড় বড় প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য ছিল। উদাহরণ হিসেবে, আজকের দিনে আমাজন ওয়েব সার্ভিস থেকে ইনক্রিমেন্টাল সার্ভার ক্যাপাসিটি ক্রয় করতে পারে এবং অল্প সদস্যের উন্নয়ন টিম দলের সেবা গ্রহণ করে পূর্ব থেকে বিদ্যমান অবস্থানে তা স্থাপন করতে পারে। ব্যবসায়-সহায়ক সেবা, যেমন আইনগত ও হিসাবরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সেবা'আপ-ওয়ার্ক' ও 'ফ্রি-ল্যান্সার' অনলাইনে আউট-সোর্সিংও হতে পারে। এর অর্থ ব্যবসায় এখন অনেক বিনিয়োগেও শুরু করা যায় এবং এর অধিকতর উন্নয়নও এখন অনেক দ্রুত হওয়া সম্ভব। এর তাৎপর্য হলো উদ্ভাবনার গতি আরো ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনা থাকবে যদি বর্ধিত সংখ্যক দক্ষ ও কর্মনিষ্ঠ উদ্যোক্তা প্রকৌশলী আরো অধিক সংখ্যক সৃজনশীল উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও প্রয়োগে এগিয়ে আসেন।

'ইন্টারনেট অব থিংস'- ইলেকট্রনিকের সাহায্যে ভৌত জগতের বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ করার সামর্থ্য - এই উন্নয়নগুলোর বৃদ্ধি ঘটাবে ও ত্বরান্বিত করবে। উপকরণ সরবরাহসহ সরবরাহ শৃংখলে রূপান্তর ঘটিয়ে ডিজিটাইজেশন ইতোমধ্যেই বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কোম্পানিগুলো এখন তাদের ব্যয় কমানো সহ পরিচালন-দক্ষতার উন্নতিকল্পে সেন্সর বা অন্য কোন

ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কোন পণ্য, স্থান, সময় ও লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে বের করাসহ সংগ্রহ করতে পারবে। এ প্রক্রিয়াটি অবশ্য এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস, পরবর্তী দশকে এর প্রভাব হবে অনেক ব্যাপক ও গভীর। ডিজিটাইজেশনের সাতটি পর্যায় সনাক্ত করা হয়ে থাকে (কম্পিউটারায়ন, সংযোগশীলতা, তথ্য, জ্ঞান, প্রক্ষেপণ, স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এগুলোতে বাংলাদেশ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সামনে রয়েছে শেখার জন্য অবারিত সম্ভাবনা।

তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ভবিষ্যতের ডিজিটাল বিশ্ব নতুন নতুন সুযোগও মেলে ধরবে, যা প্রযুক্তিগত রূপান্তরের পথে উল্লম্ফন ঘটাতে পারে। সন্দেহ নেই যে, বিশ্বব্যাপী চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-এর অবস্থান শক্ত হওয়ায় বাণিজ্য সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা স্বত্ব (ট্রিপস্) চুক্তির পুনঃসংস্কার প্রয়োজন। এটি স্পষ্ট যে, বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা স্বত্বের প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে (তাদের সম্ভাবনার তুলনায়) উদ্ভাবনের বর্তমান মান বেশ কম। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যে সকল প্রযুক্তি ও সুবিধা এনে দেবে, তা আকর্ষণ ও অঙ্গীভূত করার জন্য নিজেদের স্বার্থেই উন্নয়নশীল বিশ্ব ব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা স্বত্ব সুরক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চাহিদা অন্তর্ভুক্তির জন্য ট্রিপস সংশোধন সহ হালনাগাদ করা যেতে পারে। এটি বিশ্ব জুড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা স্বত্ব সুরক্ষার বর্তমান অবস্থার শুধুমাত্র উন্নতিই করবে না, তৎসহ তা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যে কাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে পারে সেগুলোর সাথেও ভালোভাবে মানিয়ে চলতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করবে।

৭.৩ একটি প্রতিযোগিতামুখী বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য সমস্যা ও সম্ভাবনা

একবিংশ শতাব্দী এর তৃতীয় দশকে ও আরো সামনে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামুখী বিশ্ব বাজারে পণ্য ও সেবা নিয়ে বাণিজ্য করার এক বিশাল সুযোগ অবারিত হতে যাচ্ছে। তবে এই সুযোগ হবে স্থান ও কালের প্রবাহে দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা কাঠামো সহ বৈশ্বিক বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতা হতে উদ্ভূত জটিল সমস্যায় আকীর্ণ। বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতো ভালোভাবে অঙ্গীভূত, অভ্যন্তরীণ বাজারে অস্বাভাবিক প্রণোদনা সরিয়ে নেয়ার পাশাপাশি বিদেশের বাজার আয়ত্তে নেয়ার নীতিমালা কতখানি সহায়ক এগুলোর ওপরেই নির্ভর করবে কর্মসুযোগ সৃষ্টিসহ বাংলাদেশে শিল্পায়ন বিকাশের গতিধারা।

৭.৩.১ প্রতিযোগ-সক্ষমতার সুবিধাবলি শক্তিশালীকরণ

সময়ের ধারায় একটি জাতির শিল্প ও রপ্তানি সাফল্য নিরূপিত হয় তার উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগ-সক্ষমতার সুবিধা গ্রহণ ও ধারণের সক্ষমতা দ্বারা। প্রতিযোগ-সক্ষমতার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। বস্তুত প্রতিযোগ-সক্ষমতার আন্তর্জাতিকায়ন ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে আসায় প্রতিযোগিতা-অক্ষম ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঠানগুলোকে আশ্রয় দানও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সেই দিন আর নেই যখন বলা যেতো কম মজুরির শ্রমিক সংবলিত দেশগুলো শ্রমঘন উৎপাদনের সকল সুবিধা ভোগ করবে এবং পর্যাপ্ত পুঁজিসমৃদ্ধ জাতিসমূহ পুঁজিঘন উৎপাদনে তাদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করবে। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনা শ্রমঘন উৎপাদনের সকল সুবিধাপ্রাপ্তির ধারণাকে আঘাত করেছে। চীনকে রপ্তানির অগ্রগামী হিসেবে বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য শুধু তার শ্রম মজুরি সুবিধার প্রাচুর্যই যথেষ্ট ছিল না। এর পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলোর জন্য বহু বিচিত্র প্রযুক্তিঘন পণ্যে অব্যাহত প্রতিযোগ-দক্ষতা ধরে রাখতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রয়োগও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন গবেষণা, ভৌত পুঁজি ও মানবসম্পদে অব্যাহত বিনিয়োগ এটি উপলব্ধিতে এনে চীন সরকার এখন তার শিল্প কারখানাগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ সুবিধা দান করছে প্রতিযোগ-দক্ষতার ধরণ ও উন্নয়নের জন্য যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক হারে বিনিয়োগ করতে পারে।

সামনে বাংলাদেশের জন্য রয়েছে কঠিন শিক্ষা, নিম্ন শ্রমব্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগিতা সুবিধা সকল সময়ের জন্য টেকসই হতে পারে না। প্রতিযোগিতা সুবিধার নতুন তত্ত্ব শুরু হয় এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা গতিশীল এবং বিবর্তনশীল। বেশ কয়েক বছর আগে যোশেফ সুমপিটার স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, প্রতিযোগিতায় কোনো ভারসাম্য থাকে না। আগামী দিনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা একটি নিশ্চল ধারণা হতে পারে না, তা অবশ্যই গতিশীল ধারণা হতে হবে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য রপ্তানি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই সত্যটি অবশ্যই মানতে হবে যে, প্রতিযোগিতা থেকে যে সুবিধাবলি সৃষ্ট হয় তা অব্যাহত রাখতে হবে ধারাবাহিক উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে।

উপাদান-চালিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার বর্তমান পর্যায় থেকে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন-চালিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগ ছাড়া শ্রমঘন পোশাক রপ্তানির বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ভবিষ্যতে একেবারে হারিয়ে যেতে পারে। ইতিহাস এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখা যায় যে, এমন প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা খুব কম আছে যা অবিকল অনুকরণ করা যায়। দক্ষিণ কোরিয়ার কথাই ধরা যাক, যা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে টিভি ও ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনে জাপানকে টেক্কা দেয়। ঠিক একইভাবে ব্রাজিল চামড়ার জুতা উৎপাদনে ইটালিকে দেখিয়ে দেয় এবং চীন-ভিয়েতনাম প্রায় একই কাজ করতে যাচ্ছে চামড়া-বহির্ভূত স্পোর্টস জুতোর বেলায়। এর অর্থ বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে বর্তমান নেতৃত্ব দীর্ঘমেয়াদে আরো উন্নত ও টেকসই হতে পারে শুধুমাত্র এর শ্রম, দক্ষতা, প্রযুক্তি ও পুঁজির ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে। আরো বহু পণ্যের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। দীর্ঘয়োদে আমাদের বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানেও যাতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভবিষ্যৎ সমস্যাবলি মোকাবেলাসহ প্রতিযোগ-সক্ষমতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে একটি সমন্বয়ধর্মী সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার-

- অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা সহজীকরণ
- শ্রমশক্তির মান উন্নয়ন
- উৎপাদনের সকল পর্যায়ে উদ্ভাবন বিস্তারে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ
- ব্যবসায় পরিবেশের উন্নতি এবং ব্যবসায় করার ব্যয়হ্রাস
- বেসরকারি বিনিয়োগ ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থায়নের সমাবেশ
- পরিবেশগত টেকসহিতা ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা নিশ্চিতকরণ।

এটি স্পষ্ট যে, আগামী দশকগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান হতে বেরিয়ে বাংলাদেশ যখন মধ্যম-আয়-দেশের মর্যাদায় উন্নীত হবে, তখন প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক রীতি (ডব্লিউটিও বাধ্যবাধকতা) অনুযায়ী বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না বলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে অক্ষম এমন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পগুলোকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে, তখন বাংলাদেশকে অধিকতর বাণিজ্যিক উদারতার দিকে এগিয়ে গিয়ে রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বিক্রয় দুটোকেই সমভাবে লাভজনক করতে হবে। চাকুরির বাজারে প্রায় ১.৫ - ২ মিলিয়ন কর্মপ্রত্যাশীর জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করতে হলে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসংস্থানকে অর্থনীতির বহিঃস্থ খাতের পাশাপাশি এর অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার সাথেও সমভাবে যুক্ত হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদনের কারখানাগুলো বৃহৎ ও অনমনীয় প্রকৃতির না হয়ে হবে ক্ষুদ্র ও নমনীয় প্রকৃতির এবং এগুলোর অবস্থান হবে প্রকৃত গ্রাহকদের কাছাকাছি।

৭.৩.২ বৈশ্বিক মূল্য শিকলের সাথে সমন্বয় ও এর সমস্যাবলি

বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক মূল্য শিকলে (জিভিসি) কার্যকর অংশগ্রহণে কিছু সংখ্যক সরবরাহ জনিত উপাদান বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই উপাদানগুলো দেশজ উৎপাদন ও বিনিয়োগ পরিবেশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই উপাদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো: (১) অর্থায়নের অভিগম্যতা, (২) দুর্বল ভৌত অবকাঠামো, (৩) অদক্ষ বন্দর ও উচ্চ পরিবহন ব্যয়, (৪) দক্ষ কর্মীর ঘাটতি, (৫) প্রযুক্তিগত অসুবিধা, (৬) উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অভাব, (৭) তথ্যের স্বল্পতা, এবং (৮) ব্যবসায় করার উচ্চ ব্যয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভাজনের ফলে বৈশ্বিক মূল্য শিকলে উন্নতি হয়, যা বৈশ্বিকভাবে আন্তঃশিল্প বাণিজ্যের জন্য এবং সেই সঙ্গে একটি অঞ্চলের সন্নিহিত অর্থনীতির মধ্যে সুযোগ সৃষ্টি করে। পূর্ব এশীয় দেশগুলো এই উন্নয়নের প্রথম সুযোগ নেয় বিশ্বের অ্যাসেমব্লিং পাওয়ার হাউস চীনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। বাংলাদেশ শুরু করে একটি স্বল্প মূল্য সংযোজনকারী বৈশ্বিক মূল্য শিকলের তৎপরতায় এক খাঁটি 'সংযোজনকারী' হিসেবে তৈরি পোশাক কাটা ও সেলাই । বৈদেশিক বিনিয়োগ এর প্রারম্ভিক সঞ্চারী ভূমিকা পালন করে, যার ফলে প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল, বাজারে প্রবেশ সুবিধা ও

প্রয়োজনীয় তথ্য, সম্মুখ ও পশ্চাত সংযোগ সৃষ্ট হয়। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে তৈরি পোশাকের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ - যা বৈশ্বিক মূল্য শিকলের রপ্তানি-বিস্তার ও কর্মসৃজন সম্ভাবনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতগুলোতে বৈশ্বিক মূল্য শিকল থেকে বাংলাদেশের জন্য উদ্ভূত সম্ভাবনা, সমস্যা ও সুযোগ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেয়ার আছে। প্রথমত, এটি ছিল একটি বিদেশি বিনিয়োগকারী, যেমন কোরিয়ার ডাইয়ু বাংলাদেশের দেশ গার্মেন্টস-এর সাথে একত্র হয়ে বৈশ্বিক মূল্য শিকলে বাংলাদেশের প্রবেশ সহজ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এটি সত্য যে, নিম্ন-দক্ষ নিবিড় ম্যানুফ্যাকচারিং-এ তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের সুবিধাজনক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করেই বৈশ্বিক মূল্য শিকল- উৎপাদনের পছন্দ স্থির হয়। এরপর, এটিও সত্য যে, এ ধরনের অনেক কম দক্ষ নিবিড় ম্যানুফ্যাকচারিং এ বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে সুবিধা ছিল - যা হতে পারতো চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য বা মধ্যবর্তী পণ্যসামগ্রী। অথচ বাংলাদেশের রপ্তানি ঝুড়িতে মধ্যবর্তী পণ্য যুক্ত হবার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি।

বৈশ্বিক মূল্য শিকলের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে তাহলে নতুন বাজারে নতুন রপ্তানি পণ্যসম্ভার নিয়ে প্রবেশের উপায় বের করতে হবে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, বৈশ্বিক মূল্য শিকল থেকে সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাদের সামনে দুটি সুনির্দিষ্ট উপায় রয়েছে: (১) মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন করা, এবং (২) 'সংযোজন' কাজের ক্ষেত্রস্থল হিসেবে উত্থান। প্রথমটির ব্যাপারে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের সঠিক পণ্য সনাক্ত করতে হবে, যা তৈরি হবে শ্রমঘন ও কম-দক্ষ নিবিড় প্রক্রিয়ায়। এর পাশাপাশি কোন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠানের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য অন্বেষণ-প্রচেষ্টা চালানো, যে অন্য কোন দেশে পণ্যের চূড়ান্ত সংযোজন কাজ সম্পন্ন করবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য কর ব্যবস্থার (অভ্যন্তরীণ ও আমদানি সংশ্লিষ্ট) বিন্যাসে প্রচুর কাজ করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বৈশ্বিক মূল্য শিকল-সাফল্যে চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটি 'পণ্য সংযোজন-হাব' হিসেবে উত্থানের কথা ভাবতে পারে। এই ক্ষেত্রে চীনের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এশীয়-যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য একটি বৈশিষ্ট্য কাঠামোর উত্থান, যা সাধারণভাবে 'চীনের মাধ্যমে ত্রি-মেরু বাণিজ্য' মডেল হিসেবে চিহ্নিত - সেদিকেও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এই কাঠামোতে (১) চীন ছাড়া পূর্ব-এশীয় দেশগুলো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি করে তা চীনে রপ্তানি করে; (২) চীনে সেগুলো সংযোজন করে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি হয়; (৩) তা আবার রপ্তানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারগুলোতে ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য।

এক্ষেত্রে কতকগুলো কৌশল বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। শুরুতে, স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ যদি কোন মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনে জড়িত হতে আগ্রহী হন, তাহলে সম্ভবত তাদের 'কী ভাবে অনুকরণ করা যায় তা শেখা'র জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে হবে। সংক্ষেপে, বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের যেহেতু এ ধরনের বিশেষজ্ঞতার অভাব রয়েছে, তাই বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞানে তাদের অবশ্যই সমৃদ্ধ হতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য একটি দূরদর্শী কৌশল হবে এমন একটি যৌথ সহযোগিতামূলক উৎপাদন কাঠামো বেছে নেওয়া, যা স্থানীয় ও বিদেশি উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী দায়বদ্ধতা গড়ে তোলে ফলে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র মধ্যবর্তী পণ্যের উৎপাদনেই নয়, আগামী দশকগুলোর ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের বাজার প্রাপ্তির সুবিধা সহ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগত উল্লম্ফনের জন্যও বৈদেশিক বিনিয়োগের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলা আবশ্যক।

এর বাইরেও বৈশ্বিক মূল্য শিকলে অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর জন্য (এবং এই একই লক্ষ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য), নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

- একটি উদার বিনিয়োগ নীতি ব্যবস্থা - যা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সুযোগ করে দিবে।
- বৈশ্বিক মূল্য শিকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পক্ষগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে প্রযুক্তির বিস্তার ঘটবে, যা পরিণতিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানি সম্ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করবে।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্যই প্রযুক্তিগত মানের একটি মৌলিক মাত্রা বজায় সহ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে এ ধরনের সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়।

- প্রতিযোগিতামূলক দরে উপযুক্তভাবে দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত বিদেশি উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করে।
- তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানি খাতে বৈশ্বিক মূল্য শিকল দ্রুত শুরু করার ক্ষেত্রে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ডব্লিউটিও'র বর্তমান বিধিনিষেধ এড়ানো সম্ভব, এ ধরনের বিভিন্ন সহায়ক নীতি (যেমন, স্বল্প-ব্যয় ঋণ, কর রেয়াত, উদার হস্তান্তর মূল্য বিধি) প্রণয়ন করা যেতে পারে, কেননা বৈশ্বিক মূল্য শিকলের মূল্য সংযোজন বাণিজ্যের দ্রুত প্রবৃদ্ধির তুলনায় ডব্লিউটিও'র আইনকানুন এখনো পেছনে রয়েছে।

৭.৩.৩ এলডিসি অবস্থা হতে উত্তরণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি

বাংলাদেশ ২০১৮ তে জাতিসংঘের (ইউএন) বিভিন্ন দেশের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থা হতে বেরিয়ে আসার দ্বারপ্রান্তে পা রাখে এবং এখন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান থেকে উন্নয়ন ঘটবে ২০২৪ সালের মধ্যে[৮]। স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থা থেকে উত্তরণের সুফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে দেশের উন্নত ভাবমূর্তি এবং আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থাসমূহ দ্বারা বিনিয়োগের জন্য উচ্চতর রেটিং যা বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে। তবে, স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান হতে উত্তরণের সাথে বাংলাদেশের জন্য বেশকিছু ঝুঁকি উপাদানও রয়েছে। 'বৈশ্বিক গতিশীল সাধারণ ভারসাম্য মডেল' থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক সিম্যুলেশনের ফলাফলে বেরিয়ে আসে যে, ২০২৪ এ (যে বছর বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের প্রাধিকার শেষ হয়ে যাবে) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত ও চীনের সাথে বাজারে প্রাধিকার রহিতের ক্ষতি হবে, এতে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে হ্রাস পাবে, যা বর্তমান রপ্তানি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণকৃত মূল্যে প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যমানের হতে পারে। এছাড়াও, ডব্লিউটিও বিধি-বিধান অনুযায়ী বেশ কিছু সংখ্যক অব্যাহতি সুবিধা, যেমন শুল্ক ছাড় ও ভর্তুকি, বুদ্ধিবৃত্তিক মেধা স্বত্বের প্রতি বাধ্যবাধকতা (বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে), যা বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে ভোগ করছে, ২০২৪ সালের পরে সেগুলো আর থাকবে না, শুধুমাত্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্যতীত যেখানে এগুলো ক্রান্তিকালের সুবিধা ২০২৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এছাড়া, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংকের 'নিম্ন আয়' শ্রেণী থেকে 'নিম্ন-মধ্যম-আয়' শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বল্প সুদ হারে ঋণের সুবিধা গ্রহণও সীমিত হয়ে আসবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পূর্বে বর্ণিত সম্ভাব্য সুফলের বেশির ভাগই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে না, সুফলগুলো পেতে হলে দেশকে প্রচুর কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে, দেশ স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থা থেকে উত্তরণের সাথে সাথেই সম্ভাব্য ক্ষতির প্রায় সবগুলোই ঘটবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সুতরাং পরবর্তী নয় বছর এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সামলে ওঠার জন্য দেশকে এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩.৪ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংহতির জন্য উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সংহতি প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নিতে একটি সুন্দর ও কার্যকর প্রচেষ্টা হলো বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল উদ্যোগ, যা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির জন্য একটি উপ-আঞ্চলিক সংহতিমূলক স্থাপনা। এই উদ্যোগটি পরিচালিত হয় প্রতি সদস্য রাষ্ট্র থেকে সরকারি প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে, যা চতুর্পাক্ষিক চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সহযোগিতা ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বৈদ্যুতিক গ্রিড সংযোগ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা, মালামাল পরিবহন ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো। উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের ওপর প্রাধান্য দানসহ এর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বাণিজ্যিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, যোগাযোগ, পর্যটন, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে। এর উদ্দেশ্যাবলি সম্প্রসারিত হয়েছে আগামী দিনগুলোতে এই অঞ্চলে বর্ধিত ও ব্যাপকভাবে স্থল ও জলপথে সংযোগশীলতার উন্নয়নে।

দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলোর সাথে এই চারটি দেশের সংহতির তুলনায় অর্থনৈতিক চাহিদা ও চালিকার স্বার্থেই বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল উদ্যোগটি বিবিআইএন উপ-অঞ্চলের মধ্যে গভীরতর সংহতি অধিকতর জরুরি। বিশেষ করে, বিবিআইএন দেশগুলোর মধ্যে গভীরতর সংহতি চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সাথে অধিকতর সংহতির জন্য প্রবেশ পথ হিসেবে জোটটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অর্থনীতির চালিকাশক্তিও বেশ অনুকূল প্রতীয়মান হয়। কতিপয় কাঠামোগত উপাদান এবং নেপাল ও ভুটানের ভূ-বেষ্টনীর প্রেক্ষাপটে, এই চারটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

৮ প্রত্যাশা অনুযায়ী ২০২০-২০২৪ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হবে ৮.২% হারে।

বিবিআইএন উল্লিখিত উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখেছেন। বিবিআইএন (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল) উদ্যোগটির জন্য অতি-আঞ্চলিক চালিকাশক্তিও অনুকূল। কেননা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বিশ্ব ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতেও এই উপ-অঞ্চলে সংযোগশীলতার উন্নতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথেও ব্যাপক ভিত্তিতে সংহতি গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের সচেষ্ট হতে হবে। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংহতি বিনির্মাণ এজেন্ডায় দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সংহতি স্থাপন প্রাধান্য পায়। তবে এটি বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, বাংলাদেশ সম্পৃক্ততা বাড়িয়েও লাভবান হতে পারে পূর্ব এশীয় দেশগুলোর (চীন, জাপান ও কোরিয়া) সাথে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর (আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ, যেমন ব্রুনেই, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) নিবিড় সংহতি গড়ে তোলার মাধ্যমে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ প্রসঙ্গে, পণ্য ও গন্তব্য উভয় দিক থেকেই পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সাথে সংহতি স্থাপন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের জন্য অনেক কারণে লাভজনক হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বৈশ্বিক মূল্য শৃংখলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে অঙ্গীভূত। এভাবে এ ধরনের সংহতি ব্যাপক বৈশ্বিক মূল্য শিকলের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার এবং সেই সাথে এর রপ্তানি ঝুড়ি বৈচিত্র্যময় করার পথ প্রশস্ত করবে। এছাড়াও এই দেশগুলো থেকে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম ইলেকট্রনিক, মেশিনারি ও চামড়াজাত পণ্যের বড় রপ্তানিকারক দেশ এবং প্রাথমিকভাবে বিশ্বের একগুচ্ছ নেতৃত্বশীল বহুজাতিক কোম্পানি এতে চালিকাশক্তি হিসেবে সংযুক্ত। এই পরিণতিতে ইলেনিক্স, মেশিনারি ও চামড়াজাত পণ্যে বিশেষজ্ঞ একগুচ্ছ বহুজাতিক কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য টেনে আনবে, ফলে দেশজ অর্থনীতিতে এর উপচে-পড়া সুফল সঞ্চিত হবে। এই দেশগুলোর সাথে, দ্বিপাক্ষিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে অঞ্চলগত সহযোগিতা (যেমন আসিয়ান) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল-উদ্যোগ, এশীয় মহাসড়ক ও ট্র্যান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কেরমাধ্যমে চীন ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংযোগশীলতায় গতি আনা সম্ভব।

৭.৪ ভবিষ্যতের জন্য বাণিজ্য সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক কৌশল ও নীতিমালা

বাংলাদেশে বাণিজ্য নীতির সাধারণ অবস্থা সংক্ষেপে এভাবে তুলে ধরা যায়: বাণিজ্যের বিকাশ ঘটাতে হবে, রপ্তানির বিস্তার ঘটাতে হবে, আর এজন্য দেশের লেনদেনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাণিজ্যের এই পদ্ধতি এমন এক শুল্ক কাঠামো দাঁড় করছে। যা রপ্তানির বৈশ্বিক প্রতিযোগ-দক্ষতা ও আমদানি বিকল্প উৎপাদনে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে। ফলে প্রয়োজন হয় বাণিজ্যিক অবকাঠামো ও শুল্ক প্রশাসনসহ বাণিজ্য নীতির সকল উপাদানের আধুনিকায়ন ও ব্যাপক সংস্কার সাধন। এটি প্রয়োজন এ জন্য যে, বাংলাদেশ তার উন্নয়নের পরবর্তী দশকগুলোতেও দ্রুত প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারে। এটি একটি পরীক্ষণলব্ধ সত্য যে, বিশ্বব্যাপী বিগত পঁচিশ বছরে শুল্কহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে বাংলাদেশে, তার সমস্থানীয় দেশগুলোর তুলনায় শুল্ক হার এখনো উঁচু অবস্থান বজায় রেখেছে। বাণিজ্যতত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার আলোকে একটি গতিশীল রপ্তানি অর্জনের জন্য এটি উপযোগী নয় বিধায় এ ব্যাপারে করণীয় সন্ধান করা প্রয়োজন।

৭.৪.১ শুল্ক সুরক্ষা ও রপ্তানিতে প্রভাব বিস্তারকারী বাণিজ্য নীতি

তাত্ত্বিকভাবে, শুল্ক হলো আমদানি বিকল্পের ওপর পরোক্ষ ভর্তুকি এবং রপ্তানির ওপর কর আরোপ। নমনীয় ও কার্যকর শুল্কের মাধ্যমে যে সুরক্ষা সহায়তা দেয়া হয়, সেটি কর। তবে তা বর্তায় ভোক্তাদের ওপর, যাকে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য বিশ্ব মূল্যের (শুল্কসহ মূল্য) চেয়ে উচ্চমূল্য পরিশোধ করে সুরক্ষা করের সর্বশেষ ভার বহন করতে হয়। নীতি-প্রণেতাদের তাই সুরক্ষার সামাজিক ব্যয়ের সাথে, উৎপাদনকারীদের তাঁরা যে-সমর্থন দান করেন, তা সুষম করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে সামাজিক সুরক্ষা তখনই লাভবান হয়, যখন সুরক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। দেশজ আমদানি বিকল্প উৎপাদনকারীগণ দ্রুততম সময়ে বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগ-সক্ষম হয়ে ওঠে, যাতে সুরক্ষা সরিয়ে ফেলা যায় এবং আমদানি বিকল্পের দেশজ মূল্য ও আন্তর্জাতিক মূল্য একই বিন্দুতে মিলিত হয়। এতে যতো দেরি হবে, সুরক্ষার সামাজিক ব্যয়ও ততো ঊর্ধ্বমুখী হবে।

শুল্ক ও সুরক্ষার আরেকটি অশুভ দিক হলো- এরা যে রপ্তানিবিরোধী ঝোঁক তৈরি করে, তাতে রপ্তানি হয়ে পড়ে অ-সুরক্ষিত। যাকে সবার আগে বিশ্ব বাজারে সুরক্ষাশূন্য ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হতে হয়। তবে রপ্তানির পূর্বে আমদানিকৃত উপকরণের ওপর যে শুল্ক তারা পরিশোধ করেছে তা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পুরো ফেরৎ দেওয়া হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি তারা প্রদত্ত শুল্ক পুরো ফেরৎ না পায় অথবা যদি তাদের শুল্কমুক্ত উপকরণ আমদানির সুযোগ না দেয়া হয় তখন রপ্তানি উৎপাদন হয়ে পড়ে নেতিবাচক সুরক্ষার শিকার- এটিই হলো নীতির আসল রপ্তানিবিরোধী প্রবণতা বা ঝোঁক।

সুতরাং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতা-সক্ষম রপ্তানি উৎপাদনের জন্য উপযোগী আদর্শ বাণিজ্য নীতিকে অবশ্যই স্বল্প ও অভিন্ন শুল্ক দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে হবে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে একটি সহজ আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থা। যা সীমান্ত ফাঁড়িতে ন্যূনতম ব্যয় লেনদেনের সুবিধা দান করে। মালয়েশিয়া এমন এক অর্থনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা এর উন্নয়ন যাত্রার শুরুর দিকেই উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থা পরিহার করে। এখন এর শুল্ক হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, যা গড়ে মাত্র ৭-৮ শতাংশ । পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে দেশটির অর্থনীতি উচ্চ আয়ের অবস্থানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া, যা চার দশক আগে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা পায়, রপ্তানির শক্তি কেন্দ্র হবার প্রত্যয়ে এর বাণিজ্য ব্যবস্থার রপ্তানি-বিরোধী প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।

বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থা এই চাহিদা পূরণ করতে পারবে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে । ১৯৯০ এর দিকে বিশ্ব ব্যাংকের "ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট" শীর্ষক প্রকল্পের সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, শুল্ক গুচ্ছের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ছিল ১০০ শতাংশের অধিক শুল্কের আওতায় । এছাড়াও ছিল আমদানির ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা ও নানা ধরনের বিধিনিষেধ। এরই ধারায় গড়ে ওঠে এক উচ্চমাত্রার নেতিবাচক আমদানি ব্যবস্থা, যা অবধারিতভাবে আমদানি বিকল্প উৎপাদনে যেমন কোন নতুন পথ তৈরি করতে পারে নি। তেমনি পারেনি লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতি ঠেকিয়ে রাখতে। বাণিজ্য নীতির জন্য তাই শুল্ক যুক্তিযুক্তকরণ এবং আমদানি উদারীকরণ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

৭.৪.২ শুল্ক আধুনিকায়ন একটি জরুরি করণীয়

বর্তমানে প্রচলিত শুল্ক কাঠামো সেকেলে এবং এতে বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় সর্বাগ্রে যে কাজটি সম্পন্ন হওয়া দরকার তা হলো শুল্ক ব্যবস্থার অধিকতর যৌক্তিককরণ এবং আধুনিকায়ন। সুরক্ষা বিষয়ে গবেষণা ও বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা প্রতিপন্ন করে যে, (ক) সুরক্ষা একবার দেয়া হলে সুরক্ষাপ্রাপ্ত তৎপরতায় জড়িত উৎপাদকবৃন্দের মধ্যে এটিকে চিরস্থায়ী করার প্রবণতা সৃষ্ট হয় যখন কায়েমি স্বার্থবোধ গড়ে ওঠে; (খ) দীর্ঘ সময় যাবৎ সুরক্ষাভোগী শিল্প বৈশ্বিক পর্যায়ে অদক্ষ ও প্রতিযোগ-ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে, কেননা উদ্ভাবন বা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ব্যাপারে তাদের কোন প্রণোদনা থাকে না। একটু নিবিড়ভাবে শুল্ক কাঠামো পরীক্ষণে দেখা যায় যে, নামিক সুরক্ষা হারের গড় (এনপিআর) ক্রমনিম্নতার কারণ প্রাথমিকভাবে মূল কাঁচামাল, মূলধনী সামগ্রী ও মধ্যবর্তী উপকরণে শুল্ক হ্রাস। পক্ষান্তরে সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ২০০৫ অর্থবছর হতে একইভাবে ২৫ শতাংশ হারে চলছে, যা সম্পূরক শুল্ক এবং নিয়ন্ত্রক শুল্ক - ইত্যাদি আধা-আমদানি-রপ্তানি শুল্কের মতো সম্পূরক কর দ্বারা আরো বৃদ্ধি পায়। আমদানির শ্রেণীতে নামিক সুরক্ষা হারের গতিধারা বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে যে নিকট অতীতে উপকরণ শ্রেণীর গড় নামিক সুরক্ষা হারে দ্রুত পুন ঘটছে, অথচ চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে তা বাস্তবিক অর্থেই একই সমতলে থাকছে। ফলে আউডপুট ও ইনপুট শুল্কের মধ্যে ঘাটতি হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক রকমের বড়, যা অন্য কোন দেশে হয় না (চিত্র ৭.৫)। শুল্কের এই গতিধারা শুরুতেই বাংলাদেশের এবং পূর্ব এশিয়ার উচ্চ-পরিকৃতি সম্পন্ন অর্থনীতিগুলোর দ্বারা অনুসৃত ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

চিত্র ৭.৫: আউটপুট ও ইনপুট শুল্কের গতিধারা: বাংলাদেশ

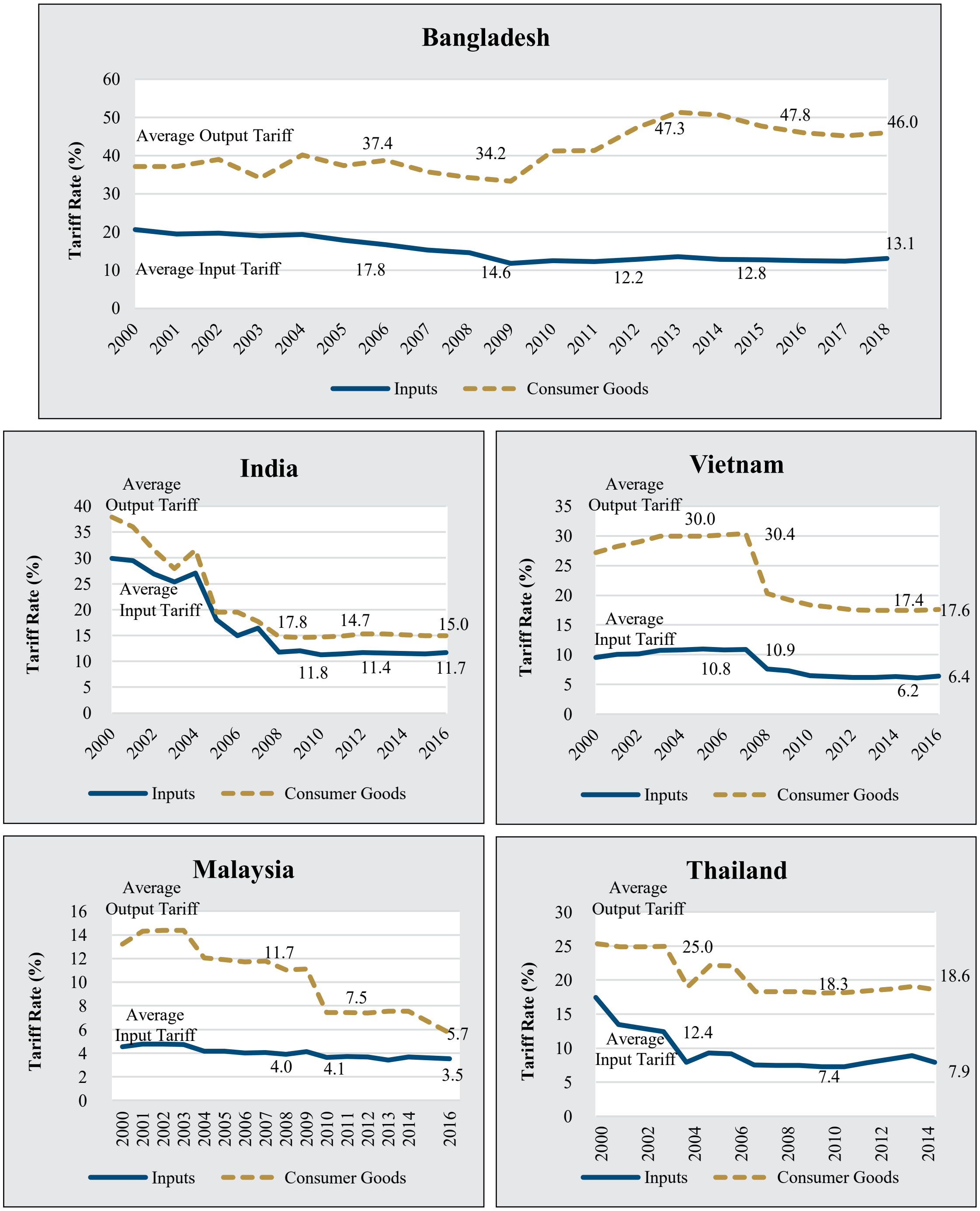

উৎস: এনবিআর; ডব্লিউআইটিএস তথ্য, বিশ্বব্যাংক এর তথ্য হতে জিইডি'র অনুমান।

তবে এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলাফল হলো দীর্ঘ সময় ধরে দেশজ উৎপাদনকারীরা উচ্চতর কার্যকর সুরক্ষা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে যে মুনাফা আহরণ করে সেটি শুধু উচ্চ শুল্কের মাধ্যমে হয়ে থাকে উৎপাদনশীলতা বা প্রতিযোগ-সক্ষমতার কোন ধরনের উন্নতি ছাড়াই। ভবিষ্যতের জন্য একটি উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতা-সক্ষম শিল্প খাতের অন্বেষায় নিবেদিত কোন অর্থনীতির জন্য কখনোই এ ধরনের একটি দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা কৌশল অনুমোদনযোগ্য নয়। সাধারণ ধারণা এই যে, উপাদানের আউটপুট শুল্ক কমিয়ে উৎপাদিত পণ্যের শুল্ক উচ্চ রাখা হলে আমদানি বিকল্পের দেশজ উৎপাদনকে অধিকতর প্রতিযোগিতা-সক্ষম করে।

বৈচিত্র্যময় পণ্যসম্ভারসহ টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশকে যে-তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে তা হলো এর শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। যাতে ধাপে ধাপে এর রপ্তানি-বিরোধী প্রবণতা ও কার্যকর সুরক্ষা মাত্রা বাতিল করা যায়। চিত্র ৭.৬ এ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য শুল্ক কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রবণতা প্রদর্শিত হলো। চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যে নামিক সুরক্ষা হারের বর্তমান উচ্চ-মাত্রার প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত কাঠামোর জন্য এই সকল পণ্যের ওপর ক্রমান্বয়ে নামিক হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনার পাশাপাশি শুল্কের পরিমিত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন হবে এবং এভাবেই ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-আয় উন্নত দেশের উন্নয়ন চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যকর শুল্ক কাঠামো গড়ে তোলা হবে[৯]। সুতরাং ২০১৭ এর গড় চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যে নামিক সুরক্ষা হারের ৪৫ শতাংশকে ২০২০ এ ২৫ শতাংশ এ নামিয়ে আনা হবে, যা ২০২৫ এ হবে প্রায় ১০ শতাংশ সেখান থেকে ২০৩১ সালে ৫ শতাংশ হয়ে তা ২০৪১ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । এর মধ্যে গড় নামিক সুরক্ষা হার ২০১৭ এর ১৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০২০ এ প্রায় ১০ শতাংশ এবং ২০৩১ থেকে ২০৪১ পর্যন্ত প্রায় ৫ শতাংশে কমিয়ে আনা হবে। এরপরে শুল্ক ব্যবস্থা হবে প্রায় ৫ শতাংশ বা কম হারের ও সম-শুল্কের এক ব্যবস্থা, যেখানে উপকরণ ও উৎপন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য থাকবে না। এর ফলে প্রস্তাবিত শুল্ক ও সুরক্ষা গতিধারাকে আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান গতিধারার বিপরীত মনে হবে। যদি বাংলাদেশকে গঠনমূলক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিতে হয়, যেখানে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় একান্তভাবেই রপ্তানি সাফল্যের সাথে সংযুক্ত, যার অবস্থান হবে ২০৩১ এবং তৎপরবর্তীকালে জিডিপি'র ৬০-৭৫ শতাংশ বা তার বেশি তবে এটিই একমাত্র পথ ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বাণিজ্য সুরক্ষাকে গতিশীল তুলনামূলক সুবিধার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। অনেক কারণেই উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত একটি তৎপরতাও স্বল্প-অর্জন সম্পন্ন হতে পারে বা প্রবল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু হাতে-কলমে শেখার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে এবং প্রতিযোগিতা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সঠিক গবেষণার ভিত্তিতে এই উপসংহার যদি যুক্তগ্রাহ্য মনে হয়, তবে এটিসহ অনুরূপ অন্যান্য উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত তৎপরতার অনুকূলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমনটি কখনো কখনো উন্নত দেশগুলোতে করা হয়ে থাকে। তবে এটি অবশ্যই কোন মহল বিশেষের চাপে নির্ধারিত হবে না, বরং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সতর্ক নিরূপণের ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হবে। সুরক্ষা সুবিধা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বল অর্জন এবং রপ্তানি প্রণোদনার ওপর এর বিরূপ প্রভাব এই নির্দেশনা দেয় যে, বাণিজ্য সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়ন অবশ্যই সুনির্বাচিত, যোগ্যতা-ভিত্তিক এবং সময়-নির্দিষ্ট ও অর্জন ভিত্তিক হবে।

চিত্র ৭.৬: একটি ভবিষ্যবাদী ট্যারিফ প্রোফাইল (অর্থবছর ২০১৭-৪১)

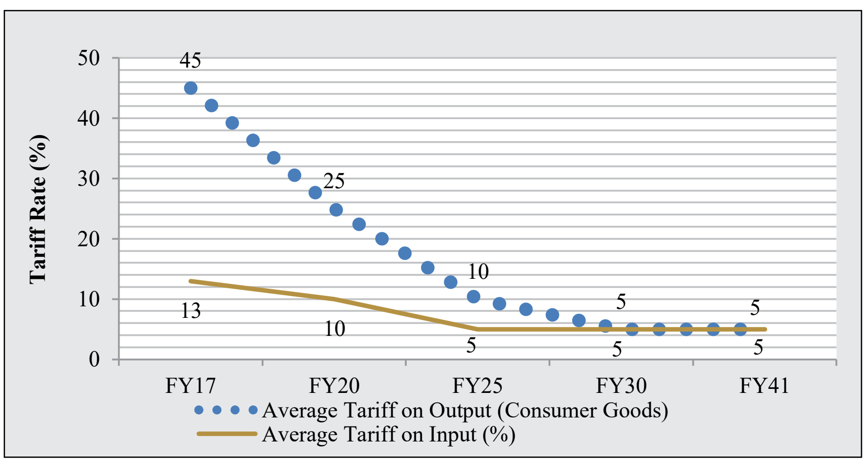

অধিকতর শুল্ক যুক্তিসহকরণের ক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে বড় সমস্যা তা সরকারের সম্ভাব্য রাজস্ব ঘাটতি সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত। যদিও রাজস্ব ঘাটতি অভ্যন্তরীণ কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করে বা ভ্যাট-বেষ্টনী বিস্তৃত করে বা উভয় ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে পরিচালনা করেও মেটানো যায়। তবে বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশের কর প্রশাসন উন্নত দেশগুলোর মতো এতো

৯ উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংকের 'বিশ্বশুল্ক তালিকা (২০১৭)' অনুযায়ী, ওইসিডি সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে বর্তমান গড় শুল্ক প্রায় ৩ শতাংশ মাত্র, গড়ে ২.৪ শতাংশ সহ, ইইউ-বহির্ভূত ওইসিডি সদস্যদের ২.৮ শতাংশ, আর যুক্তরাষ্ট্রসহ মাত্র ৩.৪ শতাংশ (চীনা আমদানির ওপর প্রযোজ্য ১০-২৫ শতাংশ যার শুল্ক আরোপের পূর্বে)।

নমনীয় নয় যে, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বর্ধিত রাজস্ব সমাবেশ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ সম্ভবপর হবে। যাই হোক, যে কোন উচ্চ আয়ের দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মোট রাজস্ব আয়ে শুল্কের অবদান অকিঞ্চিৎকর এবং রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ কর (অর্থাৎ আয়কর ও কর্পোরেট কর) এবং ভ্যাট-এর ভূমিকাই প্রধান। বাণিজ্য করের ওপর নির্ভরশীলতা ধাপে ধাপে কমিয়ে ২০৪১ এ এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যখন শুল্ক প্রশাসনের প্রধান ভূমিকা হবে বাণিজ্য সহজীকরণ[১০] শুল্ক উদারীকরণের আরেকটি উপায় হলো, বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) অধীনে শুল্ক প্রাধিকারের পারস্পরিক বিনিময়। এ ধরনের ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান সৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অনুকূল প্রভাব পড়বে এবং অর্থবহভাবে বাণিজ্যের বিকাশকে আরো বেগবান করবে। বাংলাদেশের বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি অবস্থানকে দৃঢ় করে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্প্রসারণের বিকল্প সম্ভাবনাগুলোও বিবেচনায় রাখা দরকার।

৭.৪.৩ ভবিষ্যতের বাণিজ্য নীতি

কার্যকর রপ্তানি বিকাশের জন্য, বাণিজ্য নীতি ছাড়াও, একগুচ্ছ অন্যান্য সম্পূরক নীতি ও কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা, রপ্তানি বিকাশ ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা এবং আর্থিক বাজারগুলোর সুষম পরিচালনা -- এগুলো একান্ত আবশ্যক। তদুপরি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো ও দুর্নীতি বিস্তার রোধের মাধ্যমে প্রশাসনের মান আরো উন্নত করা প্রয়োজন। প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারে এবং উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বিনির্মাণে সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

রপ্তানি-চালিত প্রবৃদ্ধি দর্শনে একটি প্রণোদনা কাঠামো বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তায় বিশেষ জোর দেয়া হয়, কেননা, তা নীতি-প্রভাবিত রপ্তানিবিরোধী প্রবণতা সৃষ্ট জটিল সমস্যা উত্তরণে সহায়ক। রপ্তানিবিরোধী প্রবণতার ধারণা এমন একটি বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, যার পক্ষপাতিত্ব আমদানি-বিকল্প খাতে এবং বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন রপ্তানি তৎপরতার বিরুদ্ধে। এই পক্ষপাতিত্ব বা প্রধান ধারা নির্ধারিত হয় রপ্তানি ও দেশজ বিক্রয় সংশ্লিষ্ট মূল্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে। রপ্তানিকারকদের পক্ষে বিশ্বমূল্যে প্রভাব বিস্তার সম্ভব নয়, আমদানি শুল্ক ও পরিমাণগত বিধিনিষেধ উৎপাদনকারীদের বিশ্ব বাজারের মূল্যের চেয়ে তাদের পণ্য-সামগ্রীর দেশজ মূল্য বাড়ানোর সুযোগ করে দেয়। সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত লাভ (এবং এভাবে রপ্তানি পণ্যের চেয়ে আমদানি বিকল্প পণ্যে তুলনামূলক উচ্চমূল্য) রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদনের চেয়ে আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদনে অধিকতর সম্পদ পুনর্বন্টনে উৎসাহিত করে। এছাড়াও, নীতি-প্রভাবিত দেশজ উৎপাদন শেষ পর্যন্ত অ-বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য বর্ধিত চাহিদা তৈরি করতে পারে। এর ফলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষতি সাধন করে এই খাতে যুক্ত হতে পারে অধিকতর সম্পদ। বাংলাদেশ এখন তার অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে উদার করেছে এবং বিশেষ করে ১৯৯০ এর দশকে উদারীকরণের গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। এর ফলে নীতি-প্রভাবিত রপ্তানিবিরোধী প্রবণতা পরিমিতভাবে হ্রাস পায়। এ কথা সত্য যে, দেশজ বাজার দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হচ্ছে এবং একটি দ্রুত-বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশজ চাহিদায় গতি সঞ্চার করেছে। সময়ের সাথে ভবিষ্যৎ বাণিজ্য নীতিকে দেশজ এবং রপ্তানি বাজারের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অবশ্যই রপ্তানির জন্য খানিকটা পক্ষপাতসহ এগিয়ে নিতে হবে।

আমাদের বাণিজ্য নীতির মনোভঙ্গিতে যদি রপ্তানিবিরোধী প্রবণতা এতো বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে, প্রাসঙ্গিক ভাবেই প্রশ্ন আসে কেমন করে তৈরি পোশাক রপ্তানি এমন একটি উচ্চতায় পৌঁছলো যা বাংলাদেশকে আজ বিশ্বের প্রধান বৈদেশিক পোশাক রপ্তানিকারক করেছে। এটি আমাদের নীতি-প্রণেতাদের বিচক্ষণতার পরিচয়বাহী এই শতভাগ রপ্তানিমুখী খাতের জন্য একটি 'মুক্ত বাজার চ্যানেল' উদ্ভাবন করা। মাল্টি ফাইবার চুক্তি দ্বারা সহায়তা পুষ্ট ও বিশ্ব বাজারে প্রবেশ সুবিধাসহ তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য একান্তভাবে তৈরি অভ্যন্তরীণ নীতি। যার অন্তর্ভুক্ত স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ইত্যাদি মিলিতভাবে একটি উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থার রপ্তানিবিরোধী প্রবণতাকে সুষ্ঠুভাবে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সমর্থ হয়। বস্তুত এই শ্রমঘন শিল্পের সাফল্যের মজবুত ভিত্তি তৈরি করে এই নীতিমালা এবং এটি কম দক্ষ নিবিড় ম্যানুফ্যাকচারিং-এ বাংলাদেশের শক্তিমত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এ এক এমন বিশেষজ্ঞতা যা দ্রুত অন্য শিল্পগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। যতো দিন উচ্চ শুল্ক সুরক্ষা ব্যবস্থা বলবৎ আছে তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার পুনঃপ্রয়োগ করে একে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সমীচীন।

শুল্ক কাঠামোর সাযুজ্য ছাড়াও দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার অন্যান্য দিকগুলো শুল্ক প্রশাসনে যুক্ত করা হবে, ফলে ২০২৫ এর মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে এর আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকবে না, কারণ অভ্যন্তরীণ করই (আয়কর ও ভ্যাট)

১০ আমাদের মোট রাজস্ব ২০৪১ এ জিডিপি'র ২৪.১৫ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য অধ্যায় ৩, পরিশিষ্ট ক) যে সময় শুল্ক রাজস্ব হবে ন্যূনতম, অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মতোই জিডিপি'র ১% এর কম; রাজস্বের সিংহভাগ তখন আসবে আয়কর, কর্পোরেট কর ও ভ্যাট হতে।

হবে রাজস্বের প্রধান উৎস। শুল্ক প্রশাসনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হবে বাণিজ্য সহজীকরণ। তথাপি, সময়ে সময়ে সর্বোচ্চ শুল্ক (উচ্চ শুল্ক হার) প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পণ্যের সুরক্ষা সুবিধা প্রদানের অবস্থা দেখা দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শুল্ক বিধির লংঘন না করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ধরনের শুল্ক কাঠামো যাতে দেশজ উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যাহত না করে, সেদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখবে। ২০৩১ সালের পর থেকে একটি আধুনিক উচ্চ-প্রযুক্তি চালিত শিল্প খাত ন্যূনতম পরিবহন ব্যয়ে তাদের পণ্য ও সেবার অনলাইনে বা সীমান্তের অপরপ্রান্তে ঝামেলা মুক্ত চলাচল নিশ্চিত করতে পারবে।

প্রতিষ্ঠানঃ নীতি কাঠামোর উদ্দেশ্য যাতে প্রতিষ্ঠান কার্যকর হয়। অন্য কথায়, এটি তো প্রতিষ্ঠানই, যার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কৌশল বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া, বাণিজ্য ও রপ্তানি নীতিমালা ঘিরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ গড়ে ওঠে এবং প্রণোদনা থেকে উপকার ভোক্তা সকল যোগ্য রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের জন্য এদের কাজের সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব অপরিমেয়। সুতরাং এ ব্যাপারে বিশদভাবে কৌশলের রূপরেখা প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করার গুরুত্ব পরবর্তী দশকে খুব গুরুত্বের সাথে অনুভূত হবে। কেননাএই প্রতিষ্ঠান গুলোই উদ্ভাবন ও সৃজনশীল ধ্বংসের দ্বারা চালিত একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতি থেকে উদ্ভূত বাজারের সুবিধাগুলো ধরতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও ধারণের জন্য যেটি প্রয়োজন তা হলো সেই ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ও পরিচর্যা। যেগুলো সম্পত্তির স্বত্বাধিকার বলবৎ করতে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ও বড় ব্যবসায়সহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সমতল ক্ষেত্র সৃজনে, উদ্ভাবন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বাণিজ্য নীতির যে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে তা বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য সফল রপ্তানি-সহায়ক নীতির কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যকে সামনে নিয়ে আসে:

(ক) *সুরক্ষা অবশ্যই সময়-নির্দিষ্ট হবে:* গতিশীল তুলনামূলক সুবিধার সতর্ক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে নীতি সহায়ক হিসেবে বাণিজ্য সুরক্ষা ব্যবহার করা যেতে পারে। সুরক্ষা এমন কি যদি গতিশীল তুলনামূলক সুবিধার কৌশলগত দিক থেকেও যুক্তিগ্রাহ্য হয়, অবশ্যই তা সময়-নির্দিষ্ট ও অর্জন-ভিত্তিক হবে। সেই সাথে সুরক্ষার মাত্রা যে সময়ের সাথে কমিয়ে আনা হবে এ ব্যাপারে পূর্ব ঘোষণাও থাকতে হবে। নিম্ন মধ্যম আয় ও উচ্চ মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে সুরক্ষা অত্যন্ত পরিমিত এভং উচ্চ আয়ের অর্থনীতিতে শুধুমাত্র নির্বাচিত কৃষি পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (যেমন, জাপান ও কোরিয়ায় চালের ক্ষেত্রে ৩০০ শতাংশের বেশী শুল্ক)।

(খ) *সকল রপ্তানিতে বিশ্বমূল্যে উপকরণ সুবিধা প্রাপ্তি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে:* আমদানি বিকল্প নীতি যখন বলবৎ থাকে, তখন সকল রপ্তানিকারক যাতে বিশ্ব-মূল্যে উপকরণ সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে যাতে তারা একই সুবিধার সমতল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। আমদানি বিকল্প উৎপাদনে উচ্চ সুরক্ষা এ ধরনের শিল্পের রপ্তানিমুখী হওয়া থেকে বিরত রাখে।

(গ) *দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নে অভিগম্যতা:* একটি দেশের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় শ্রেণীর রপ্তানিকারকদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। কেননা ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের বড় অংশই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদের রপ্তানি তৎপরতার উন্নতি বিধানে অসমর্থ হয়ে থাকে।

(ঘ) *বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ:* ভালো আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়তা, বিদেশে বাজার অভিগম্যতা তৈরি এবং স্বদেশে কর্মসুযোগ সৃষ্টিসহ রপ্তানিতেও ব্যাপক উদ্দীপনা সঞ্চার করে। পরবর্তী দশকের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রযুক্তিগত ব্যবধান ঘাটতি কমিয়ে আনতে সহায়তা করতে পারে এবং বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিংকে বৈশ্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং সর্বশেষ অগ্রগতির সাথে মিলিয়ে দিতে পারে।

(ঙ) *বৈদেশিক বাজার উন্মোচনে সরকারি সহায়তা:* বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় (যেমন, ইইউ'তে ইবিএ, অন্যত্র জিএসপি) উন্নত বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। তার ইইউ, উত্তর আমেরিকা, জাপান ও উত্থানশীল অর্থনীতিগুলোর মতো বিশ্বের বড় বড় বাজারগুলোতে সফলভাবে প্রবেশের জন্য পূর্বশর্ত হলো বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে সরকারি সহায়তা ও সমর্থন দান।

(চ) *নীতি নমনীয়তা:* সব ভালো নীতি থেকেই তাদের প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না। সফল রপ্তানি অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে নীতি বাস্তবায়নে নমনীয়তা সংকট মোকাবেলায় সহায়তা করে। যখন কোন নীতি সঠিক ফল দেয় না, তখন এতে দিক পরিবর্তনের সুযোগ থাকা দরকার।

৭.৫ ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ও শিল্পে সেবা খাতের কৌশলগত ভূমিকা

বস্তুত সেবা খাত হলো অর্থনীতির তিনটি বড় খাতের কৃষি, শিল্প, সেবা এর মধ্যে বৃহত্তম। সেবাখাত জিডিপির ৫৩ শতাংশে অবদান রাখে। নেতৃস্থানীয় ভবিষ্যবাদী বিশেষজ্ঞবৃন্দের আগাম পূর্বাভাস অনুযায়ী, একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের সেবা প্রাধান্য বিস্তার করবে। অর্থনীতি যতো আয়ের উচ্চ সোপানে উন্নীত হয়, এর সেবা খাতের পরিসরও ততো বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ওইসিডি দেশগুলোতে সেবা অর্থনীতির পরিমাণ জিডিপি'র ৭০-৮০ শতাংশ। সুতরাং এটি অনিবার্য যে, ২০৪১ এ বাংলাদেশের নিম্ন উৎপাদনশীল ও প্রধানত অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতকে ভবিষ্যতের গতিশীল ও আধুনিক সেবা খাতে উন্নীত করার ব্যাপারে সবিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে, যাতে পরিপূর্ণভাবে একটি সুসংহত বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সমান তালে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে।

৭.৫.১ বাণিজ্য সেবা খাতের কর্মসম্পাদন

এ যাবৎ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ায় রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিংকে কেন্দ্র করে শিল্পায়নে দ্রুতগতি সঞ্চারিত হয়। ফলশ্রুতিতে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে জিডিপি'তে শিল্পের অংশ অনায়াসেই কৃষিকে ছাড়িয়ে যায়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশ যে পর্যন্ত না ২০৩১ এ উচ্চ-মধ্যম-আয় দেশ হচ্ছে অন্তত পক্ষে ততদিন পর্যন্ত শিল্পই থাকবে প্রবৃদ্ধির মূল চালক। এর পরে (কিংবা এর আগেই) অর্থনীতি চালিত হবে ভবিষ্যবাদী ডিজিটাল ও শিল্প বিপ্লবের এক সংযুক্ত শক্তিদ্বারা, যেখানে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সেবা তৎপরতার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে। বৈশ্বিক বিশ্লেষকগণ স্বীকার করেন যে, পরবর্তী ২০ বছর মানব সভ্যতা এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে যেখানে প্রযুক্তি, পুঁজি ও জ্ঞানের আন্তঃসীমান্ত প্রবাহ দ্বারা চালিত ত্বরান্বিত বিশ্বায়নের এক নতুন মাত্রা দেখা দেবে এবং তা বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক উদারতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি বৈশ্বিক অবকাঠামোর মধ্যেই সংঘটিত হবে। আরো উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক মূল্য শৃংখলের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে সেবা প্রকৃতপক্ষে ম্যানুফ্যাকচারকৃত পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ-সেবার উত্থান: প্রথম সারির বাণিজ্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ যাকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করেন বৈশ্বিক বাণিজ্যের "নির্বস্তুকরণ" রূপে, সেটি হলো সেবা বাণিজ্যের উত্থান। একেবারে অতি সাম্প্রতিক কালে আমরা ভালোভাবে বুঝতে শুরু করেছি বিশ্ব অর্থনীতিতে সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে। উৎপাদন ও বাণিজ্য সেবার অবদান অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওইসিডি এবং ডব্লিউটিও'র তৈরি নতুন পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে যে, বাণিজ্যে তাদের প্রকৃত অবদানের দিক হতে যখন আমরা সেবা পরিমাপ করি। অর্থাৎ স্থূল প্রবাহের পরিবর্তে মূল্য সংযোজনের দিক হতে ২০০৯ সালে বৈশ্বিক বাজারে সেবার অংশ ছিল প্রায় অর্ধেক, যেটি ছিল পুরাতন পরিমাপ ব্যবহারে এক-চতুর্থাংশেরও কম। এটি সম্ভব হয়েছে মূলত বৈশ্বিক মূল্য শৃংখলের ক্রমবর্ধনশীল গুরুত্বের ফলে, যেখানে সেবা প্রকৃতপক্ষে ম্যানুফ্যাকচারকৃত পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করে দেখিয়ে দেয় যে, গতানুগতিক পরিসংখ্যানগত প্রদর্শনীর চেয়ে মূল্য-সংযোজনের দিক থেকে সেবা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য শুধু বড়ই নয়, তা দ্রুততর হারে বর্ধিতও হচ্ছে।

বৈশ্বিক বিশ্লেষকবৃন্দের পূর্ব দৃষ্টি অনুযায়ী ভবিষ্যৎ বিশ্বে সেবা-চালিত শিল্প প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং সুস্পষ্ট স্থায়িত্বের লক্ষ্য সংবলিত ব্যবসায় সাফল্য লাভ করবে। এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশকে এই সুযোগ নেয়ার জন্য ভবিষ্যতে সেবা বাণিজ্যের সকল বাধা দূর করতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রপ্তানি প্রতিযোগ-সক্ষমতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে বিশ্বমানের সেবা শিল্পের বিকাশ।

বাংলাদেশে সেবা খাত উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এটি শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হতে উত্থিত বর্ধনশীল চাহিদার প্রতি ভালো সাড়া দেয় নি। সেই সাথে এটি নিম্ন-দক্ষ শ্রমিকদের জন্য বিশ্ববাজারে, বিশেষ করে তৈল-সম্পদ সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে তার অবস্থান গড়ে তুলেছে। এর ফলে সূচিত হয় প্রবাসী শ্রমিকদের প্রবাসী আয়ের দ্রুত অন্তর্মুখী প্রবাহ, যা নির্মাণ তৎপরতার বিপুল চাহিদাসহ শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সেবা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। রেমিট্যান্সের এই অন্তর্মুখী প্রবাহ গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং দারিদ্র্য বিমোচনেও অবদান রাখে।

এই সেবা খাত নিজেই রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার সময়ে একটি নিম্ন-আয় উন্নয়নকামী দেশ থেকে ২০১৫ সাল একটি নিম্ন-মধ্য আয় দেশে উন্নীত হবার পথ-পরিক্রমায় এর সেবা খাতে একটানা রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনের অভিমুখ থাকে একটি প্রাথমিকভাবে নিম্ন উৎপাদনশীলতা থেকে বাণিজ্য, পরিবহন ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভাবিত নিম্ন-আয় অসংগঠিত সেবা খাত হয়ে অধিকতর সংগঠিত ও উচ্চতর-আয় বাণিজ্যিক সেবায় পরিণতি পাওয়া। জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা, আইন ও শৃংখলা, শিল্প ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সরকারি খাত কর্তৃক প্রদত্ত মানসম্মত ও সংগঠিত সেবা তৎপরতার পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও বিভিন্ন ধরনের আধুনিক বাণিজ্যিক তৎপরতা প্রবৃদ্ধি আকারে ধীরগতিতে তবে স্থিরভাবে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে। পরিবর্তনের খাতগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবা, জাহাজ পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিমান পরিবহন, গুদাম সংরক্ষণ, পর্যটন ও আতিথেয়তা সেবা। উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে সুগম করতে এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আরো দ্রুত করা প্রয়োজন।

রপ্তানিতে সেবা খাতের অবদান: সেবা খাত দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের রপ্তানির প্রধান চালক। এতে মূল অবদান রেখেছে শ্রমশক্তি ও একগুচ্ছ উপাদান-বহির্ভূত সেবার রপ্তানি। রপ্তানি আয়ের এই উৎসগুলোর গতিধারা চিত্র ৭.৭ এ প্রদর্শিত হলো। শ্রমিক রপ্তানি ও সংশ্লিষ্ট প্রবাসী আয়ের অন্তর্মুখী প্রবাহ ১৯৯০ অর্থবছরের পর হতে তীব্র গতি পায়। অন্যান্য সেবা রপ্তানিতেও সামান্য উর্ধ্বমুখী গতি পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রবাসী আয়ের অন্তর্মুখী প্রবাহ থেকে আয় অন্যান্য সেবার অবদানকে খর্ব করেছে। প্রবাসী আয় প্রবাহ ২০১৯ তে সর্বোচ্চ ১৬.৪২ বিলিয়নের উন্নীত হয়, ১৯৯০ ও ২০১৯ এর মধ্যে নামিক ডলারের দিক থেকে বার্ষিক গড় ১২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য সেবা রপ্তানি আয়ও কিছুটা পরিমিত গতিতে বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ৭.৭: ফ্যাক্টর ও নন-ফ্যাক্টর সেবা রপ্তানির গতিধারা

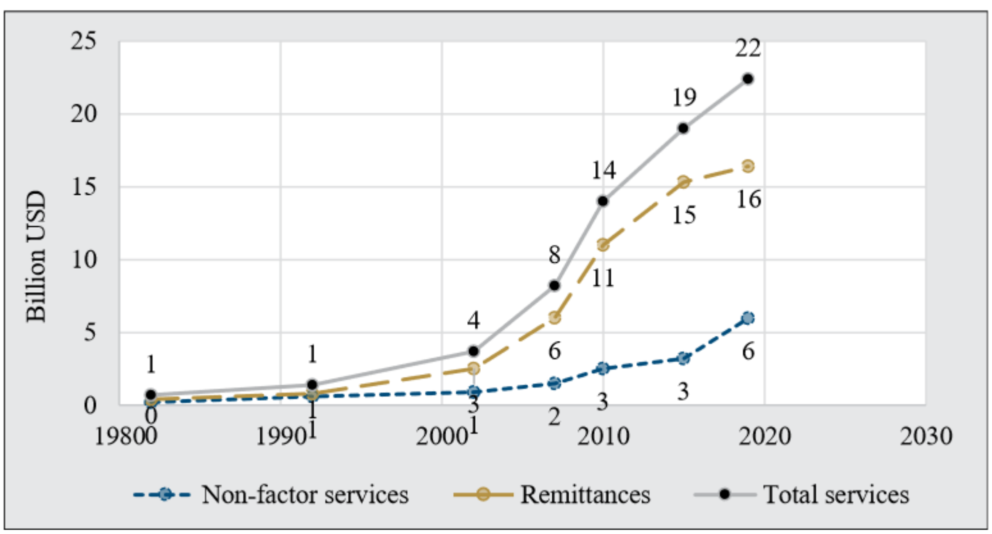

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

তৈরি পোশাক শিল্প উত্থানের পূর্বে ২০১০ পর্যন্ত সেবাই ছিল রপ্তানি আয়ের সর্ববৃহৎ উৎস (চিত্র ৭.৮)। এরপর থেকে আয়ের প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতির কারণে প্রবাসী আয় অন্যান্য সেবা থেকে আয়ের তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। জিডিপি'র অংশ হিসেবে সেবা রপ্তানি থেকে আয় ২০১০ এ সর্বোচ্চ ১২.২ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে তা ২০১৭ তে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৬.৭ শতাংশে (চিত্র ৭.৯)। এমনকি এরপরেও এটি এখনো তৈরি পোশাকের পরে রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হয়ে আছে, ২০১৭ তে মোট রপ্তানি আয়ের ৩২ শতাংশ আসে সেবা খাতের রপ্তানি থেকে।

চিত্র ৭.৮: সেবা রপ্তানির ভূমিকা

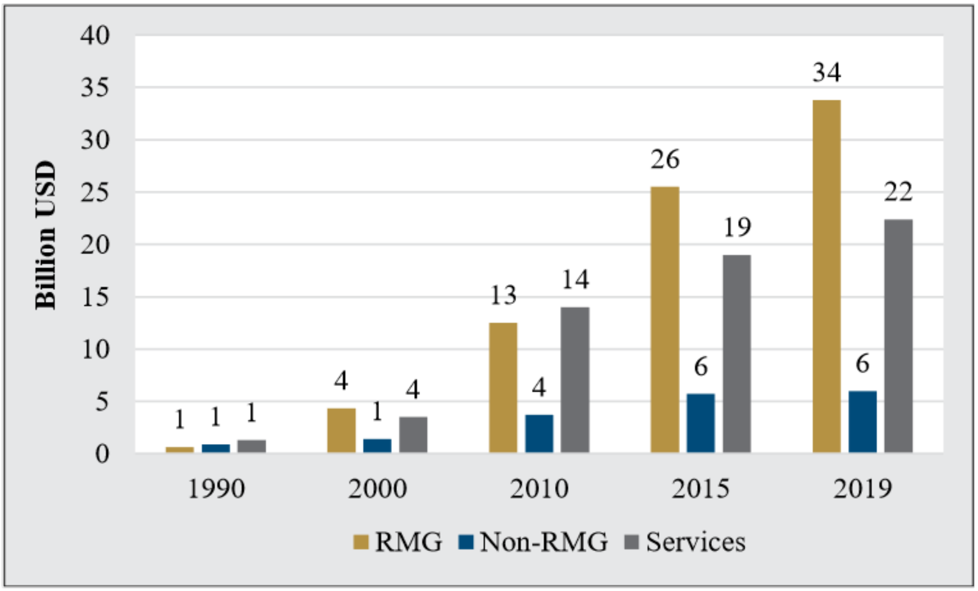

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ৭.৯: জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সেবা রপ্তানি থেকে আয়

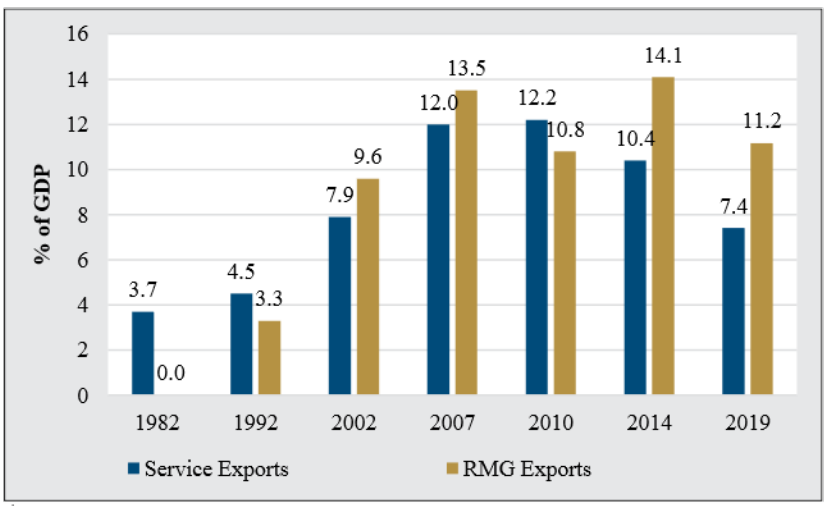

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

রপ্তানি আয়ে সেবা খাতের স্থায়ী অবদান তাই স্বতঃপ্রকাশিত। সামনে যে চ্যালেঞ্জ আসছে সেবা রপ্তানিতে সাম্প্রতিক নিম্নগামিতাকে কি করে বিপরীতমুখী করা যায় এবং এর ঐতিহাসিক গতিশীল ভূমিকা সংরক্ষণসহ অধিকতর বিস্তৃত করা যায়, বিশেষ করে, নন-ফ্যাক্টর সেবাসহ পরিবহন, ভ্রমণ, টেলিযোগাযোগ, ব্যবসায় এবং সরকারি সেবায় সমধিক প্রাধান্য প্রদানসহ, এর মোকাবেলায় এখনি প্রস্তুতি গ্রহণ দরকার। উপকরণ সেবা থেকে আয়ের সিংহভাগ বাংলাদেশে আসে বিদেশ থেকে, তাই সেগুলো গন্তব্যদেশের অভিবাসন নীতির ওপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে উপকরণবহির্ভূত সেবা হতে আয়ের সম্ভাবনা অনেকটা নির্ভেজাল ও গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণবহির্ভূত সেবার বৈশ্বিক বাজারও বিশাল। বাংলাদেশ এতে তুলনামূলকভাবে ছোট অংশগ্রহণকারী মাত্র। সঠিক নীতি গ্রহণ করে উপকরণবহির্ভূত সেবার বৈশ্বিক বাজারের একটি বড় অংশ আয়ত্তে আনা সম্ভব।

৭.৫.২ সেবা খাতের জন্য সমস্যা ও সুবিধাবলি

সেবা খাতের অতীত অর্থবহ অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশের উন্নয়নে এই খাতে অবদান অধিকতর গতিশীল করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে প্রবৃদ্ধি ও ন্যায্যতার দিক থেকে। ২০৩১ সালের মধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয় থেকে উচ্চ-মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য উচ্চাভিলাসী অভিযাত্রার সফল সমাপনী নিশ্চিত করতে সেবা খাতের মান ও উৎপাদনশীলতা বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে, কেননা এখান থেকেই প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়তা আসবে।

এই অভিযাত্রাকে সুগম করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বিষয় ও সমস্যা আছে যার সমাধান হওয়া জরুরি। প্রথমত, সেবা খাত আধুনিকায়নে বেশ খানিকটা অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও এতে এখনো অসংগঠিত তৎপরতার প্রাধান্য রয়েছে, যেখানে উৎপাদনশীলতা ও আয় নিম্ন। কৃষির বাইরে শ্রমশক্তির বেশিরভাগই যাদের গরিব বিবেচনা করা হয়ে থাকে মূলত তারাই গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের এই সকল নিম্ন-উৎপাদনশীলতা ও নিম্ন আয়ের অসংগঠিত সেবা উৎপাদনের সাথে জড়িত। দ্বিতীয়ত, কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচারিং-এর চেয়ে সেবা খাতের দক্ষতা-ভিত্তি কিছুটা উন্নত হলেও এখনো নিম্ন। অসংগঠিত নিম্ন উৎপাদনশীল এ খাতের নিম্ন আয় তৎপরতার প্রাধান্যে এটি প্রকাশ পায়। তৃতীয়ত, শ্রম সেবার রপ্তানি আয় থেকে অত্যন্ত ভালো ফলাফল পাওয়া গেলেও এনএফএস থেকে রপ্তানি আয়ের পরিকৃতি সম্ভাবনার তুলনায় তা অনেক নিম্নে। চতুর্থত, একটি আধুনিক ও গতিশীল সেবা খাতের সুফল পরিপূর্ণভাবে আহরণ করতে হলে আধুনিক সেবা সুবিধার বিস্তারে সহায়ক নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করা দরকার।

সারণি ৭.২ এ সেবা খাতের কাঠামো উপস্থাপন করা হলো। বাণিজ্যই প্রধান সেবা তৎপরতা, যা ১৯৭৪ এবং ২০১০ এর মধ্যে মোট জিডিপি'র চেয়েও দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং জিডিপি'তে এর অংশ গিয়ে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশ। বাণিজ্যিক তৎপরতার ক্রমবর্ধনশীল গুরুত্ব এই তথ্য দ্বারা পরিমাপ করা যায় যে, ২০১৭ তে জিডিপি'তে এর অংশ জিডিপি'তে কৃষি ও বনের মিলিত অংশকে ছাড়িয়ে যায়।

সারণি ৭.২: সেবা খাতের কাঠামো (জিডিপির % হিসেবে)

কার্যক্রম	অর্থবছর					
	১৯৭৪	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১০	২০১৯
বাণিজ্য	৯.৩	১১.০	১১.৮	১২.৮	১৪.০	১৩.৩৪
পরিবহন	৪.২	৮.১	৮.৭	৮.১	৮.৯	৯.৩৪
টেলিযোগাযোগ	০.২	০.২	০.৪	০.৮	২.১	১.১০
আর্থিক সেবা	১.০	১.৫	১.৫	১.৫	২.৯	৩.৮৯
রিয়েল এস্টেট	৪.৯	১০.২	৯.৭	৮.৫	৭.৬	৭.৮৭
জন প্রশাসন	১.০	১.৫	২.০	২.৫	৩.৩	৪.০৯
শিক্ষা	১.৬	২.১	১.৯	২.১	২.২	৩.০২
স্বাস্থ্য	১.২	২.৫	২.৩	২.১	২.০	২.১৫
হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.২	০.৫	০.৬	০.৬	০.৮	১.০৪
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সেবা	৬.২	১০.৭	৯.৫	৭.৮	১১.১	১০.৭৮
মোট সেবা	**৩০.৯**	**৪৮.৩**	**৪৮.৪**	**৪৬.৮**	**৫৪.৯**	**৫৫.৫৩**

উৎস: বিবিএস

সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সেবা। ব্যক্তিগত সেবার বিস্তার ঘটেছে একটি প্রাণবন্ত বাংলাদেশি অর্থনীতির প্রত্যক্ষ সুফল ও বিপুল পরিমাণ প্রবাসী আয়ের অন্তর্মুখী প্রবাহের কারণে। ব্যক্তিগত সেবায় যুক্ত হয়েছে বিভিন্নমুখী চাহিদা যেমন, মোটর ড্রাইভার, পানির মিস্ত্রি, অনানুষ্ঠানিক বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি, সেলাইয়ের দরজি, গৃহকর্মী, হেয়ার ড্রেসিং, বিউটি সেলুন ও পার্লার এবং এরকম অসংখ্য সেবাসুবিধা বাংলাদেশের সকল শহরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো উচ্চ আয়ের মেট্রোপলিটান নগরগুলোতে। এই সকল সেবার জন্য চাহিদার উচ্চ-আয় সহিষ্ণুতা ও পর্যাপ্ত সরবরাহ এই সেবাকে আয় ও কর্মসংস্থানের একটি অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল উৎসে পরিণত করছে।

তৃতীয় প্রধান সেবা তৎপরতা হলো পরিবহন খাত। বাংলাদেশে নৌপথের বিশাল নেটওয়ার্ক থাকায় গ্রামীণ পণ্যসামগ্রীসহ সাধারণ মানুষের চলাচলে নদী পথে পরিবহন প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃজনের দিক থেকেও এটি একটি গতিময় উৎস হতে পারে। সড়ক যোগাযোগের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ ও রেলপথে মালামাল পরিবহন সেবার সীমিত সক্ষমতার প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন ব্যাপক ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প সুবিধা দিয়ে থাকে।

বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমানের দুর্বল পরিকৃতি। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পর্যায়ে বিমান পরিবহনের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ জাতীয় বাহন বাংলাদেশ বিমানের সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা অনেক। এর ফলে বিমানে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য যে বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে তার সুফল আহরণে ব্যর্থ হতে হয়। উচ্চ পরিকৃতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বাহনগুলো, বিশেষ করে এমিরেটস, ইতিহাদ ও কাতার এয়ারওয়েজ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের বাজার অংশের বেশিরভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার নিম্ন মূল্যসংযোজন এই সেবা খাতগুলোর প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, খানিকটা উদ্বেগপূর্ণ উন্নয়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার অপর্যাপ্ততা মানসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং ও উচ্চ-মূল্য-সংযোজিত সেবা রপ্তানির বিস্তারে প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক স্বাস্থ্যগত অর্থায়ন সুবিধার অভাব, যেমন স্বাস্থ্য বিমা, উচ্চতর মূল্য সংবলিত স্বাস্থ্য সেবার অধিকতর দ্রুত বিস্তারে একটি বড় বাধা।

সেবা খাতের মূল্য সংযোজনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যা এখনো সরাসরি প্রতিফলিত হয় নি, তা হলো পর্যটনের ভূমিকা। পর্যটনের আন্তর্জাতিক ভ্রমণ-সংশ্লিষ্ট সুফল আহরিত হয় ভ্রমণ-ভাড়ার মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্যের সেবা হিসাবে, পর্যটন সংশ্লিষ্ট অপরাপর দিকগুলো যেমন আতিথেয়তা সেবা ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন এর সুফল পায় পরিবহন, হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলো। এছাড়াও রয়েছে বিপুল পরিমাণ অপ্রত্যক্ষ পর্যটক-সংশ্লিষ্ট সুফল, যেখানে পর্যটকদের ভ্রমণ, হোটেলে অবস্থান, খাদ্য ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় পণ্য ও সেবা ক্রয়ে ব্যয়নির্বাহ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, পর্যটনের বহুগুণ সুফল ব্যাপক হতে পারে যেমনটি পরিলক্ষিত হয় থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার মতো অর্থনীতিতে পর্যটনের ভূমিকায়।

অর্থনীতিতে উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত সেবার অবদান বিস্তারের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও সেবা কার্যক্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আরো সাধারণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পেশাসম্পৃক্ত ও দক্ষতা-ঘন সেবা যেমন ব্যাংকিং, আর্থিক সংস্থা, আইসিটি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, শিপিং, বিমান পরিবহন- এগুলো উচ্চ-উৎপাদনশীল, উচ্চ-আয় কর্মকাণ্ড। সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধি সত্তেও এই সকল কার্যক্রমের ভূমিকা এখনো সীমিত। অন্যান্যসেবা যেমন বাণিজ্য, পরিবহন এবং ব্যক্তিগত সেবায় ভালো অগ্রগতি হলেও সাধারণভাবে এগুলোতে নিম্ন উৎপাদনশীলতা, নিম্ন-দক্ষতা ও অসংগঠিত কর্মতৎপরতার প্রাধান্য চোখে পড়ে।

বাংলাদেশকে একটি নিম্ন-মধ্যম-আয় দেশের মর্যাদায় উন্নীত করতে সেবা খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য প্রয়োজন অধিকতর শক্তিশালী অর্জন। যেমনটি বলা হয়েছে, অধিকতর উন্নয়নের জন্য অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে শ্রম-বহির্ভূত সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে, পর্যটনে, তথ্য-প্রযুক্তিতে এবং বাণিজ্য, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার আধুনিকায়নে।

৭.৬ একটি পরিণত অর্থনীতির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যাতে সকল মানুষের মধ্যে বন্টিত হয়, তা নিশ্চিত করতে কর্মসংস্থানের দিকে থেকে প্রবৃদ্ধির ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান যেহেতু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সঞ্চালনে এবং এভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে (তৎসহ দারিদ্র্য নিরসনে ও আয়ের উন্নত বন্টনে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই দেশে বিদ্যমান কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট সমস্যার প্রকৃতি ও বিশালতা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন এবং পরীক্ষণলব্ধ ফলাফলের আলোকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল ও নীতিমালা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

৭.৬.১ কর্মসংস্থান প্রক্ষেপণ ও সম্ভাবনা

কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ও সমস্যার দিক হতে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখার উদ্দেশ্যে ২০৪১ সাল পর্যন্ত সময় পরিধিকে দুটি বড় পর্যায়ে ভাগ করে নেয়া যায়ঃ এর প্রথম পর্যায়টি হবে ২০৩১ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে ২০৩১ সালের পর থেকে। উল্লেখ্য যে, ২০৩০ সাল হলো এসডিজি অর্জনের সমাপনী বছর এবং এসডিজি'র অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো "পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান"। বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অর্থ এই যে, দেশে প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত শ্রম ঐ সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হবে। এই সন্ধিক্ষণটিতে আসার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির মধ্যে সংযোগ ব্যবহার করে।

কর্মসংস্থান সমস্যার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে যখন সন্ধিস্থলে পৌঁছার লক্ষ্য অর্জিত হবে, যেটি ২০৩১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। ততোদিনে অর্থনীতিও উচ্চ-মধ্যম-আয়ের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং উচ্চ-আয় মর্যাদা অভিমুখী পথে এসে পড়বে। এই সময় পরিধির জন্য (অর্থাৎ ২০৩১ থেকে ২০৪১) কর্মসংস্থান সমস্যার বিষয়টি মানগত ও পরিমাণগত উভয় দিক হতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রতি বছর ২.২৮ শতাংশ হারে শ্রমশক্তি যুক্ত হবে এবং অর্ধ মিলিয়নের বেশী কর্মীর কর্মসংস্থান হবে বিদেশে - এটি ধরে নেয়া হলে, ২০৩১ সালের মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমের পূর্ণ সদ্ব্যবহারকল্পে নতুন যুক্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন হবে ২০১৫-১৬ থেকে ২০৩০-৩১ মেয়াদে বছরে ১.৯৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে প্রক্ষেপণকৃত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশ হারে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন করতে কর্মসংস্থানের সহিষ্ণুতাকে হতে হবে প্রায় ০.৩। বাস্তব অর্থে, এর জন্য প্রয়োজন হবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এই প্রবৃদ্ধিতে মূল চালকের ভূমিকা পালন করবে যেখানে বছরে ১৫ শতাংশ হারে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বছরে ৯ শতাংশের পরিসরে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রমঘন শিল্পায়নে সাফল্য লাভের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এটি অবশ্যই রূপায়ণযোগ্য। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা এবং অবশ্যই তৈরি পোশাক শিল্পের সমান্তরালে, আরো বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমঘন শিল্পের, যেমন জুতা (চামড়া ও অ-চামড়া উভয়ই), চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক, ফার্নিচার প্রভৃতি, আরো দ্রুত বিকাশ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ ২০৩১ থেকে ২০৪১ এ, শ্রমশক্তি প্রবৃদ্ধি আরো হ্রাস পাবে। শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ১.৫ শতাংশ (সাম্প্রতিক অভিগম্যতার ভিত্তিতে নির্ণয়কৃত) অনুমান করে এবং ২০৩১ সালের জন্য ভিত্তি সংখ্যা হিসেবে ৮৫.২ মিলিয়ন ব্যবহার করে ২০৪১ সালের জন্য প্রাক্কলিত শ্রমশক্তির পরিমাণ হবে ১০০.৩৬ মিলিয়ন। এর অর্থ হবে, ২০৩১ হতে ২০৪১ পর্যন্ত প্রতিবছর যুক্ত হবে ১.৩৮ মিলিয়ন। ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রবাসে বর্তমানে মোটামুটিভাবে শ্রমশক্তির (০.৭ মিলিয়ন) ১ শতাংশ প্রবাসে কর্মরত।

তাহলে এটি বেরিয়ে আসে যে, বছরে প্রায় এক মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের চাহিদা রয়েছে। যদি বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় (প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রক্ষেপণ) এবং কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা ০.২ এর নিচে না নামে, তাহলে অর্থনীতির পক্ষে বছরে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি সম্ভব (প্রায় এক মিলিয়ন চাহিদার বিপরীতে)। যদি এমনটি হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে শ্রম ঘাটতি সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে (প্রবাসে কর্মসংস্থান বিবেচনায় নিয়ে)। বাস্তবিক অর্থে, এমনকি যখন অর্থনীতি পরিণত হয়, কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা তখনো ০.২ এর বেশ উপরে থাকতে পারে (সম্ভবত ০.৩ এর মধ্যে)। সেক্ষেত্রে এমনকি শ্রম বাজার আরো সচল হয়ে উঠতে পারে। এই প্রাক্কলনগুলো থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, বার্ষিক প্রায় ৮ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা সম্ভব। এভাবে, এমনকি প্রবৃদ্ধি বা এর কর্মসংস্থান সৃজন সম্ভাবনায় কোন ধরনের বিপর্যয় ঘটলেও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দ্বিতীয় দশকে প্রায় পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্পন্ন অর্থনীতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

৭.৬.২ একটি কর্মসংস্থান কৌশল অভিমুখে

কর্মসংস্থান-ঘন প্রবৃদ্ধির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলে নিম্ন উপাদানাবলি অন্তর্ভুক্ত হবে: প্রথমত, যে কোন দেশের জন্যই একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান কৌশল নির্ধারণের কাজ একটি দুঃসাহসী উদ্যোগ, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য। কেননা বাংলাদেশকে এই মেয়াদে পরিবর্তনের একাধিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একে

এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ এ সময় উদ্বৃত্ত শ্রম নিঃশেষের এক জটিল সন্ধিক্ষণে উপনীত হবে এবং একটি টানটান শ্রম বাজার ব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কর্মসংস্থান কৌশলে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হতে হবে। অব্যাহত উদ্বৃত্ত শ্রমের পর্যায়ে, প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত খাতগুলোতে কর্মসংস্থানের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সহ কাঠামোগত পরিবর্তনের ওপর। এর পরের পর্যায়ে, কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব বজায় থাকবে যাতে উন্মুক্ত বেকারত্ব বাড়তে শুরু না হয়। তদুপরি পরিণত অর্থনীতিতে যেহেতু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়নের পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় নিম্নতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, প্রবৃদ্ধি যাতে কর্মী বা চাকুরিগ্রাসের প্রবৃদ্ধি না হয়ে পড়ে। অনেক উন্নয়নশীল দেশেই বিভিন্ন সময়ে এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের শ্রম বাজারের বৈশিষ্ট্য হলো এতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের অনুপাত অতি উচ্চ। যদিও অর্থনীতির এই অংশে কাজের ধরনে ও মানে প্রচুর বিভিন্নতা রয়েছে, এই ধরনের কাজগুলোর বৈশিষ্ট্যই হলো নিম্ন উৎপাদনশীলতা, নিম্ন আয় এবং সকল প্রকার সামাজিক সুরক্ষার অভাব। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো এমন যে, তা উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং অর্থনীতির অনানুষ্ঠানিক অংশকে বিবেচনায় নিয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, এবং যেটি পূর্ববতী বিষয় সংশ্লিষ্ট, তাহলো মানসম্মত কাজ, শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা এবং মুনাফা/আয়ের দিক থেকেই নয় বরং সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতা সহ যে পরিবেশে কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে, এবং কর্মস্থলে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রকাশে শ্রমিকদের সক্ষমতা থাকার দিক থেকেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

চতুর্থত, শ্রম বাজারে সরবরাহের দিক থেকে, শ্রমশক্তির শিক্ষা ও দক্ষতা বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর সবিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেই প্রেক্ষাপটে, উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রম বাজারের চাহিদার দিকটিও ভাবনায় রাখা প্রয়োজন। দেশে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনীতিতে অধিকাংশ কাজের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মানের শিক্ষাই পর্যাপ্ত হতো। তবে দেশ যখন স্বল্পব্যয়ে পর্যাপ্ত শ্রম প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নির্মিত তুলনামূলক সুবিধার পর্যায় থেকে বেরিয়ে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা ভিত্তিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন শুধুমাত্র জ্ঞানসর্বস্ব দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক নয়, বরং উচ্চতর পর্যায়ের মানব পুঁজি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। সুতরাং মানব পুঁজি উন্নয়ন কৌশলকে অবশ্যই একটি অর্থনীতির পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং সেটি হবে এমন এক অর্থনীতি যাকে জটিল রূপান্তরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে।

পঞ্চমত, উন্নয়নের উচ্চতর পর্যায়ে যখন শ্রম বাজার প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত শ্রমের ব্যবহার সম্পন্ন করবে, তখন কর্মসংস্থান সমস্যার প্রকৃতিতে পরিবর্তন সূচিত হবে। এই পর্যায়ে কর্মসন্ধানীদের সাথে প্রাপ্তব্য কর্মের চাহিদায় মিল ঘটানোই হয়ে উঠবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রম বাজারে বেকারত্বের একটি বড় অংশ দেখা দেবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, কর্মসংস্থান সেবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব এখনকার চেয়ে আরো বেশি হবে। তবে এই ব্যবস্থার প্রস্তুতি এখনি নিতে হবে।

একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান কৌশল প্রণয়নে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অধীনে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও অটোমেশনের সম্ভাবনার বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে। চাকুরিগ্রাসের ভীতিকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে না নিয়ে একটি কর্মমুখী নীতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে যাতে নতুন ও উন্নততর কর্মের ইতিবাচক দিকগুলো থেকে অর্থনীতি লাভবান হতে পারে।

অনানুষ্ঠানিক খাত: অনানুষ্ঠানিক খাতের তিনটি দিকের ওপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন: (১) উৎপাদনশীলতা, মজুরি ও আয়, (২) অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোগসমূহ যে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখী হচ্ছে, এবং (৩) কাজের অবস্থা ও সামাজিক সুরক্ষা। শ্রম নিঃশেষের প্রথম পর্যায়ে প্রথমোক্ত দু'টি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া দরকার, যদিও তৃতীয়টি একেবারে অবহেলা করা ঠিক হবে না। তবে, অর্থনীতি যখন উচ্চ-মধ্যম-আয় মর্যাদায় উন্নীত হবে, তখন কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা সহ যে অবস্থায় কাজ পরিচালিত হয় সেদিক হতে কাজের মানকে এমন একটা পর্যায়ে নিতে হবে যা তার আয়-মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এই লক্ষ্যে কাজ এখনি শুরু করতে হবে। দুর্বল স্বাস্থ্য ও বার্ধক্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য উদ্ভাবনমূলক ব্যবস্থা সহযোগে এর সূচনা হতে পারে।

যুব কর্মসংস্থান: যদিও সাধারণভাবেই কর্মসংস্থান সমস্যার মোকাবেলা করা প্রয়োজন তবে বিভিন্ন কারণে যুব সম্প্রদায় বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। আমাদের দেশে একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো যুব শ্রমশক্তির দ্রুত বৃদ্ধি।

যুবকরা স্বভাবতই ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন ও উদ্ভাবনের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে থাকে। একটি দেশে যুব শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধিকে জনমিতিক লভ্যাংশের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি ইতিবাচক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় - অবশ্য যদি যুবকদের (কাজের বয়সী মানুষদের) মানব পুঁজিতে রূপান্তরিত করে উৎপাদনশীল কাজে কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা যায় এবং সেই সাথে চাকুরিতে প্রথম ঢোকার প্রাক্কালে বা আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যুবকদের যে সকল সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, সেগুলোর সমাধান সম্ভবপর হয়। আরেকটি জটিল সমস্যা হলো শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অর্জিত দক্ষতার সাথে কর্মজগতের চাহিদার বিশাল ব্যবধান। স্বল্প যুব-বেকারত্ব সংবলিত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সমন্বয় করতে হবে এবং সেই সাথে একটি শক্তিশালী শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা সহ ঋণ ও বাজার সহায়তা সহ উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং চাকুরি-প্রার্থী ও চাকুরিদাতাদের সম্মিলনীর জন্য শ্রম বাজার মধ্যবর্তিতার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। গণপূর্ত কর্মসূচি থেকে ধারণা নিয়ে তবে চাকুরি সন্ধানীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ধরনে পরিবর্তন এনে যুবকদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি সক্রিয় শ্রম বাজার নীতির মাধ্যমে এ ধরনের সকল ব্যবস্থাকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা লাভজনক হবে। এই শ্রেণীর ব্যবস্থা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে অর্থনীতির পরিপক্কতার সাথে। তবে তা এখনি শুরু করা যুক্তিযুক্ত হবে।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হবে নারী-পুরষ নির্বিশেষে জাতির যুবসমাজের উন্নয়ন। এদের একটি দক্ষ কর্মশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। টিভেট-এর অধীনে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাসহ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তৃণমূল পর্যায়ের তরুণ ও তরুণীদের প্রয়োজনীয় সহায়তাদান সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশের সকল জেলায় কর্মী নিয়োগ সংস্থা ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস স্থাপন করা হবে এবং পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দান করা হবে।

নারী কর্মসংস্থান: অর্থনীতির বর্তমান স্তরে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে তা হলো শ্রমশক্তিতে এদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করা। এ জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে - যা তাদের কাজের জন্য অধিকতর নমনীয় এমন খাতের (যেমন, তৈরি পোশাক, সুতা, ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতির মতো শ্রমঘন শিল্পগুলোতে) প্রবৃদ্ধি বিস্তার থেকে শুরু করে তাদের কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত স্থাপনা সহ কর্মস্থলের যাবতীয় বাধাবিপত্তির অপসারণ পর্যন্ত বিস্তৃত। নারীবান্ধব বিভিন্ন তৎপরতার পাশাপাশি বেশ কিছু চলক রয়েছে, যা শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে; এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিক্ষা, প্রজনন হার, ইতিবাচক তৎপরতা ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির মতো অন্যান্য ব্যবস্থা। বিশ্ব ব্যাংকের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ হার বর্তমান ৩৩ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে এ উন্নীত করা গেলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অতিরিক্ত এক শতাংশীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

৭.৬.৩ মানব পুঁজি উন্নয়নের জন্য কৌশল

মানব পুঁজি বিনির্মাণের জন্য একটি সমন্বিত কৌশলকে একই সঙ্গে সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসংস্থান কৌশলের অংশ হতে হয়। কেননা মানব পুঁজি শুধু প্রবৃদ্ধি সমীকরণেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়, বরং কর্মসংস্থান কৌশলে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হবে এর নিয়োগযোগ্যতা। একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে। তবে অর্থনীতি উচ্চ-মধ্যম-আয় অবস্থানের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে মানব পুঁজি উন্নয়নের আরো বিভিন্ন দিকগুলোতে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার সাথে উন্নতমানের সাধারণ শিক্ষার সংমিশ্রণ, যা শুধুমাত্র শ্রম বাজারের জন্য সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা অধিকতর দক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিকেও মজবুত করে। পূর্ববর্ণিত কর্মসংস্থান সমস্যার প্রথম পর্যায়ের মেয়াদে, সকল পর্যায়ে ও সকল ধরনের শিক্ষায় এখন মানোন্নয়ন এবং মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার অধিকতর বিস্তারের ওপর সমধিক জোর দিতে হবে। একই সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষাকেও এগিয়ে নিতে হবে যাতে তা একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে পারে। যেখানে যন্ত্রবিদ্যা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উভয়েরই চাহিদা হবে ব্যাপক। এ ধরনের শিক্ষা ও দক্ষতার সাথে মানব সম্পদের চাহিদার পরিমাণগত প্রক্ষেপণ করা যেহেতু বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই প্রবৃদ্ধির একই পথের মধ্যে দিয়ে যে দেশগুলো ইতোমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে বা এখনো অগ্রসরমান, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে মূল্যবান নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

৭.৬.৪ বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের উপর প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও স্বয়ংক্রিয়তার প্রভাব:

বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, এর মূল বৈশিষ্ট্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রোবট ব্যবহার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি। এদিক থেকে সাধারণ ধারণা এই যে, এটি মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক

হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। এমনকি বাংলাদেশে, যেখানে অর্থনীতি এখনো উদ্বৃত্ত শ্রমের বিদ্যমানতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত, সেখানেও রোবট ঢুকে পড়ছে। কেউ যদি এখন থেকে কয়েক দশকের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত গ্রহণ করে তবে যে দৃশ্যকল্পগুলো প্রতিভাত হবে তা নিম্নরূপ: (১) বস্ত্র শিল্প, তৈরি পোশাক, জুতা প্রভৃতি উৎপাদনের কারখানাগুলোতে মানুষের পরিবর্তে প্রধান কাজগুলো করছে রোবট, (২) বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য খুচরা দোকানের পরিবর্তে হাতে গোনা কয়েকটি বিপণনকেন্দ্র থাকবে যেখানে পণ্যসামগ্রীর ব্যবস্থায় থাকবে একদল রোবট। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বেছে নেবে এবং স্বয়ংক্রিয় বহির্গমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে, (৩) অনলাইনে খুচরা বিক্রেতারা অধিকাংশ খুচরা স্টোরের বিপণনকেন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তাদের পণ্যাগার প্রাথমিকভাবে রোবটদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং এভাবে স্বয়ংক্রিয়তা কার্যকর হবে ।

এই শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য প্রত্যাশিত দৃশ্যকল্প খুঁজতে গিয়ে উন্নয়নের তথাকথিত "উড়ন্ত হংস মডেল" প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যেখানে একটি অগ্রগামী বলাকাকে অনুসরণ করে পেছনের কিছু বলাকা। আর এভাবেই শ্রমঘন শিল্পপণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানিতে তুলনামূলক সুবিধা এক দেশ হতে অন্য দেশসমূহের কাছে বদলি হয়। এই মডেলের মূল ভাষ্যে জাপান ছিল অগ্রগামী বলাকা, যাকে দ্বিতীয় সারিতে অনুসরণ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশ এবং এই ঝাঁকে যুক্ত হয়েছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড। এই মডেল বিস্তৃত হতে পারতো দ্বিতীয় সারিতে চীনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তৃতীয় সারির দেশগুলোকে অনুসরণ করতে পারতো ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলো।

একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (অটোমেশন) যুগে তারুণ্য প্রধান জনসংখ্যা সহ বাংলাদেশের মতো একটি উত্থানশীল অর্থনীতির জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃজন একটি উদ্বেগের বিষয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে বিদ্যমান উন্নয়ন মডেলগুলোর কয়েকটি পাল্টে ফেলতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করে। এর কারণ এ ধরনের অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য উন্নয়ন-হাতিয়ার হিসেবে স্বল্পব্যয় শ্রম তার সক্ষমতার কিছুটা হারিয়ে ফেলতে পারে। বস্তুত স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তিন ধরনের উপাদানের ওপর নির্ভরশীল - কারিগরি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। একটি নির্দিষ্ট দেশে সংশ্লিষ্ট উপাদান কিভাবে বিকশিত হবে এ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তবে একটি দেশের অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অবস্থা থেকে একটি অর্থবহ অন্তর্দৃষ্টি লাভ সম্ভব।

পূর্ববর্ণিত উপাদান ও প্রশ্নাবলি বিবেচনায় রেখে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যে সুযোগ এবং সেই সাথে যে উদ্বেগ, ভীতি ও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো সনাক্ত করা সম্ভব। সারণি ৭.৩ এ এগুলোর রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৭.৩: কর্মসংস্থানের ওপর স্বয়ংক্রিয়করণের প্রভাব: বাংলাদেশের সুবিধা, উদ্বেগ ও সমস্যা

সুবিধাবলি	বিপদ / উদ্বেগ	সমস্যাবলি
• উদ্বৃত্ত অদক্ষ শ্রম নিঃশেষিত হলে, শ্রম ঘাটতির ফলে সৃষ্ট বাধা উত্তরণে নির্বাচিত স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে। • নতুন কার্যাবলি, যেমন তদারকি, মেরামতি ও সংরক্ষণ, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে পারে। • নতুন প্রযুক্তি সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি দ্বারা পণ্যের মূল্য কমিয়ে আনতে পারে, ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানেও এর সুফল সঞ্চারিত হয়। • শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা তৈরি করতে পারে, যা চাহিদা, ফলন ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। • কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজের একঘেয়েমি হ্রাস করতে পারে। • উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ও আয়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত তৎপরতা সহ বিভিন্ন খাতের প্রতি অর্থনীতির কাঠামোতে অটোমেশন ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিতে পারে।	• রাজস্ব পরিমাপের মাধ্যমে যন্ত্রপাতির মূল্য কৃত্রিমভাবে কমানোর মতো দুর্বল নীতিমালা সময়ের আগেই অটোমেশনের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং এভাবে উদ্বৃত্ত শ্রম নিঃশেষ হবার আগেই কর্মহানি ঘটতে পারে। • ব্যয় কমিয়ে এনে, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নের উচ্চতর পর্যায়ে দেশগুলোকে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা এনে দিতে পারে - এভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি-চালিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিপন্ন হতে পারে। • আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতা পূর্ববর্ণিত অনুরূপ নীতিমালা গ্রহণে সরকারকে প্রলুব্ধ করতে পারে। • স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের সক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পোদ্যোগও প্রতিযোগিতায় আকৃষ্ট হয়ে এতে যুক্ত হতে পারে - যা পরিণতিতে কর্মসংস্থান বিরূপ প্রভাব ফেলবে। • দক্ষ শ্রমিকদের জন্য চাহিদা যখন বৃদ্ধি পায়, অদক্ষ-শ্রমিকদের তখন সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। এর ফলে প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের মজুরি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়, যা আয় বৈষম্য বৃদ্ধির গতিধারাকে তীব্রতর করে।	• দেশের অর্থনৈতিক ও শ্রম বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে যথোপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন। • স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার ফলে কিছু সংখ্যক শিল্পোদ্যোগ যাতে হারিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রয়োজন। • শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নীতিমালা এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে দেশ নতুন প্রযুক্তি সাথে সাবলীলভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

ভবিষ্যতের একটি ডিজিটাল ও বিশ্বায়িত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য ও শিল্প আধুনিকায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার দুই দশক ব্যাপী কর্মসংস্থান ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার। সমন্বিত কর্মসংস্থান কৌশলে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও শ্রম বাজার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সংযোজন আবশ্যক হবে। এ ধরনের নীতির শুরু হবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে যা সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার প্রথাগত ক্রিয়াকলাপের বাইরেও তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কী ঘটছে, বা ঘটতে যাচ্ছে সে ব্যাপারেও যথাযথ বিবেচনায় রাখে। অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার অর্জনের জন্য তখন মুদ্রা, অর্থ, বাণিজ্য, বিনিময় হার ও শিল্প নীতিমালার সমন্বিত ব্যবহার হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ।

একটি উন্নত ও পরিণত অর্থনীতির মর্যাদা অর্জনের এই অভিযাত্রায় নীতিপ্রণেতাদেরও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির চ্যালেঞ্জ ও শ্রম বাজারে এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো উন্নত ও শক্তিশালী করা হবে, যাতে এর ইতিবাচক দিক হতে অর্থনীতি ও কর্মশক্তির সদস্যবৃন্দ, কর্মধ্বংসের অপশক্তির অসহায় শিকার না হয়ে লাভবান হতে পারে।

৭.৬.৫ অব্যাহত অভিযাত্রা

ভবিষ্যতের বিশ্ব অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প ডিজিটাল হতে যাচ্ছে। বিশ্বের চারদিকে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সংঘটিত হচ্ছে সেগুলো দ্রুততার সাথে গ্রহণ করে বাংলাদেশকেও তার শিল্প ও বাণিজ্য সহ একটি ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ, নিম্ন-মধ্যম-আয় মর্যাদায় অর্থনীতির অগ্রযাত্রার সমান্তরালে। এই বাস ধরতে না পারার কোন অবকাশ নেই। এই পরিকল্পনায় এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মানব পুঁজিতে এ বিনিয়োগে পেছনে পড়লে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের-দেশের মর্যাদা অর্জনের সম্ভাবনা দেশের হাত থেকে ফসকে যাবে।

উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ আজকাল সেই পুরাতন ‘বাস্কেট কেস’ এর তকমা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রায়শই বাংলাদেশকে উন্নয়নের ‘পোস্টার শিশু’ হিসেবে তুলে ধরেন। পরবর্তী ২০ বছর যে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও বিস্তার সংঘটিত হবে তাকে ধারণ করে বাংলাদেশ ২০২০ ও ২০৩০ এর দশকের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে ২০৪০ এর দশকে উচ্চ-আয়ের-দেশে উন্নীত মর্যাদায় যুক্ত হয়ে আরেকটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি সম্ভব। নোবেল বিজয়ী মাইকেল স্পেন্স-এর ভাষ্য অনুযায়ী, প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক সময় অবধি পণ্য ও সেবার বৈশ্বিক প্রবাহ কখনো স্থির থাকেনি। বৈশ্বিক অর্থনীতির সক্ষমতা প্রভাবের কারণে এখন বিভিন্ন দেশের জন্য বার্ষিক ৭, ৮, ৯ ও ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। অর্থাৎ, অর্থনীতি যত দ্রুত বৃদ্ধি পায় তা ততো বিনিয়োগ করতে পারে। আর সেই সাথে অবশ্যই তার খানিকটা প্রতিযোগ-দক্ষতা থাকা দরকার। বাংলাদেশ শ্রমঘন পণ্যে তার প্রতিযোগ-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। এটি জ্ঞান ও দক্ষতা ঘন প্রবৃদ্ধি শুরুর পরবর্তী দশকের জন্য বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার ভিত্তি হয়ে থাকবে। এভাবে বাংলাদেশকে এখনি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় সেই রূপান্তর অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

অর্থনীতি আয়ের উন্নীত সোপান বেয়ে এগিয়ে চলার পথে যে রূপান্তরগুলো সংঘটিত হবে তা নিম্নরূপ:

- ***কাঠামোগত পরিবর্তন:*** জিডিপি’তে শিল্পের অংশ ২০২০ এ ৩৩ শতাংশ যা ২০৩১ এ উপনীত হবে ৪০ শতাংশে, তারপর ২০৪১ এ কমে গিয়ে হবে ৩৩ শতাংশ ; সেবার ক্ষেত্রে ২০২০ এ জিডিপি’র ৫৪ শতাংশ অর্থনীতির প্রধান অংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪১ এ জিডিপি’র ৬২ শতাংশে উন্নীত হবে। অধিকাংশ উন্নত অর্থনীতিগুলোর মতো, কৃষির অবদান সংকুচিত হয়ে ২০৪১ এ জিডিপি’র মাত্র ৫ শতাংশে এসে দাঁড়াবে।
- ***চতুর্থ শিল্প বিপ্লব:*** তৈরি পোশাক ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় রপ্তানিতে বৈশ্বিক অংশগ্রহণকারী হিসেবে অবস্থান ধরে রাখতে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (আইওটি, থ্রিডি প্রিন্টিং, এআই প্রভৃতি) প্রযুক্তিগত রূপান্তরগুলো ধারণ ও গ্রহণ।
- ***বিশ্বায়নের নতুন তরঙ্গ:*** বিশ্বায়ন যেমন বাংলাদেশের জন্য ম্যানুফ্যাকচার বিশ্ব বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করেছে, তাই একে অবশ্যই বিশ্বায়নের নতুন তরঙ্গসহ উত্থানশীল সুবিধাবলির ধারণ ও ভবিষ্যৎ বাধা মোকাবেলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে একটি অতি-শিল্পায়িত অর্থনীতি হয়ে উঠতে বাংলাদেশের জন্য এটিই একমাত্র বিকল্প।

- ***প্রতিযোগ-সক্ষমতার ভবিষ্যৎ সমস্যা:*** ভবিষ্যতের নতুন উদ্ভাবিত শিল্প খাতে, বাংলাদেশি শিল্প কারখানাগুলোকে যে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হবে, তাহলো নিম্নশ্রম ব্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার নিশ্চয়তা সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা একটি গতিশীল বিষয় ও এটি উদ্ভাবনধর্মী। বাংলাদেশি শিল্প কারখানাসমূহকে এর উপাদান-চালিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার বর্তমান পর্যায় থেকে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন-চালিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়া শিল্পোদ্যোক্তাদের সতর্ক হওয়া দরকার যে, শ্রমঘন পোশাক রপ্তানি বর্তমানে যে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাচ্ছে, তা ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

- ***পূর্ব এশীয় অর্থনীতি (কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড) থেকে শিক্ষা:*** উচ্চ পরিকৃতিশীল এই অর্থনীতিগুলোর সবকয়টি যে বৈশিষ্ট্যাবলির জন্য শেষ পর্যন্ত উচ্চ-আয়ের সীমা অতিক্রম করে, সেগুলো নিম্নরূপ: সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, জিডিপি'তে বাণিজ্যের উচ্চ অংশ, মানের উন্নয়নে (দক্ষতা উন্নয়নে) বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। ইতোমধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশ অর্জন করেছে, এখন বাকিগুলো আত্মস্থ করার ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে, বিশেষ করে মানব ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে।

- ***বৈদেশিক বাজারে নির্ভরতা ও বাণিজ্য উদারতা:*** উন্নততর রপ্তানি পরিকৃতির জন্য রপ্তানিমুখী বাণিজ্য নীতির গুরুত্ব যে কতো বেশি, তা উচ্চ পরিকৃতিশীল পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলোর অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে। সকল সময়ের জন্য রপ্তানি কৌশলের মূল চাবিকাঠি হবে বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং একই সাথে দেশে বিশ্বমূল্যে উপকরণ প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রণোদনা অপসারণের পাশাপাশি বৈদেশিক বাজার আয়ত্তে নিতে নীতিগত সমর্থনসহ বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতো দৃঢ়ভাবে সমন্বিত তার ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশে কর্ম সুযোগ সৃজনসহ শিল্পায়নের গতিবেগ।

- ***বৈশ্বিক মূল্য শিকলের সদ্ব্যবহার ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ:*** বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে যাওয়ার ফলে বৈশ্বিক মূল্য শিকল বিকশিত হবার সুযোগ পায়। এটি বিশেষ করে মধ্যবর্তী পণ্যের বাণিজ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সঞ্চারসহ বৈশ্বিকভাবে আন্তঃশিল্প বাণিজ্যের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে বৈশ্বিক মূল্য শৃংখলে মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অবশ্যই আয়ত্তে আনতে হবে, কেননা বাংলাদেশি শিল্পোদ্যোক্তাগণ এ ধরনের বিশেষজ্ঞতার সাথে পরিচিত নন। আর এজন্যই বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের গুরুত্ব এতো বেশি। বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে এমন যে কোন প্রতিবন্ধকতা প্রশমনে নীতিপ্রণেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনেই নয়, আসন্ন দশকগুলোর ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যে বাজার সুবিধা প্রাপ্তিসহ উৎপাদন দখলে রাখতে ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত উল্লম্ফনের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগের অকুণ্ঠ সমর্থন একান্ত আবশ্যক।

- ***প্রযুক্তিগত পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট সুবিধাবলি ধারণ ও সমস্যাবলির সমাধান:*** প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও নতুন প্রযুক্তির সাথে অর্থনীতির সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিশ্ব সমাজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফল যাতে হারাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকেও পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি জ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক অর্থনীতির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অধিকতর তৎপর ও শক্তিশালী করতে হবে।

- ***বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠানাদি শক্তিশালীকরণ:*** ঐতিহাসিক গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সমৃদ্ধি উৎপাদনক্ষম এমন প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে বাংলাদেশ কাজ করে চলেছে। পরবর্তী দশক হবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তা উদ্ভাবন ও সৃজনশীল ধ্বংস দ্বারা চালিত একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান বাজার সুবিধাবলি ধারণে শিল্পোদ্যোক্তাদের কার্যকরভাবে সহায়তা করবে (সুমপিটার, ১৯৪২)।[১১]

---

১১ যোশেফ সুমপিটার সৃজনশীল ধ্বংস "(ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন)" এই ধারণাটিকে জনপ্রিয় করেন এবং এটি তাঁর "পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র" শীর্ষক বইটিতে (প্রথম প্রকাশ ১৯৪২) প্রথম তুলে ধরা হয়।

অধ্যায় ৮

একটি উচ্চ-আয় দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

একটি উচ্চ-আয় দেশের জন্য টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৮.১ প্রেক্ষাপট

উচ্চতর মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির জন্য জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির বিপরীতে জ্বালানি সরবরাহে মন্থর গতির কারণে ২০০৯ এ বাংলাদেশকে তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখোমুখী হতে হয়। এই পরিস্থিতি জ্বালানি সংকট মোকাবেলাসহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ ধারণকৃত বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য একটি সুগঠিত টেকসই দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। তদনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার একটি সমন্বিত জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে। কৌশলে একটি সুষম পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়, যেখানে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষাপটে জ্বালানি বাজারের চাহিদা ব্যবস্থাপনার দিক ও সরবরাহ বৃদ্ধি উভয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। জ্বালানি বাণিজ্যের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর সাথে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জ্বালানি বিকল্প সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ গতিশীল করাসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমসমূহের বহুমুখীকরণের জন্য বিকল্প অনুসন্ধানে সরকার কী করতে পারে তা সমাধানের প্রচেষ্টাও কৌশলে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ছাড়াও বিকল্প সমাধানের, যেমনপ্রতিবেশী দেশগুলো হতে বর্ধিত বিদ্যুৎ আমদানী, আমদানি করা কয়লা ও তরল জ্বালানী-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এলএনজি বাণিজ্য। আমদানির সম্ভাব্যতা পরীক্ষণের বিষয়ও স্থান পায়। তদুপরি, অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত সম্পদের অনুসন্ধান, যেমন কয়লা উত্তোলন এবং অফশো ড্রিলিং এর সাহায্যে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করা হয়। সরবরাহের দিক থেকে বিকল্পসমূহকে চাহিদা ব্যবস্থাপনার জন্য চাহিদার সাথে সুষম করার ফলে জ্বালানি সংরক্ষণসহ জ্বালানির অপরিকল্পিত ব্যবহার নিরুৎসাহিত হয়।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর আওতায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত কৌশলের বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক থেকে, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে অধিকতর অগ্রগতির জন্য মজবুত ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তবে জ্বালানি মিশ্রণ, জ্বালানি-মূল্য ও অর্থায়ন, এবং জ্বালানি ঘাটতির দিক থেকে একটি অসমাপ্ত এজেন্ডাও রয়েছে। তদুপরি ২০৪১ মেয়াদে বাংলাদেশের উচ্চ-আয়ের দেশে উন্নীত হবার অভিযাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অধিকতর ত্বরান্বিত হবে এবং নগরায়ণ বাড়বে। ফলে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির জন্য বর্ধিত চাহিদার উল্লম্ফন ঘটবে। জ্বালানি ও কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার সাথে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়নও জড়িত। নিম্ন কার্বন নিঃসরণের সাথে উচ্চতর জ্বালানি চাহিদার সঙ্গতি বিধানের জন্য প্রয়োজন হবে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রাহ্রাস করে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বাড়ানো।

৮.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অগ্রগতি

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্য সারণি ৮.১ এ দেখানো হলো। মূলত, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধিকে সহজ ও সাবলীল করতে নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপক বিস্তারের পাশাপাশি জ্বালানি দক্ষতার উন্নতি সাধন, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এবং জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করতে চায়। এই উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যসমূহের বিপরীতে সারণি ৮.২ এ জ্বালানি নিরাপত্তা ও দক্ষতায় অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় ২০১০ এবং ২০১৯ এর মধ্যে যা প্রতিবছর ১৪% হারে গড় বার্ষিক গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং যেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। ২০১০ সালে গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৫৮২৩ মেগাওয়াট যা ২০১৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৯৬১ মেগাওয়াট; এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় অর্জন, যা বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রার খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। এর পাশাপাশি, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়, যা নগর ও পল্লী উভয় অঞ্চলের জনগণকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় নিয়ে আসতে সহায়ক হয়। এভাবে ২০১৯ সালে ৯৫ % বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় চলে আসে। বিদ্যুৎ সংযোগের বর্তমান এই গতি বজায় থাকলে আশা করা যায় যে, ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% মানুষকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। যেখানে মাত্র ৮ বছর আগেও শতকরা ৫০ ভাগেরও কম মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতো।

সারণি ৮.১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

মূল উদ্দেশ্যাবলি	লক্ষ্য ২০২১
বহুমুখীকরণ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	*বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০,০০০ মেগাওয়াট*
বিদ্যুৎ খাতকে অর্থনৈতিকভাবে সচল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীল করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি	*সংযোগশীলতা: ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ*
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি	*বিদ্যুতে জ্বালানি মিশ্রণ: গ্যাস- ৩০%; জ্বালানি তেল- ৩%; কয়লা- ৫৩%; পারমাণবিক- ১০%, জল বিদ্যুৎ- ১%; এবং নবায়নযোগ্য- ৩%*
বিদ্যুৎ খাতে একটি নতুন কর্পোরেট সংস্কৃতি প্রবর্তন	
বিদ্যুৎ সরবরাহের মান ও নির্ভযোগ্যতার উন্নতি	
বিদ্যুতের জন্য প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার	
অর্থায়ন সমাবেশ করতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	
ন্যূনতম ব্যয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদ্যুতের জন্য যুক্তিযুক্ত ও সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করা	
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রবর্তন	

উৎস: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১

ক্রমবর্ধনশীল বেসরকারি অংশগ্রহণসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগতি এ পর্যন্ত বেশ সন্তোষজনক। বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ একটানা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১০ অর্থবছরের ২১০৪ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ২০১৯ অর্থবছরে ৯৪৫৪ মেগাওয়াটে (আমদানীকৃত বিদ্যুৎসহ গড়ে পতি বছর ১৮.১৭% বৃদ্দি) উন্নীত হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে বেসরকারি অর্থায়ন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ উৎসাহিত করার সামর্থ্য বিদ্যুৎ খাতের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সাফল্য। পরবর্তী দুই বছর, অর্থবছর ২০১৯ থেকে ২০২১ এ বেসরকারি বিদ্যুতের অব্যাহত অগ্রগতি হবে যা ২০২১ এ ২০,০০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্য অর্জনের বড় সহায়ক।

জ্বালানি বহুমুখীকরণের ব্যাপারে অগ্রগতি মিশ্র প্রকৃতির। ইতিবাচক দিক হলো, ভারতের সাথে জ্বালানি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ আমদানি ২০১০ এ শূন্য থেকে ২০১৯ তে ১১৬০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। এটি একটি ভালো লক্ষণ এবং এর ফলে ভারত, ভুটান ও নেপালসহ অন্যান্য প্রতিবেশীদের সাথে অধিকতর ও উন্নততর জ্বালানি বাণিজ্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

একটি সমন্বিত কয়লা নীতির অভাবে অভ্যন্তরীণ কয়লা উত্তোলন একরকম বন্ধ রয়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বিস্তারে সহায়তা দিতে কয়লা আমদানি করা হচ্ছে। তবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ ৫৩% এর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ পর্যন্ত কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার মাত্র ৩% । চলমান উৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে সামনের বছরগুলিতে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার বাড়ানো হবে। আশা করা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০৩১ সালের জুলাইয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে পারবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপারে অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। ২০১০ ও ২০১৮ এর মধ্যে সৌর বিদ্যুতের ৮০ মেগাওয়াটের মতো অন-গ্রিডে যুক্ত হয়। অফ-গ্রিডে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির মোট ৩৩৪ মেগাওয়াট প্রাথমিকভাবে সৌরশক্তি ভিত্তিক, যা ঐ একই সময়ে যুক্ত হয়। সার্বিক ভাবে, মোট নন-হাইড্রো নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুতের অংশ ২.৮% হারে বেড়েছে। তাই, ২০২১ এ ৩% নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে ।

সারণি ৮.২: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সাফল্য

উদ্দেশ্যাবলি / পরিকৃতি নির্দেশক	২০১০ অর্থবছর (ভিত্তি বছর)	২০১৯ অর্থবছর (অর্জন)	২০২১ অর্থবছর (লক্ষ্য)
বিদ্যুৎ খাত আর্থিকভাবে কার্যকর রাখা	ভর্তুকির পরিমাণ ৬.৩৬ বিলিয়ন টাকা	ভর্তুকির পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন টাকা	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভর্তুকির লক্ষ্য
বিদ্যুতের মোট স্থাপনকৃত উৎপাদন ক্ষমতা	৫,৮২৩ মেগাওয়াট	১৮,৯৬১ মেগাওয়াট	২০,০০০ মেগাওয়াট
জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার বৃদ্ধি ও সিস্টেম লস হ্রাস	১৫.৭৩% টিঅ্যান্ডডি লস	১১.৯৬% টিঅ্যান্ডডি লস	১০%
বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবহার বহুমুখী করা, যেমন গ্যাস থেকে কয়লা, তরল জ্বালানি (গ্রিড ভিত্তিক স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা)	৮৪% গ্যাস; ৮% তরল জ্বালানি; ৪% কয়লা; এবং ৪% অন্যান্য	৫৭.৪% গ্যাস; ৩২.৪% তরল জ্বালানি; ২.৮% কয়লা; এবং ৬% জ্বালানি আমাদানি ১.৪% অন্যান্য	৩০% গ্যাস; ৩% তরল জ্বালানি; ৫৩% কয়লা; এবং ১৪% অন্যান্য
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি সরবরাহে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৩৬%	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৫০% (আমদানিসহ)	কোন পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া
জ্বালানি বাণিজ্য উৎসাহিত করা	০ মেগাওয়াট	১১৬০ মেগাওয়াট	কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নেই
বিদ্যুৎ সুবিধায় অভিগম্যতা	৪৮%	৭২%	১০০%

উৎস: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১

জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা একটি উদ্বেগের বিষয়, যা কার্বন নিঃসরণের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে সংস্কার করা প্রয়োজন। তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ খাত থেকে কার্বন নিঃসরণের বৃদ্ধি হার সর্বোচ্চ, যা ২০০৪ ও ২০১৬ এর মধ্যে বার্ষিক ৯.২% হারে বাড়ে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের লক্ষ্যে আগের দিনের গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে নতুন ও অত্যন্ত দক্ষ, কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ প্লান্ট, কয়লা ভিত্তিক সুপার ক্রিটিক্যাল এবং আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা করা হবে।

জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে, একটা লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক জ্বালানি খরচ ১৫% কমানো, ২১৩১ সালের মধ্যে ২০% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২৫% চাহিদার দিক থেকে দক্ষতার জন্য কোন পরিমাণগত লক্ষ্য ছিল না, তবে সরবরাহের দিকে, সঞ্চালন ও বিতরণ (টিঅ্যান্ডডি) জনিত ক্ষতি হ্রাসে অগ্রগতি অপরিবর্তনীয়, যা ২০১০ এর ১৫.৭৩% থেকে কমে ২০১৯-তে ১১.৯৬% এ নেমে আসে। আগের কম কার্যকর পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ হওয়া, নতুন অত্যন্ত দক্ষ মেশিন সিস্টেমে যুক্ত করা ও বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগুরুত্বপূর্ণ খরচ ২০১০ অর্থ বছরে ৫.৮২% থেকে কমে ২০১৯ অর্থ বছরে ৪.৩৯% নেমে আসে। এটি একটি বলিষ্ঠ অর্জন। আর্থিক দিক থেকে, বিদ্যুৎ খাতে বিল তৈরি ও আদায় ব্যবস্থার উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিইআরসি) নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা কর্তৃক পৌনঃপুনিক মূল্য সমন্বয়ের ফলে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। এতৎসত্ত্বেও, গ্যাসের ঘাটতি ও তরল জ্বালানিতে ক্রমবর্ধনশীল নির্ভরতার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় বর্ধিত গড় বিক্রয়মূল্যের তুলনায় অব্যাহত ভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে। তাই আর্থিক ভর্তুকি অব্যাহত রয়েছে, ফলে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি।

সংক্ষেপে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ কৌশলের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদ্যুতের সম্প্রসারণ, কেননা প্রবৃদ্ধি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এটি একটা বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে পড়েছিল । বিদ্যুৎ বিস্তারে বলিষ্ঠ অগ্রগতিসহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলে তুলনামূলকভাবে বেশি জোর দেয়া হবে ব্যয় হ্রাস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর।

৮.৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ রূপকল্প গড়ে উঠবে যা বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির জন্য রূপকল্প ২০৪১ এ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত হবে:

- একটি উচ্চ-মধ্য-আয় এবং উচ্চ-আয় অর্থনীতির জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন একটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত গড়ে তোলা।
- অন্য কোন জ্বালানি উৎসের প্রাপ্যতা ও অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য বৈদ্যুতিক সুবিধায় অব্যাহত অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারিত মূল্যে ও দক্ষতার সাথে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা।
- বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাথমিক জ্বালানি আমদানি এবং ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে প্রতিযোগিতামূলক দরে বিদ্যুৎ আমদানির সাথে অভ্যন্তরীণ দক্ষ সরবরাহের সুষম সমন্বয় ঘটিয়ে ১০০% জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পরিবেশগত সুরক্ষাসহ জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহের সঙ্গতি নিশ্চিত করে এমন একটি জ্বালানি কৌশল গ্রহণ।
- অধিকতর দ্রুত, নিরাপদ, সহজ ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিবহনের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন।

৮.৪ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যসমূহ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের যে উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যসমূহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প বাস্তবায়নে কর্মযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য নির্দেশকসমূহ তৈরি হয় তা সারণি ৮.৩ এ প্রদর্শিত হলো। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপিত বার্ষিক ৯% হওয়ায় ২০২১-২০৪১ মেয়াদে বিদ্যুতের চাহিদা ৯.৩% হারে বৃদ্ধি পাবে[১২]। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কৌশলের তাই মূল উদ্দেশ্য হবে নতুন চাহিদা পূরণ । বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদার ক্ষেত্রে এই বিশাল ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপ্তি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হবে ন্যূনতম ব্যয় বিকল্প ভিত্তিক বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ, যার উদ্দেশ্য হবে উচ্চ-ব্যয়সাধ্য তরল জ্বালানী নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট পর্যায়ক্রমে গুটিয়ে নেয়া এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে প্রাথমিক জ্বালানির পরিমিত ব্যবস্থাপনার দিকে যাওয়া এবং সেই সাথে কার্বন প্রভাব কমানোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া। তদনুযায়ী জ্বালানি মিশ্রণেও পরিবর্তন এনে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কমানো হবে এবং স্বল্পব্যয় জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় ঘটানো হবে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অভ্যন্তরীণ চাপ প্রশমনে ভারত, নেপাল ও ভুটান হতে আমদানিকৃত জল এবং সৌর বিদ্যুতের বেশী ব্যবহার সহায়ক হবে। আর্থিক দিক থেকে মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক টেকসই হওয়া নিশ্চিত করা, যাতে অন্যান্য উচ্চ-মধ্য-আয় ও উন্নত দেশগুলোর মতোই বাংলাদেশও এই খাত হতে যুক্তিযুক্ত হারে মুনাফা অর্জন করতে পারে। বিইআরসি যে ট্যারিফ নির্ধারণ করে থাকে তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের গড় খরচ উৎপাদনের খরচের চাইতে কম। এতে করে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তার চাপ পড়ে জাতীয় বাজেটে। এই ক্ষতি পোষাতে বিপিডিবি সরকারের কাছ থেকে ঋণ/বাজেট সহায়তা পেয়েছে। এভাবে বিদ্যুৎ খাতে সরকারি বাজেট সহায়তা ২০১০ থেকে ২০১৯ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ বিলিয়ন টাকা থেকে ৭৫ বিলিয়ন টাকা (সংযুক্তি-৮ক)।

সারণি ৮.৩: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

উদ্দেশ্যাবলি/সাফল্যের নির্দেশক	২০১৯ (প্রকৃত)	২০২১ (অভীষ্ট)	২০৩১ (অভীষ্ট)	২০৪১ (অভীষ্ট)
বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে লাভজনক করা	ক্ষতির পরিমাণ টাকা ৭৫ বিলিয়ন	শূন্য ঘাটতি	সম্পদের ওপর ৬% হারে মুনাফা	সম্পদের ওপর ৮% হারে মুনাফা
গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা	১৮,৯৬১ মেগাওয়াট	২১,৩৬৯ মেগাওয়াট	৩৩,০০০ মেগাওয়াট	৫৬,৭৩৪ মেগাওয়াট
শীর্ষ মুহূর্তের সর্বোচ্চ চাহিদা	১২,৮৯৩ মেগাওয়াট	১৪,৫০০ মেগাওয়াট	২৯,৩০০ মেগাওয়াট	৫১,০০০ মেগাওয়াট
সিস্টেম লস কমানোসহ জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পিএসএমপি২০১৬ বেইজ কেস।	১১.৯৬% (টিঅ্যান্ডডি লস)	১১% (টিঅ্যান্ডডি লস)	৮% (টিঅ্যান্ডডি লস)	৬%টিঅ্যান্ডডি লস: একক সংখ্যা

১২ চাহিদা প্রক্ষেপণের জন্য আয়ের স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে অন্তর্নিহিত অনুমানের ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে 'আহসান মনসুর, প্রেক্ষিত পরিকল্পনার জন্য বিদ্যুৎ খাত কৌশল, প্রেক্ষাপট গবেষণাপত্র প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১' এর জন্য প্রণয়নকৃত।

উদ্দেশ্যাবলি/সাফল্যের নির্দেশক	২০১৯ (প্রকৃত)	২০২১ (অভীষ্ট)	২০৩১ (অভীষ্ট)	২০৪১ (অভীষ্ট)
জ্বালানি মিশ্রণে নিম্ন কার্বন উপাদানসহ স্বল্পব্যয়ে জ্বালানির ব্যবহার ভারসম করতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখী করা	৫৭.৪% গ্যাস; ৩২.৪% তরল তৈল; ২.৭% কয়লা; ৬%জ্বালানি আমদানি; ১.২% জলজ; ০.২% নবায়নযোগ্য ও আমদানি	৪৫% গ্যাস; ১৭% তরল তৈল; ২৭% কয়লা; ৯%জ্বালানি আমদানি; ১% জলজ;	২৯% গ্যাস; ৩০% কয়লা; ১৪% পারমাণবিক; ১৭%জ্বালানি বিদ্যুৎ আমদানি; ১% জলজ	৩৫% গ্যাস; ৩৫% কয়লা; ১২% পারমাণবিক; ১৬%বিদ্যুৎ আমদানি; ১% জলজ ১% তরল তৈল
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি সরবরাহে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	৫০% বিদ্যুৎ উৎপাদন (ও আমদানি)	৫০%	৫৫%	৬০%
জ্বালানি বাণিজ্য উৎসাহিত করা	১১৬০ মেগাওয়াট	২০০০ মেগাওয়াট	৫০০০ মেগাওয়াট	৯০০০ মেগাওয়াট
বিদ্যুৎ সুবিধায় অভিগম্যতা	৭২%	১০০%	১০০%	১০০%
পেট্রোলিয়ামের পাইপলাইন স্থাপন	০ কিলোমিটার	৪৫১ কিলোমিটার	১০৭৭ কিলোমিটার	১১৭৭ কিলোমিটার
রিফাইনারির ইনস্টলকৃত প্রসেসিং সক্ষমতা	১.৫ মিলিয়ন টন	১.৫ মিলিয়ন টন	১৯.৫ মিলিয়ন টন	১৯.৫ মিলিয়ন টন

উৎস: পিএসএমপি অনুযায়ী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রক্ষেপণ।

৮.৫ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশল ও নীতিমালা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত ধারায় প্রতিস্থাপন করবে। এতে অন্তর্ভুক্ত কৌশল ও নীতিমালার মূল উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

বিদ্যুৎ উৎপাদন বিস্তারে একটি স্বল্পব্যয়ী পন্থা অবলম্বন: একটি বিদ্যুৎখাত মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) প্রণয়ন কাজের সাথে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে। বিপিডিবি (পিও ৫৯, ১৯৭২), প্রথম মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয় ১৯৮৫ সালে এবং হালনাগাদ করা হয় ১৯৯৫, ২০০৬, ২০১০ ও ২০১৬ সালে। পিএসএমপি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও প্রাথমিক জ্বালানি সংশ্লিষ্ট মিশ্রণের জন্য কৌশলসহ বেসরকারি খাতের ভূমিকা, বিদ্যুৎ বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ব্যবহারের দক্ষতা ও মূল্যনির্ধারণ কৌশল সন্নিবেশিত হয়। পিএসএমপি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলেও তা পূর্ববর্তী ৫ বছর বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। পিএসএমপি ২০১৬ ব্যবহার করে সারণি ৮.৩ এ প্রদর্শিত উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রার কয়েকটি নির্ধারণ করা হয় এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য সেগুলোতে পরে প্রয়োজনীয় পরিমিতি আনা হয়। যখন ২০১০ এ পিএসএমপি'তে গৃহীত হয়, তখন উচ্চ-ব্যয়সাধ্য রেন্টাল বিদ্যুতের ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা ছিল। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে, স্বল্পমেয়াদী জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য, গ্যাস সংকটের কারনে ব্যয়বহুল তরল জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। পিএসএমপি-২০১০ অনুযায়ী ২০৩১ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ৫০% কয়লা নির্ভর, ২৫% গ্যাস এবং ২৫% অন্যান্য উৎস থেকে। এরপরে ২০১৬ পিএসএমপি'তে বৃহদায়তনিক ও স্বল্পব্যয়ী জ্বালানি বিকল্প গ্রহণসহ পর্যায়ক্রমে রেন্টাল বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট কমিয়ে এনে স্বল্পব্যয় সম্পন্ন বিদ্যুৎ বিস্তারণের দিকে সরে আসার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পিএসএমপি ২০১৬ এর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বিদ্যুৎ বিস্তারণ কৌশল গ্রহণ করা হবে এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে পাঁচ বছর পর এই কৌশল হালনাগাদ করা হবে।

স্বল্প ব্যয়ভিত্তিক প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি: স্বল্পব্যয় সম্পন্ন বিদ্যুৎ বিস্তারের পন্থা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজন স্বল্প ব্যয়ভিত্তিক জ্বালানি বিকল্প গ্রহণ। জলবিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং পরমাণু এগুলোর প্রতিটিই স্বল্পব্যয় বিদ্যুৎ বিস্তারের অংশ। তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল) ব্যয়বহুল জ্বালানি এবং স্বল্পব্যয় ভিত্তিক জ্বালানি প্রাপ্তির সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদে এগুলোর ব্যবহারও ক্রমাগত হ্রাস পাবে। তবে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ভাল। বিদ্যমান পরিচিত কয়েকটি গ্যাস-উৎসের মজুদের ওপর ভিত্তি করে সরবরাহ দ্বারা বাংলাদেশকে এটি এতোদিন অত্যন্ত ভালো সেবা দিয়েছে, যদিও সেগুলো দ্রুত কমে হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য উন্নততর মূল্য নির্ধারণ ও চাহিদা ব্যবস্থাপনাসহ নতুন নতুন গ্যাস-ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

একই সঙ্গে, পিএসএমপি'র প্রেক্ষাপটে তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করার জন্যও একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করা হয়। এলএনজি কৌশলও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মোট ১,৩৮,০০০ বর্গমিটার এলএনজি'র ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভাসমান স্টোরেজ ও পুনর্গ্যাসীকরণ ইউনিট (এফএসআরইউ) ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের পুনর্গ্যাসীকরণ সক্ষমতা ৫০০ এমএমএসসিএফডি। এক বছরে ৩.৭৫ মিলিয়ন টনের প্রসেসিং-সক্ষমতা সংবলিত প্রথম ইউনিট স্থাপিত হয় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক্সিলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড (ইইবিএল) দ্বারা এবং ২০১৮ এর আগস্টে এটির উৎপাদন কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। একই সক্ষমতা বিশিষ্ট দ্বিতীয় এফএসআরইউ স্থাপিত হয় সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানি লিমিটেডের দ্বারা এবং তা বাস্তবরূপ শুরু হয়েছিল ২০১৯ এর এপ্রিলে। উভয় ইউনিটের অবস্থান কক্সবাজারের মহেশখালি সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে। পেট্রোবাংলারও একটি অনশোর এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এর ধারণ সক্ষমতা হবে বছরে ৭.৫ মিলিয়ন টন, যাতে এক বছরে ১৫ মিলিয়ন টন পর্যন্ত বর্ধিত করার সুবিধা থাকবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই কাতারের রাস-লাফফান প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (৩) এর সাথে ১.৮ থেকে ২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি (১৫ বছরের জন্য) এলএনজি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (এসপিএ) স্বাক্ষর করেছে। আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি (১০ বছরের) এসপিএ স্বাক্ষর করেছে ওমানের ওমান ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল (ওটিআই) এর সঙ্গে ০.৫ থেকে ১.০ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের জন্য। এছাড়াও বাছাইকৃত সরবরাহকারী-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মহা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এলএনজি বিস্তার কর্মসূচির অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ছাড়াও পিএসএমপি'র প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন বোধে কৌশলের হালনাগাদও করবে।

এলএনজি ও তরল জ্বালানির (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল) মতোই কয়লাও আমাদের সামনে স্বল্পব্যয় ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিস্তারের পথ মেলে ধরে এবং এটি বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। এক্ষেত্রে যেটি প্রধান সমস্যা হলো পরিবেশের ওপর এর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে লাগসই প্রযুক্তি ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রক্ষা কবচ গড়ে তোলা। আজকাল এ ধরনের ক্ষেত্রে আলট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের পাঁচটি কয়লা খনিতে এ যাবৎ প্রায় ৭,৯৬২ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় অবস্থিত কয়লাখনি থেকে বছরে প্রায় ১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এছাড়া দিনাজপুরের দীঘিপাড়ায় বছরে ৩ মিলিয়ন টনের লক্ষ্যমাত্রাসহ আরেকটি ভূগর্ভস্থ কয়লাখনি ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশীয় উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে কয়লার চাহিদা মেটানোর জন্য ২০৪১ সালের মধ্যে জামালপুর ও খালাসপিরে পেট্রোবাংলার দুটি কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র চালু করার জন্য প্রয়োজন বিপুল অঙ্কের প্রাথমিক বিনিয়োগ, যা থেকে ভবিষ্যতে উচ্চ মুনাফা আসবে। অন্যদিকে, আমদানিকৃত কয়লার ব্যবহারে প্রয়োজন হয়, বন্দরে গুদামজাতকরণে এবং পরিবহন অবকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ। সুতরাং, এক্ষেত্রে একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। বেশ কয়েকটি কর্মসূচি প্রক্রিয়াধীন, যেমন আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহার করে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মাতারবাড়ি কয়লা স্থানান্তর (ট্র্যান্সশিপমেন্ট) টার্মিনাল (সিটিটি)। এই উদ্যোগগুলোর অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা ব্যবহার করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে কয়লা ব্যবহার কৌশল ও নিরাপত্তা গ্রহণ করা হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ সরবরাহ মিশ্রণে একটি বৃহত্তর ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পকে দ্রুতগামী প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশে ২৪০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য রুশ ফেডারেশনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পারমাণবিক বর্জ্যের নিরাপদ নিক্ষেপণ ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক পারমাণবিক নজরদারি সংস্থার সাথে সরকারের আলোচনাও হয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিকল্প তৈরির ক্ষেত্রে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় নিরাপত্তা মানের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মাত্রা নিশ্চিত করতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করা হবে।

বৈশ্বিকভাবে সৌরশক্তি ও বায়ু ভিত্তিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে। এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিও অধিকতর ব্যয়সাশ্রয়ী। ক্রমবর্ধিতভাবে পরিবেশবান্ধব হওয়া ছাড়াও নবায়নযোগ্য জ্বালানি হয়ে উঠবে আর্থিকভাবে স্বল্প-ব্যয় বিকল্পের একটি অংশ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মেয়াদে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ২০০৯ এ গ্রহণ করা হয় একটি সমন্বিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা। এছাড়াও ২০১২ তে প্রতিষ্ঠিত হয় টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ নবায়নযোগ্য জ্বালানির

ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। সকল ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির (জীবাশ্ম তেল, কয়লা ও গ্যাস) সঠিক মূল্য নির্ধারণসহ অতীত অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার আলোকে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ২০০৯ এর নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বেসরকারি বিনিয়োগসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য খানাসমূহকে উৎসাহিত করতে প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তাছাড়াওঅন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস, যেমন বাতাস, স্রোত, বর্জ্য ইত্যাদি থেকে বিদ্যুৎ করার সুযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

প্রাথমিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন: এলএনজি ও আমদানিকৃত কয়লা দুটোই অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে অবকাঠামো-নির্ভর জ্বালানি বিকল্প। আমদানিকৃত এই জ্বালানিগুলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সংযুক্ত করতে বন্দরে, স্টোরেজ সুবিধায়, রেল ও সড়ক অবকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। সঠিক সমন্বয়ের অভাবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিনিয়োগ সুফল প্রদানে ব্যর্থ হবে। এ ব্যাপারে বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সহায়ক হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ এই অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাকে অঙ্গীভূত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়াও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় দেশজ তৈল পরিশোধন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে এবং চাহিদা স্থলে দ্রুত ও সহজে তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে সমগ্র দেশে পেট্রোলিয়াম পাইপ লাইন স্থাপনে গুরুত্ব প্রদান করা হবে এবং সেই সাথে গ্রহণ করা হবে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মধ্যে সুষম বিনিয়োগ নিশ্চিত করা: বাংলাদেশের সকল অংশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুফল বিতরণ অর্থবহ করতে এবং শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থেই বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অবশ্যই সঞ্চালন ও বিতরণে উপযুক্ত বিনিয়োগের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। এ ব্যাপারে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে যাতে ধীর উৎপাদন সক্ষমতার দিক থেকে কোন ক্ষয়ক্ষতি না করতে পারে এবং জেলা পর্যায়ের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিভ্রাটের অবসান ঘটে। পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি অধিকতর শক্তিশালী করার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

স্থাপিত সক্ষমতার দক্ষ ব্যবহার বিস্তার: বহুবিধ কারণেই যে কোন বছরে উৎপাদিত সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চেয়ে প্রকৃত স্থাপিত বিদ্যুতের সক্ষমতা বেশি। যদিও সংশ্লিষ্ট সেবা দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সক্ষমতা প্রায় ২০% হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এটি ৩৩%। স্থাপিত সক্ষমতা ও যে কোন বছর সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতার মধ্যে এই ধরনের ব্যবধানের কারণ প্রাথমিক জ্বালানি, বিশেষ করে গ্যাসের প্রাপ্যতার ঘাটতি, সংরক্ষণ সময়সূচি সমন্বয়ে জটিলতা ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট অপরাপর প্রতিবন্ধকতা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ, এই সমস্যাবলি সমাধানের জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রাথমিক জ্বালানির সময়মতো প্রাপ্যতার দিক থেকে পরিচালনা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হবে। এটি বিদ্যুতের গড় মূল্য এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে।

জ্বালানিখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ: বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার মূল উপাদান হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের ভূমিকা উৎসাহিত করা। এ ব্যাপারে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ধারাকে এগিয়ে নিতে বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভূমিকাকে অধিকতর উদ্দীপ্ত করবে। বাংলাদেশ যেহেতু বিদ্যুৎ বিস্তার কর্মসূচিতে রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সরে আসছে, তাই বৃহদায়তনিক ও জ্বালানি দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিতে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এটিই হবে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন কৌশলের প্রধান উদ্দিষ্ট। বর্তমানে, বিতরণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকার। বাংলাদেশ যখন আরো উন্নত হয়ে একটি উচ্চ-মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীত হবে, তখন দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বিকাশে বিদ্যুতের বেসরকারি বিতরণের জন্য বিকল্প অনুসন্ধান করাই যুক্তিযুক্ত হবে। এ ব্যাপারে, অধিকতর স্বায়ত্তশাসনসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবার মূল্য নির্ধারণ ও সঠিক নিয়ন্ত্রণে সক্ষম মানসম্পন্ন জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিইআরসি) ভূমিকা শক্তিশালী করা হবে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আরেকটি কৌশল হবে বেসরকারি উৎপাদনকারীদের দ্বারা গ্রিডে সরবরাহ থেকে খানা বা গৃহস্থালি পর্যায়ে সরাসরি বিক্রয়সহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ উৎসাহিত করা। ইডকলের সহায়তাপুষ্ট সৌরগৃহ কর্মসূচি ও সৌর সেচ নবায়নযোগ্য জ্বালানির গ্রিড-বহির্ভূত সরবরাহের উত্তম উদাহরণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় মূল্য সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার মাধ্যমে তেল ও গ্যাস বিপণনের উন্নয়নেও বেসরকারি খাতের ভূমিকা বিস্তৃত করা হবে। এই সেবাগুলোতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ফলে বিনিয়োগ বিকশিত হবে, প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে এবং ভোক্তাদের পছন্দের তালিকাও দীর্ঘতর হবে।

বিদ্যুৎ বাণিজ্যের অধিকতর বিস্তার: প্রতিযোগিতামূলক দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিস্তারে ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ যে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, তাতে ভোক্তাদের জন্য প্রভূত উপকার হয়। দেশজ উৎপাদনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম দরে বিদ্যুৎ আমদানি আরো বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত, অথচ প্রতিবেশী দেশসমূহ যেমন ভারত (উত্তর-পূর্ব রাষ্ট্রসমূহ), নেপাল ও ভুটানে রয়েছে অপরিমেয় জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা। বিদ্যুৎ আমদানির আরেকটি সুবিধাগত দিক হলো এতে করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্বন নিঃসরণ প্রভাব হ্রাস পায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশের থেকে প্রতিযোগিতামূলক দরে বিদ্যুৎ আমদানি বিকল্প সুবিধা ব্যাপকভাবে বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। নেপাল ও ভুটান থেকে আমদানি বাড়ানো হলে তা সংঘাত ও দুর্ঘটনা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিপর্যয় ঝুঁকি কমাতেও সহায়ক হবে। বিদ্যুৎ বাণিজ্যের মতোই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বানিজ্য বিকাশ সুবিধা সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান ও বিস্তার করা হবে।

সঠিক জ্বালানি মূল্যনীতি নিশ্চিত করা: এই ব্যয়বহুল ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি সুষ্ঠু জ্বালানি মূল্যনীতি আবশ্যক। এছাড়াও এটি সরকারি বিনিয়োগে অর্থায়নসহ ভোক্তাদের উচ্চমানের সেবা দান, বেসরকারি বিনিয়োগ বিস্তার এবং পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ব্যাপক বিদ্যুৎ বিস্তার কর্মসূচি ও বিপুল বিনিয়োগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব আরো বেশি হয়ে পড়েছে। বিশেষভাবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে টেকসই করা সহ এর সম্পদের ওপর একটি গ্রহণযোগ্য হারে মুনাফা অর্জনের জন্য সক্ষম করে তোলা। সকল উচ্চ-মধ্যম-আয় ও উচ্চ-আয় দেশের জন-উপযোগের ক্ষেত্রে এই একই পরিস্থিতি বিদ্যমান। এই লক্ষ্যে তাই বিদ্যুতের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে যাতে উদ্যোক্তা তা থেকে উৎপাদন ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং সম্পদের ওপর যুক্তিযুক্ত হারে মুনাফা আদায় করতে পারে। প্রযুক্তি, পরিকল্পনা-ব্যয় ও জ্বালানি বিকল্পের দিক থেকে স্বল্পমূল্য বিকল্পের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল একটি দক্ষ মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ও ভোক্তা স্বার্থ নিশ্চিত করবে।

পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য সঠিক জীবাশ্ম জ্বালানি মূল্যনীতির গুরুত্বও কোন অংশেই কম নয়। বৈশ্বিকভাবে, এটি সুবিদিত যে, অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণে ভর্তুকিপুষ্ট জীবাশ্ম জ্বালানির অবদান বেশি এবং তা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগসহ পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ভর্তুকি তুলে নিতে সকল জীবাশ্ম জ্বালানির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করবে। উচ্চ-মধ্যম-আয় ও উচ্চ-আয় দেশগুলোর উত্তম চর্চার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং পরিবেশগত সুরক্ষার সাথে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে, বিনিয়োগ বিস্তারসহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের জন্য কার্বন কর প্রথা প্রবর্তন করা হবে কিনা এটিও বিবেচনায় নেয়া হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বড় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয় বিশেষ করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, এবং পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের প্রতি। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও অর্জিত হয়, যা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় সঞ্চালন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট ক্ষতি দ্রুত হ্রাস পাওয়ায়, উন্নত মিটার ও বিল প্রণয়ন ব্যবস্থায়, বিল আদায়ের দ্রুত উন্নতিতে এবং উন্নততর ভোক্তা সেবায়। এই ক্ষেত্রগুলোতে অধিকতর উন্নতির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ এটি বজায় রাখা হবে। জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানমূহ শক্তিশালী করার সমান্তরালে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নিয়ন্ত্রণ শিথিলসহ বেসরকারি খাতের ভূমিকা বিস্তৃত হওয়ার সাথে, জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ-সংস্থাসমূহও শক্তিশালী করা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিইআরসি) দেশে প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। বিইআরসি এখনো বিকাশোন্মুখ পর্যায়ে রয়েছে, তবে বিদ্যুৎ বিতরণসহ তেল ও গ্যাস সরবরাহে বেসরকারি খাতের বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণের সাথে এর ভূমিকা ও প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। বিইআরসি হবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এটি যাতে একটি প্রতিযোগিতামূলক ও নিয়ন্ত্রণ-শিথিল বাজার ব্যবস্থায় সুস্থ প্রতিযোগিতা বিকাশ ও জনস্বার্থ সুরক্ষায় তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করতে পারে এজন্য পর্যাপ্ত জনবল দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে।

আর যে তিনটি জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অধিকতর শক্তিশালী করা হবে সেগুলো হলো স্রেডা, বিএপিআরসি এবং বিপিএমএল। টেকসই জ্বালানি বিকাশ, সহজীকরণ ও সম্প্রচারের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) স্থাপিত হয়। এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও জ্বালানি দক্ষতা উভয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়। একটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্রেডা'র ভূমিকা এখনো বিবর্তনশীল। সক্ষমতা বিনির্মাণ, নীতি পরিবর্তন ও অর্থায়নের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্র বিস্তার ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা ও কার্যকারিতা আরো শক্তিশালী করা হবে।

৮.৬ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির জন্য একটি অর্থায়ন কৌশল গঠন

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্রুত বিস্তার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন, বিনিয়োগ ও জ্বালানি সরবরাহ অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ সম্পদ। সারণি ৮.৩ এ যেমনটি প্রদর্শিত হয়েছে যে, ২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এই ২০ বছর সময় পরিধিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হবে ৬০ হাজার মেগাওয়াটের সক্ষমতাযুক্ত স্থাপনা, যা প্রতি বছর ৩০০০ মেগাওয়াটের বার্ষিক গড় বিস্তারের সমান। এ জন্য এককভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বার্ষিক বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০১৮ এর মূল্যে প্রতি বছর ৩.০ বিলিয়ন ডলার। এই সংখ্যা পিএসএমপি ২০১৬ সংশোধন করা যেতে পারে। এসএমপি-২০১৬ বেজ কেস অনুযায়ী, ২০২১ সালে গ্রিড ভিত্তিক সক্ষমতা হবে ২১,৩৬৯ মেগাওয়াট, ২০৩১ সালে ৩৩,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৫৬,৭৩৪ মেগাওয়াট। রিজার্ভ মার্জিনের ক্ষত্রে নিয়ম অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ, ফোর্সড আউটেজ, স্পিনিং সার্ভিস, লস অপ লোড প্রবেবিলিটি (এলওএলপি) বিবেচনায় রাখা হয়েছে। বিদ্যুতের ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য বছরভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে; এ কাজে চাহিদা-সরবরাহ ভারসাম্য বিবেচনায় নিয়ে করা হয়েছে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা, নতুন পাওয়ার প্লান্টের বাড়তি সক্ষমতা, পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু বিদ্যুৎ প্লান্ট বন্ধ করে দেয়া। এটি দেখানো হয়েছে পিএসএমপি ২০১৬'র একাদশ অধ্যায়ে। চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট মজুদ রাখা প্রয়োজন। সঞ্চালন, বিতরণ ও জ্বালানি অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন হবে এর বাইরে প্রতি বছর আরো ১.৪ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২০১৮ এর মূল্যে প্রতি বছর ৬.০ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক বিনিয়োগ কর্মসূচি, যা বার্ষিক মোট দেশজ আয়-এর ২% এর সমান। এককভাবে বাজেট হতে এই বিপুল অর্থায়ন সম্ভব নয়। তাই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মেয়াদে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ওপর একটি সতর্ক অর্থায়ন কৌশল গড়ে তোলা হবে। বিদ্যুৎ ও উন্নয়ন খাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অর্থায়ন কৌশল নিম্নবর্ণিত মূল উপাদান সমন্বয়ে গঠিত হবে।

বেসরকারি অর্থায়নঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অর্থায়নে বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পূর্ববর্ণিত কৌশলে ইতোমধ্যেই আলোকপাত করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং এই সাফল্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। তবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রত্যাশা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অর্থায়নের অংশ আরো বাড়ানো। ইডকল এবং বেসরকারি খাতের জন্য বিনিয়োগ অর্থায়নের সুবিধা (আইএফএফপি) এর মতো চলমান সহায়ক কর্মসূচিগুলো আরো শক্তিশালী করা হবে। বেসরকারি অর্থায়ন যে দক্ষ ও স্বল্প-ব্যয়ী এবং ঝুঁকির বোঝা বহনেও যে তা যুক্তিযুক্ত-এই ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া হবে। বিশেষ করে, উচ্চ-ব্যয় রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভূমিকা পর্যায়ক্রমে শেষ হয়ে যাবে এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে বৃহদায়তনিক ও জ্বালানি কার্যকরী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ও তেল বিপণনে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হবে।

সরকারি জ্বালানি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট হতে অর্থায়নঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বেসরকারি সামগ্রী এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এর মুনাফা পায় এবং নিজস্ব আয়ের মাধ্যমেই তাদের সম্প্রসারণমূলক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করে থাকে। উচ্চ-মধ্য-আয় এবং উচ্চ-আয় অর্থনীতিগুলোতে বৈশিষ্ট্যগতভাবেই জ্বালানি সংশ্লিষ্ট গণ-উপযোগের ক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যয় বহন করা হয় এবং এর সম্পদ হতে অর্জিত মুনাফা ব্যয় করা হয় নতুন বিনিয়োগে। বাংলাদেশের সরকারি জ্বালানি উপযোগের বেলায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কৌশল হিসেবে একটি অনুরূপ আর্থিক অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এ ব্যাপারে যথাযথ মূল্য নির্ধারণ নীতি আবশ্যক হবে। এই লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার জন্য মূল্য নির্ধারণে বিইআরসি'কে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। স্বল্পআয় বৃদ্ধির সাথে এবং দক্ষ বিনিয়োগের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সেবার প্রেক্ষাপটে ভোক্তাবৃন্দও অন্যান্য উচ্চ-মধ্যম-আয় ও উচ্চ-আয় দেশগুলোর মতো এই সকল সেবার জন্য যথামূল্য পরিশোধে আগ্রহী হবে।

বাজেটীয় অর্থায়নঃ মধ্যবর্তী বছরগুলোতে বাজেটীয় অর্থায়নের প্রাধান্য থাকবে, বিশেষ করে বড় আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টগুলোতে অর্থায়নের জন্য, সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কেরজন্য এবং জ্বালানি সরবরাহ-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর জন্য। বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে গেলে বেসরকারি বিনিয়োগ যখন আরো বৃদ্ধি হবে এবং সরকারি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপযোগ অর্থায়ন উন্নত হবে, অন্যান্য উচ্চ-আয় দেশগুলোর মতো তখন বাজেট হতে অর্থায়ন ক্রমাগতভাবে মোট বিনিয়োগ তহবিলের একটি ক্ষুদ্র অংশে পরিণতি লাভ করবে।

পরিশিষ্ট ৮

পরিশিষ্ট ৮ক: বিপিডিবি-এর বার্ষিক ভর্তুকি/ গৃহীত ঋণ

অর্থবছর	বিলিয়ন টাকা
২০০৬-২০০৭	৩.০০
২০০৭-২০০৮	৬.০০
২০০৮-২০০৯	১০.০৭
২০০৯-২০১০	৯.৯৪
২০১০-২০১১	৪০.০০
২০১১-২০১২	৬৩.৫৭
২০১২-২০১৩	৪৪.৮৬
২০১৩-২০১৪	৬১.০০
২০১৪-২০১৫	৮৯.৭৮
২০১৫-২০১৬	৪৩.৬৫
২০১৬-২০১৭	৩৯.৯৫
২০১৭-২০১৮	৫৪.৮৬
২০১৮-২০১৯	৭৫.০০
২০১৯-২০২০	৩০.৭২
মোট	**৫৭২.৪০**

পরিশিষ্ট-৮খ: বিদ্যুতের চাহিদা ও উৎপাদন সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা (পিএসএমপি -২০১৬ বেইজ কেস অনুসারে কাম্য অবস্থার চিত্র)

বছর	বিদ্যুৎ চাহিদা (মেগাওয়াট)	উৎপাদন সক্ষমতার প্রয়োজনীতা (মেগাওয়াট)
২০২০	১৩,৩০০	২১,১৩০
২০২১	১৪,৫০০	২১,৩৬৯
২০২২	১৫,৮০০	২১,৫৬৪
২০২৩	১৭,১০০	২২,৩১৫
২০২৪	১৮,৫০০	২৩,৫৪৪
২০২৫	১৯,৯০০	২৪,৪৫৯
২০২৬	২১,৪০০	২৪,৭৮১
২০২৭	২২,৯০০	২৬,১৩১
২০২৮	২৪,৪০০	২৭,৮৮০
২০২৯	২৫,৯০০	২৯,১৭৮
২০৩০	২৭,৪০০	৩১,১২০
২০৩১	২৯,৩০০	৩৩,০০০
২০৩২	৩১,২০০	৩৪,১৬২
২০৩৩	৩৩,২০০	৩৫,৬৮৮
২০৩৪	৩৫,২০০	৩৮,৩৮৮
২০৩৫	৩৭,৩০০	৪০,৮৫৮
২০৩৬	৩৯,৪০০	৪৪,০৭৬
২০৩৭	৪১,৫০০	৪৬,৬৫২
২০৩৮	৪৩,৭০০	৪৮,৯৪৬
২০৩৯	৪৬,০০০	৫১,৪৮৪
২০৪০	৪৮,৫০০	৫৩,৯০৫
২০৪১	৫১,০০০	৫৬,৭৩৪

পরিশিষ্ট ৮গ: জ্বালানি ভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ২০৪১ পর্যন্ত প্রক্ষেপণ

(পিএসএমপি -২০১৬ বেইজ কেস অনুসারে কাম্য অবস্থার চিত্র)

	২০২০	২০২১	২০২৫	২০৩০	২০৩৫	২০৪১
জ্বালানি ভিত্তিক বিন্যাস (মেগাওয়াট)						
গ্যাস /এলএনজি	৯,৯২৮	৯,৫৬২	৮,৫১৫	৮,৭৩১	১৪,৭৪৬	১৯,৪৭৭
কয়লা	৫,৮৭৩	৫,৮৭৩	৬,৯৭৭	৯,৩৭৭	১১,৭৭৭	২০,১৯৫
তেল	৩,৯০০	৩,৭০৫	৪,০০৫	৪,২৫০	২,৩৭৩	৭০০
পানি	২৩০	২৩০	২৩০	৩৩০	৩৩০	৩৩০
পারমাণবিক	-	-	২,২৩২	৩,৪৩২	৪,৬৩২	৭,০৩২
সীমান্ত অতিক্রান্ত	১,২০০	২,০০০	২,৫০০	৫,০০০	৭,০০০	৯,০০০
মোট	**২১,১৩০**	**২১,৩৬৯**	**২৪,৪৫৯**	**৩১,১২০**	**৪০,৮৫৮**	**৫৬,৭৩৪**
জ্বালানি ভিত্তিক বিন্যাস (%)						
গ্যাস /এলএনজি	৪৭%	৪৫%	৩৫%	২৮%	৩৬%	৩৫%
কয়লা	২৮%	২৭%	২৯%	৩০%	২৯%	৩৫%
তেল	১৮%	১৭%	১৬%	১৪%	৬%	১%
পানি	১%	১%	১%	১%	১%	১%
পারমাণবিক	০%	০%	৯%	১১%	১১%	১২%
সীমান্ত অতিক্রান্ত	৬%	৯%	১০%	১৬%	১৭%	১৬%
মোট	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**

অধ্যায় ৯

আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজন

আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজন

৯.১ সূচনা

ডিজিটাল অবকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন এবং শীঘ্রই কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর প্রভাবে যেমনটি অনুমান করা হয়েছিল তার চাইতে অনেক দ্রুতগতিতে বৈশ্বিক মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটছে। তথাপি ১৯৭৪ সালে বিশ্বনেতাদের সামনে, জাতিসংঘের ২৯-তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেছিলেন, চার দশকের পরে আজো তা জ্বলজ্বলে সত্য: "আমরা এমন একটি বিশ্বের দিকে তাকিয়ে আছি যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ অগ্রগতির বদৌলতে মানবতা এক অসাধারণ সাফল্যের সক্ষমতা অর্জন করেছে। বিশ্বের সকল সম্পদ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমবন্টনের মাধ্যমে এমন কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে, যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের একটি সুখী এবং সম্মানজনক জীবনের নিরাপত্তা থাকবে।" তিনি দেখতে আশা করেছিলেন "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্য", যার মাধ্যমে সম্পদের "সুষম বন্টন" সম্ভব হবে। এই দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ গড়ার আহবানে, যার মাধ্যমে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে। এর মাধ্যমে, সম্মানিত আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সরাসরি নির্দেশনায়, নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

২০১০ সন থেকে বাংলাদেশের জিডিপিতে টেকসই ও দ্রুতগতির উন্নতি হচ্ছে; কার্যত, সাম্প্রতিক কালে দেশের ইতিহাসে জিডিপিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দেশ এখন নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে; তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো মানব উন্নয়ন সূচকে যে অগ্রগতি হয়েছে তা সাধারণত হয়ে থাকে বাংলাদেশ থেকে যাদের প্রবৃদ্ধি প্রায় দুই গুন বেশি তাদের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের শ্রমঘন ম্যানুফেকচারিং খাতের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতাসহ দেশের ডাইনামিক উদ্যোক্তারা ৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির দেশটিকে বিশ্বের বস্ত্র বাণিজ্যে ভিয়েতনাম ও ভারতের পরবর্তী দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে গেছে (বিশ্ব পরিসংখ্যান রিভিউ, ২০১৯)।

যদিও অসমতা অনেক বেড়ে গেছে এই সময়ে। এর একটি কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মজুরী বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন চাকুরীর সুযোগ তৈরী না হওয়া। তাই এই কম-দক্ষ শিল্পখাত যেমন তৈরী-পোশাক ও অভিবাসী শ্রমিকদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা দরকার। প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে যে ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে তা যোগান দিবে তা নিয়েও ভাবতে হবে। পরবর্তী ২০ বছরে অন্যান্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে; অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং অন্যন্য ধারা, যেমন- চক্রাকার অর্থনীতি, প্রধান প্রধান শিল্পগুলোতে বিদ্যমান চাকুরীর সংস্থানের সম্ভাবনাকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে।

অন্যান্য অনেক দেশের মতো আমাদেরও এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়তো কঠিন হবে। নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের যে শিক্ষা ও উদ্দীপনা দরকার, তা অনেক ক্ষেত্রেই নেই। কর্মীদের নতুন নতুন চাকরির জন্য প্রশিক্ষিত করাতে চাকুরীদাতারা হয়তো কমই আগ্রহ দেখাবে। সরকারি ক্ষেত্রে নানা জটিলতা, বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দ্বায়িত্ব থাকতে পারে। থাকতে পারে অনিশ্চয়তা ও সুযোগ বিষয়ক অভিন্ন মতের অভাব। কখনো কখনো নীতি নির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং কর্মীদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ এতটা সন্নিকটে নয় এমন ভুল ধারনা থাকে।

২০৪১ আলের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশে পরিনত করতে হলে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্ব পালন করতে হবে। এ দ্বায়িত্ব মূলত গোটা সমাজকে নিয়ে একটি জাতীয় ব্যবস্থা তৈরীর দায়িত্ব, যার মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, বেসরকারি খাত, বিদ্বৎ সমাজ, দক্ষতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন অংশীদার সবাই মিলে প্রয়োজনীয় নীতি পরিকল্পনা, অভিযোজন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

ডিজিটাল সম্ভাবনা বিকশিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগ-সক্ষমতার উন্নয়ন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আহরণ, উদ্ভাবন লালনসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বিনিয়োগ এবং অথনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে উচ্চ শিক্ষাকে সংযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথেষ্ট সুযোগ

রয়েছে। তবে প্যাটেন্ট, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এবং গবেষণা ও বিজ্ঞানে জিডিপি'র ১ (এক) শতাংশেরও কম বিনিয়োগ প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে এখনও এই সুযোগগুলোকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যায়নি। রোবটিক্স ও যান্ত্রিকায়নের কারণে শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, একবার যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেন্সর, সফটওয়্যার, উপাত্ত বিশ্লেষণ, উন্নত ও প্রকৃত বাস্তবতা, সংযোজনশীল ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সফটওয়্যারে গ্রন্থিত বিজ্ঞান ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে কৃষি, স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ নানা ধরনের বহুমুখী তৎপরতার সাথে সংযুক্ত হয়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এক নতুন মাত্রায় উন্নীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে পরবর্তী কয়েক দশক বার্ষিক ৯-১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। সফটওয়্যার, সর্বব্যাপী সংযোগশীলতা এবং ব্যবসায় প্রক্রিয়া পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেবার রূপান্তর সাধন এগিয়ে নেবে উচ্চতর দক্ষতার দিকে, কমিয়ে আনবে লেনদেনের ব্যয় এবং বর্ধিত উৎপাদনশীলতায় সঞ্চার করবে বাড়তি গতি। তদুপরি, উৎপাদনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন যানবাহন, হাইড্রোজেন অর্থনীতি (নিম্ন কার্বন অর্থনীতি) ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্রমবর্ধিত ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের সামনে উন্মোচিত হবে সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ। এছাড়া ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনারও চমৎকার সুযোগ তৈরি করবে, এবং এভাবে প্রতি বছর আমাদের ২ শতাংশেরও অধিক হারে মোট দেশজ আয় ক্ষতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রক্ষা পাবে।

২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় মর্যাদা অর্জন করতে হলে চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয় ১২,৫০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে হবে, যা বর্তমান মাথাপিছু আয়ের ৬ গুণেরও বেশি। এই উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আইসিটির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি সৃজনে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৯.২ উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি অভিমুখে অগ্রগতি

উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হলো জ্ঞান সৃষ্টি এবং পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এর ব্যবহার। যাতে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং একই সাথে তা দূষণ কমিয়ে আনে ও স্থানীয় অর্থনীতিতে উচ্চ মজুরির কর্মসংস্থান তৈরি করে। এই সম্ভাবনা আহরণের জন্য বাংলাদেশের উচিত লাভজনক উৎপাদনশীলতার জন্য জ্ঞান সৃজন ও ব্যবহার, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রণোদনায় গুরুত্ব প্রদান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এমন একটি জনবল তৈরি করা। যারা স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞানের অভিযোজনে নেতৃত্ব দানে সক্ষম। তদুপরি, প্রয়োজন জ্ঞান হস্তান্তর ও এর বিস্তার সুগম করে তোলার জন্য একটি কার্যকর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) কৌশল।

শিক্ষা ও আরএন্ডডি সক্ষমতা উন্নত করা হচ্ছে উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হবার জন্য। জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতিতে উন্নীত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন প্রকল্প (হেকেপ) গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণ, পঠন ও গবেষণা সক্ষমতার মান উন্নয়ন। এটুআই এর ল্যাব এর মাধ্যমে ২৫০টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে এবং তৃণমূল পর্যায়ের উদ্ভাবকদের কাছ থেকে উঠে আসা ৬০টি প্রটোটাইপ নিয়ে কাজ হচ্ছে যাতে করে সেগুলো সরকারি ও বেসরকারি খাতের মাধ্যমে বড় আকারে বাস্তবায়ন করা যায়। এদের অনেক উদ্ভাবনই সার্ভিস ইনোভেশন ফাণ্ডের (এসআইএফ) অর্থ সহায়তা পেয়েছে।

এটুআই এর কার্যক্রম দেশের শিক্ষা খাতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে, বিশেষ করে আইসিটি'র মাধ্যমে সবার জন্য সুলভ ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরীতে কাজ করছে যাতে "কেউ পিছনে পরে থাকবে না"। বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সুলভ ও মানসম্মত শিক্ষা লক্ষ্যে, "শিক্ষকদের পোর্টাল" এর মাধ্যমে ৪,০৩,৫০৭ জন শিক্ষককে এক সাথে আনা সম্ভব হয়েছে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত ২,৫৩,৭৫৯ মান-সম্মত কন্টেন্ট সবার জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। তাছাড়া ১,৭৭,৬৯১টি ক্লাস নেয়া হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার করে; সেই সাথে ১০০ এর বেশী মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরী করা হয়েছে কেবল বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য। তদুপরি শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৭,০০,০০ এরও বেশী শিক্ষা উপকরণ যেমন মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, সহজগম্য বই পঠন ও সহজগম্য অভিধান তৈরী করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো জেলা পর্যায়ে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তৃত করা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া এবং কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিসহ প্রযুক্তি উন্নয়ন শক্তিশালী করার

লক্ষ্যে নিবেদিতভাবে কাজ করে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে একটি আইসিটি বিভাগ গড়ে তোলার ফলে অর্থনীতির আইসিটি-চালিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ বাংলাদেশের জন্য একটি মূল উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসেবে জ্ঞান অর্থনীতি বিনির্মাণের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় উদ্ভাবনী ব্যবস্থাসহ জ্ঞান-বেষ্টনীর বিকাশে জ্ঞান ও প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গৃহীত হয়। সরকার ২০১১ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন ও গ্রহণ করে এবং এতে সন্নিবেশিত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট তৎপরতা ও গবেষণার নির্দেশিকাসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল উন্নয়ন, প্রচারণা ও তথ্য সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সুবিধাবলি। কারিগরি অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ষষ্ঠ ও সপ্তম উভয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এটি সুবিদিত যে, দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তির অভিযোজন ও গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অগ্রগতি সম্ভব। পর্যাপ্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত করতে যে আরো অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, তা পরিশিষ্ট ৯ক এ প্রদর্শিত হলো। মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতার অবদানকে বর্তমান ০.৩% থেকে ২০৩১ এ ২.৫% এ এবং ২০৪১ এ ৪.৫% এ এগিয়ে নিতে হলে, গবেষণা ও উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সহযোগিতা, গবেষণা ও উন্নয়নে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি, উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রয়োজন। সস্তা শ্রম থেকে উচ্চ প্রতিযোগ-সক্ষম ম্যানুফ্যাকচারিং, পদ্ধতি পরিশীলন ও উদ্ভাবনী সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিযোগ-সক্ষমতা উন্নীতকরণে শিক্ষা ও গবেষণা অর্থবহ অবদান রাখতে পারে। আর তা অর্জনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে যার বিস্তারিত অধ্যায় পরিশিষ্ট ৯ঘ এ আলোচনা করা হয়েছে । ২০৩১ ও ২০৪১ সালের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অঙ্গীভূত করার জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন হবে উদ্ভাবনমুখী নীতিতে একটি সুপরিকল্পিত বিবর্তন ধারার অনুসরণ, যা পরিশিষ্ট ৯খ এ বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় উদ্ভাবনী ব্যবস্থা চালিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে তুলতে বাংলাদেশের উচিত হবে কোরিয়া, ভারত ও তাইওয়ানের মতো দেশগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ, যা পরিশিষ্ট ৯ঙ এ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

ডিজিটায়ন ও সেবা রূপান্তর কাজ বর্তমানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ উদ্যোগের ফলে আইসিটি বিপ্লব বিশেষ গুরুত্ব পায়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা মূলত নিম্নবর্ণিত চারটি প্রধান অগ্রাধিকার সমন্বয়ে গঠিত:

- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা;
- সবচেয়ে অর্থপূর্ণ উপায়ে জনগণকে সংযুক্ত করা;
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া; এবং
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও বিপণন ব্যবস্থাকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলা।

উপরিবর্ণিত চারটি ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) মেয়াদে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের ফলে বেশ কিছু সংখ্যক নাগরিক-কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগ সেবা তৎপরতা সূচিত হয়, যেমন সরকারি স্কুলগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও শিক্ষক-কর্তৃক পাঠ্যবিষয় প্রস্তুত ও উন্নয়ন, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা, মোবাইল লেনদেনের সুবিধা, তৃণমূল পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে অনলাইনে কৃষি ও অন্যান্য জীবিকা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সেবা (ই-তথ্যকোষ) প্রদান।

সংযোগশীলতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন করে দেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সংযোগ প্রদান এবং চার স্তরের জাতীয় ডেটা সেন্টারসহ আইসিটি অবকাঠামো বিনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার এরই মধ্যে "ডিজিটাল দ্বীপ" উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রত্যন্ত এলাকা মহেশখালিকে মূলধারার ডিজিটাল কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করেছে। একই ধরনের উদ্যোগ সরকার অন্যান্য প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোতেও নিতে চায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ তার প্রথম যোগাযোগ-স্যাটেলাইট স্থাপন

করে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী জাতি হিসেবে বিশ্বে ৫৭তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ৪র্থ অবস্থানে উন্নীত হবার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া বাংলাদেশ ২য় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগও সফলতার সাথে স্থাপন করেছে। সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল কানেকটিভিটি প্রোভাইডারের আগমনে ইন্টারনেটের মান, ব্যয় ও বাহুল্যের বিষয়াদিতে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন হয়। ইতোমধ্যেই সংযোগশীলতা স্থাপন করে ১৮,৫০০টি সরকারি অফিসকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশকিছু আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয়েছে। আইসিটি নীতি ২০০৯ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত অগ্রাধিকার ২০১১ তে এ ব্যাপারে বিস্তৃত কর্ম-পরিকল্পনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই রূপকল্পের আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এর কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রাধিকারগুলোতে প্রায় সব কয়টি উন্নয়ন খাতই বেষ্টনীভুক্ত হয়। এই নীতিমালা ও নিয়মাবলি ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়। আইসিটি নীতি ২০০৯ হালনাগাদ করে এখন আইসিটি নীতি ২০১৫ হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এর সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য আইসিটি বিভাগ প্রণয়ন করেছে আইসিটি নীতি ২০১৮, যেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং আইওটি, বিগ ডেটা, রোবটিক্স-এর মতো বিকাশমান প্রযুক্তিসহ শিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন, ব্যবসায় বিকাশ ও ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অভীষ্ট অর্জনের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ই-বাণিজ্য সহায়তা দিতে ডিজিটাল ই-বাণিজ্য নীতি ২০১৮ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ জারি করেছে। আইসিটি বিভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি সেবার রূপান্তর সাধনের জন্য সমন্বিত ডিজিটাল সরকার ও কৌশলগত পথ-নকশা প্রণয়নের জন্যও কাজ করছে। এক্ষেত্রে কতিপয় প্রধান অর্জন নিম্নরূপ:

- এটুআই কর্মসূচির অধীনে সরকার ৫,৮৭৫টি ডিজিটাল কেন্দ্র ও ৪৬,৫০০টি ওয়েবসাইটের জাতীয় ওয়েব পোর্টাল স্থাপন করে সরকারি সেবায় সাধারণ জনগণের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করেছে। ৫,৮৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে এমনকি দূরবর্তী গ্রামগুলোর মানুষও অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের সেবা সুবিধা ভোগ করছে। ৫০.৩ কোটি প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ ৪,৫৭১ ইউনিয়ন এইসব ডিজিটাল সেন্টার থেকে নানাবিধ সরকারি ও বেসরকারি সেবা পেয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ৮,৫০০টি ডাকঘরকে ই-ডাকঘরে রূপান্তর করা হয়েছে যেখানে আইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- একটি নাগরিক কেন্দ্রিক ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছে, যাতে সারা দেশে অনিয়ম মুক্ত সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক এর টাকা পরিশোধের ব্যাস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন অন্তর্ভূক্তিমূলক ডিজিটাল লেনদেন সুবিধা দেয়ার ভিত্তি তৈরী করা হল। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৩,৯৫৮ টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে এক মিলিয়নেরও বেশী গ্রাহকের কাছে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা পৌছে দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল জিটুপি পরিশোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে ১.৫ মিলিয়নের বেশী নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন ভাতা পেয়েছেন। ডিজিটাল প্লাটফর্ম, যেমন: ই-চালান এবং ই-পে ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এই জিটুপি সেবা।
- এটুআই সার্ভিসের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য ই-মিউটেশন সেবা শুরু করা হয়েছে, যাতে নাগরিকরা সহজে এবং ঝামেলামুক্ত ভাবে ভূমি সেবা পেতে পারেন। তার সাথে আইসিটি ব্যবহার করে ভূমি অধিদপ্তরের কার্যক্রম উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৪৮৫টি উপজেলার ৪,৫৬০টি অফিস থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ নাগরিক এই সেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন।
- এটুআই ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব সরকারি সেবা ডিজিটাল করার একটি অনন্য, এবং সৃজনশীল উপায়। এই ব্যবস্থায় কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ সার্বিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এখন পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস ডিজিটাইজেশন রোডম্যাপ কর্মশালার অংশ হিসেবে ১,৮৫৬টি সেবা ডিজিটাল করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ২০টি সরকারি সংস্থার ৬৯৫টি সেবা ডিজিটাইজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- এটুআই আরো উদ্যোগ নিয়েছে এক ধরনের সমানুভূতি বা "এম্পেথি ট্রেনিং"-এর, যাতে করে সরকারি চাকুরিজীবীরা নাগরিকদের অবস্থানে নিজেকে ভাবতে পারে। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা দেবার ক্ষেত্রে যেন অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। এখন পর্যন্ত ৩৫,০০০ জন সরকারি চাকুরিজীবীকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তাঁরা সফল ভাবে ১৮০০টি মৌলিক প্রজেক্ট পাইলটিং করেছেন; এর মাধ্যমে সমাজে নতুন নতুন উদ্ভাবনের সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

- তৃণমূল পর্যায়ের সেবাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ই-সেবা বিতরণ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স থেকে স্বাস্থ্য সেবা, কৃষি ও অন্যান্য জীবিকা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সেবাসহ জনগণ কেন্দ্রিক ই-উদ্যোগের বাস্তবায়ন বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের সম্মান বয়ে আনে।

- ই-পেনশন, ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির মতো অত্যাবশ্যক ই-সরকারি সেবা একীভূত করার জন্য গঠিত হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ), যা ওয়ার্ল্ড সামিট অন দি ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে। "পরিচয়" নামক একটি সার্ভিস শুরু করা হয়েছে যার মাধ্যমে সকল নাগরিক তাঁদের জাতীয় পরিচয় পত্র যাচাই করতে পারেন।

- গত কয়েক বছর ধরে তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতের উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নাগরিক কেন্দ্রিক সরকারি সেবাসমূহ উদ্ভাবনের ফলে জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে দিকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়েছে । ২০১৮ সালের মধ্যে, বাংলাদেশ ৩৫ টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার সূচনা ঘটে ২০১২ সাল থেকে, এবং ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ১৯৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ০.৪৮৬ স্কোর পেয়ে ১১৫তম স্থান এবং ই-পার্টিসেপেশনে ০.৮০৩ স্কোর পেয়ে ৫১তম স্থান অধিকার করেছে।

- ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রর্বতন, ডিজিটাল নিরাপত্তা সংস্থা স্থাপন এবং সেবার ডিজিটায়নে আস্থা বৃদ্ধিসহ তা সবার জন্য সুগম করতে সাইবার নিরাপত্তার দিক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের মতো উদ্যোগ, শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সংযোগশীলতা স্থাপনে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগ, সরকারের ই-মেইল নীতি ২০১৮ এবং আইসিটি বিভাগের ডিজিটাল সংযোগশীলতা স্থাপন ডিজিটায়নের অগ্রগতিকে আরো বেগবান করবে।

- বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাপক প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মোট জনসংখ্যার ৮৪ শতাংশেরও বেশি মানুষ বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এবং তা বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের মাত্র ১২টি দেশে মোবাইল ফোনের সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ১০০ মিলিয়নের বেশি, এর মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত, যার বর্তমান সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি। এছাড়া, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৭০ মিলিয়ন।

- স্মার্ট ফোনের ব্যাপ্তি ও থ্রিজি'র সম্প্রসারণের সাথে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ব্যবহারও ত্বরান্বিত হয় বাংলাদেশে। প্রাথমিকভাবে দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই-সরকারি সেবার ব্যাপ্তি এবং ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধনশীল সংযোগশীলতা দ্বারা চালিত হয়ে দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ব্যবহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যা জুনের শেষে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার বৃদ্ধি পায় প্রতি সেকেন্ডে ২৬১ গিগাবাইট থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৬৭২ গিগাবাইট, এক বছর আগে যা ছিল প্রতি সেকেন্ডে ৪১১ গিগাবাইট।

এই সাফল্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অধিকতর অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল সেবার ক্ষেত্র ও সূচকে মধ্যম থেকে উচ্চ র‍্যাংকিং সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে তার অবস্থান দৃঢ় করা। ই-অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে আইসিটি ব্যবসা মডেল তৈরি, প্রবৃদ্ধির জন্য আইসিটি'র উন্নয়ন প্রভৃতি মূল ক্ষেত্রগুলোতে অগ্রগতির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে (পরিশিষ্ট ৯ক)।

ডিজিটাল প্রদর্শনীর সফলতা বাড়াতে গিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকার প্রায়শই এক অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হয়, সেটি হলোঃ সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ। সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে যে কোন পরিবর্তন সাধন প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই সেবা রূপান্তরের ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটাতে প্রথমে পরিবর্তন আনতে হবে এবং পরবর্তী পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে, এর মধ্যে ব্যবসায় তার স্বাভাবিক ধারায় ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে সেই পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিবে। এ ধরনের নিরন্তর পরিবর্তনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক পালাবদলের গুরুত্ব অপরিমেয়।

আইসিটি শক্তিশালীকরণ শিল্পে প্রাণচাঞ্চল্যের উদ্দীপকঃ বিগত নয় বছর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তার সক্ষমতা দেখিয়েছে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং ব্যবসায় প্রক্রিয়া আউটসোর্সিং (বিপিও) খাতগুলোতে ৩,০০০ এরও বেশি স্থানীয় উদ্যোগের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ আইসিটি শিল্পের আয়তন বর্তমানে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার। কালিয়াকৈর-এ ৩৫৫ একর জায়গার ওপর "বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পাক" উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই পার্ক হবে একটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং দেশের আইসিটি খাতের প্রাণকেন্দ্র। ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থল জনতা টাওয়ারে স্থাপন করা হয়েছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক। এছাড়াও, রাজশাহী ও সিলেটে দু'টি হাই-টেক পার্ক বিনির্মাণসহ আরো ১২টি জেলায় ১২টি আইটি পার্ক

গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এখানে কয়েকটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করছে এবং বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই পার্কে সফটওয়্যার গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছে। "যশোর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক" এর কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই শিল্পের মানবসম্পদ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাজীবী তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে আইটি পেশজীবীর সংখ্যা ২ মিলিয়নে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৬টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন ছাড়াও জেলা পর্যায়ে ১০টি আইটি ট্রেনিং ও ইনক্যুবেশন সেন্টার স্থাপন করেছে এবং এর সমান্তরালে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরো ২০টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বাধ্যতামূলক আইসিটি শিক্ষা প্রবর্তন করেছে।

ফ্রিল্যান্স অনলাইন কাজের জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই শীর্ষ গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে তার অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় বিপণী কেন্দ্র "ওডেস্ক কোর" বৈশ্বিক নগরীগুলোর মধ্যে ঢাকাকে তৃতীয় অবস্থানে চিহ্নিত করেছে, যেখানে পশ্চিম থেকে অনলাইন কাজ আউটসোর্স করা হয়ে থাকে। আউটসোর্সিং কাজে প্রায় ০.৫ মিলিয়ন ফ্রি-ল্যান্সার বর্তমানে কর্মরত।

অর্থায়ন, পরামর্শ, নেটওয়ার্ক ও বিনিয়োগ প্রস্তুতের মাধ্যমে সরকার সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভাবনী স্টার্ট-আপ সরবরাহের মাধ্যমে উদ্ভাবনে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তার পথ প্রশস্ত করতে সরকার আইসিটি বিভাগের অধীন উদ্ভাবনী নকশা ও উদ্যোক্তা একাডেমি (আইডিয়া) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই "আইডিয়া" প্রতিষ্ঠানটি ইনকিউবেশন স্পেসের প্রস্তাব প্রদান, অর্থায়ন ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে স্টার্ট-আপকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। জনতা টাওয়ার সফটওয়ার নামক দেশের প্রথম আইটি ইনকিউবেটোরটি সরকার উদ্বোধন করে যা উন্মুক্ত কর্মস্থল,আন্তরিক পরামর্শ সেবা এবং ১ বছর পর্যন্ত অন্যান্য একসিলেটর সুবিধাসমূহ প্রদান করে যাচ্ছে । সরকারের সাথে সাথে বেসরকারি খাতের অনেক স্টার্ট-আপ ইনকিউবেটর পরামর্শক ও বিনিয়োগকারীদের শক্তিশালী নেটওয়াকের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্ভাবনী স্টার্ট-আপের সাথে, বিশেষ করে টেক ভ্যাঞ্চারের সাথে, ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হাইটেক পার্কের উদ্ভাবনের সাথে সাথে এ সকল কর্মসূচি বাংলাদেশের উদ্ভাবনী টেক স্টার্ট-আপের সমন্বিত সমাধান দিচ্ছে।

ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে সচেতনতা তৈরীতে, কপিরাইট প্যাটেন্ট এবং ট্রেডমার্কের অফিস (প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্ক বিভাগ) প্রতিষ্ঠায় এবং আইপি বিষয়সমূহ সনাক্ত করার ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বেশ অগগতি লাভ করেছে।বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বিকল্প বিনিয়োগ আইন ২০১৫ অনুমোদন করেছে, যাতে ভেঞ্চার পুঁজি ও প্রাইভেট আইনগত সমতা তহবিলের মাধ্যমে ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সহযোগিতা দেয়া যায়। বাংলাদেশ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারই দ্যুতি চিহ্ন দেখা যায়, যখন মাত্র ৮ বছরের স্থানীয় ই-কমার্স ভেঞ্চার ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানে বিশ্বব্যাংকের বেসরকারি বিনিয়োগ শাখা থেকে সমতাভিত্তিক বিনিয়োগ পায় কিংবা তিন বছরের স্থানীয় বাইক শেয়ারিং সেবা ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে মূল্যায়িত হয়। সামগ্রিকভাবে জাতি কয়েক বছর আগে সফটওয়্যার সেবার ক্ষেত্রে ৯ সংখ্যায় পৌছেছে এবং পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে ১০ সংখ্যায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বাংলাদেশে ২০ শতকের প্রথম দিকের সুপ্ত কৃষি অর্থনীতির শ্লথ রূপান্তর ঘটছে। এটি ২১ শতকের উদ্ভূত শিল্প কেন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছে,যে শতকের মূল বৈশিষ্ট হলো সকল আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার। অগ্রগতির এই ধারা অবশ্যই মেনে চলা উচিত, যাতে শর্তাধীন সময় কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের আইসিটি শিল্প পরিশিষ্ট ৯ঘ-এ বর্ণিত বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। এখানে যে যে বিষয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে বলে মনে হয় তার মধ্যে রয়েছে হাইটেক নেট রপ্তানি, আইসিটি সেবা রপ্তানি, জ্ঞানমূলক কর্মসংস্থান, কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যয় এবং উচ্চ ও মাঝারি-উচ্চ প্রযুক্তি উৎপাদন।

৯.৩ উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সুবিধাবলির উন্মোচন

উন্নত দেশগুলোতে যখন ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আহরণের জন্য উচ্চমূল্য প্রতিষ্ঠানের উত্থান ঘটছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তখন প্রাধান্য দান করা হচ্ছে ই-প্রশাসন এবং স্মার্ট নগরীর ওপর। যেখানে পরিবহন, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে তথা জনসেবার উন্নয়নে আইসিটি ব্যবহার করা হয় এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিগত সুবিধাবলির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ গ্রামাঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় গুরুত্বপূর্ণ সেবা পৌঁছে দিচ্ছে এবং এভাবে ডিজিটাল সুবিধার সদ্ব্যবহার দ্বারা শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য নিরসনের সম্ভাবনার বীজ বপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির অগ্রগমন একদিকে আমাদের সামনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নব নব সম্ভাবনা মেলে ধরছে, সেই সাথে লাভজনক উপায়ে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসের অবদান রাখছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি থেকে শুরু করে জ্বালানি উৎপাদন, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে লাভজনক করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে রোবটিক্স ও অটোমেশন ভবিষ্যতের কাজ ও কর্মসংস্থানের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখতে যাচ্ছে। ম্যাককিনসি গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (এমজিআই) দেখিয়ে দেয় যে, এই প্রযুক্তিগুলো যে রূপান্তর সামনে আনবে, তা হলো উচ্চদক্ষ ও নিম্নদক্ষ কর্মসংস্থানের মধ্যে শ্রম বাজার সুবিধার মেরুকরণ। বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব এবং এমনকি খানাসমূহের একটি বিশাল অংশের জন্য উপার্জন অবরুদ্ধ হবার শংকা তৈরি হতে পারে। প্রক্ষেপণ রয়েছে যে, ২০২৮ এর মধ্যে ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি লোক চাকুরি হারাবে এবং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অগ্রসর প্রযুক্তি দ্বারা প্রায় ৫০ শতাংশ চাকুরি চিরকালের মতো হারিয়ে যাবার ঝুঁকি রয়েছে। অন্যদিকে, নতুন ধরনের কাজের সুযোগও তৈরি হবে। চ্যালেঞ্জ হলো- একেবারে হারিয়ে যাবার পরিবর্তে কি করে রূপান্তরশীল প্রযুক্তি দিয়ে আরো বেশি লাভজনক কর্মসুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

অনেক উন্নত দেশে, অংশত বয়স্ক জনসংখ্যার আধিক্য হেতু, তাদের মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির গতি ম্লান হয়ে পড়ায় উচ্চতর উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে অগ্রসর প্রযুক্তিকে আশির্বাদ মনে করা হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, অটোমেশন এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য হুমকি হয়ে এসেছে, যা এশিয়ার দেখানো অর্থনৈতিক মডেলের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে দিতে পারে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "উদীয়মান জাতিগুলোর সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা সেই সুযোগ আর পাবে না, যা চীন অতীতে পেয়েছিল"। চীনের বর্ধনশীল আয়-স্তর ও বয়স্ক জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে শ্রমঘন কাজগুলো বাংলাদেশের মতো অন্যান্য দেশে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাই প্রযুক্তির বিস্তারে শংকিত না হয়ে, লাভজনকভাবে টিকে থাকার জন্য তৎপরতা, প্রস্তুতি ও কৌশল স্থির করতে হবে।

বস্তুত, জাতিসংঘ উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের সাথে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের একত্রীকরণকে ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের দু'টি প্রধান উপায়ের মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত করে। সমস্যা হলো স্থানীয় উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের মাঝে এগুলোকে অঙ্গীভূত করা।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শ্রমঘন কাজের ক্ষেত্রে রোবটিক্স ও অটোমেশন হুমকি সৃষ্টি করলেও নতুন নতুন প্রযুক্তি অশেষ সম্ভাবনাময় নতুন সুযোগও মেলে ধরবে। উদাহরণ হিসেবে, এমজিআই-এর গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয় যে, ১২টি প্রযুক্তি সম্ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ ২০১২-২০২৫ এ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধিতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ক্রমবর্ধিত হারে অবদান রাখতে পারত। এটি উল্লেখ করা হয় যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্রিক নির্ভুল কৃষির ১৫ থেকে ৬০ শতাংশ কৃষির ফলন বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বিসিজি ও সিআইআইএ-এর গবেষণায় দেখা যায় যে, পরবর্তী কয়েক দশক ব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের বেশি অর্জন করতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত চীনের সাফল্যের অতীত মডেলের বিকল্প বেছে নেয়া। বরং উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবসহ অন্যান্য প্রযুক্তির বিকাশমান সুযোগগুলো গ্রহণ করা, যাতে পরবর্তী ১০ থেকে ১৫ বছর কর্মসংস্থান সহায়ক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো প্রযুক্তির অগ্রগমনকে উদ্দেশ্য সাধনের শক্তি হিসেবে গ্রহণ। বিশেষজ্ঞদের মতে উচ্চ আয়ের কর্মসুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য মোকাবেলা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ একটি উদ্ভাবনমুখী শিক্ষামূলক বির্নিমাণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈষম্য নিরসনের জন্য "আইসিটি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ প্রযুক্তিগত অভিযোজন, গ্রহণ, উদ্ভাবন ও প্রসারণের জন্য কৌশলের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ওপর" প্রাধান্য প্রদান আবশ্যক। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উন্মোচনের সাথে রোবট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কম্পিউটারিত অ্যালগোরিদম, মোবাইল সেন্সর, থ্রি-ডি প্রিন্টিং এবং চালকবিহীন যানবাহন এসে হাজির হয়ে বিশ্বব্যাপী মানব জীবনের রূপান্তরকে তীব্র করবে, যা বাংলাদেশে কাজের ক্ষেত্রে বৈরী প্রভাব ফেলবে। এই পরিবর্তনগুলোর বিরুদ্ধাচরণ এবং এর "অমানবীয় প্রভাব" বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবার পরিবর্তে কীভাবে এই বিকাশমান প্রযুক্তিগুলো কর্মসংস্থান ও গণনীতিকে প্রভাবিত করছে তা আগে নিরূপণ করা দরকার, যাতে আমরা প্রান্তে নিক্ষিপ্ত না হয়ে উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে যেতে পারি।

৯.৪ বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল রূপান্তরের দৃশ্যকল্প

সংযোগশীলতা, প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নীতি প্রণয়নে ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতির বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা ডিজিটায়ন ও সেবা রূপান্তর প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যে প্রধান সেবাসমূহ প্রদান করা হয়, তা ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল হওয়ার ফলে লেনদেন ব্যয়হ্রাস পাবে। এতে ২০৪১ সালের মধ্যে যে সকল সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সকল সেবা রূপান্তরিত হয়ে যাবে ই-সেবায়। লেনদেন ব্যয় কমানো ছাড়াও এ ধরনের সেবা রূপান্তরের ফলে কৃষিতে ফলন ব্যবধানহ্রাসের এক অনন্য সুযোগ তৈরি হবে এবং অন্যান্যের মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক ও বিমার ক্ষেত্রে মান ও প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট ব্যবধান কমে যাবে। এভাবে নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্ট হবে এবং আয় ব্যবধানওহ্রাস পাবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের জন্য সরকার পরিশিষ্ট ৯ক এ প্রদর্শিত প্রধান প্রধান নির্দেশকের অর্থবহ উন্নতি সাধন করবে। এই সকল নির্দেশকে বাংলাদেশের অভীষ্ট হবে বিশ্বের ৪০টি সবচাইতে ভালো অর্জন সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে তার অবস্থান নিশ্চিত করা। উদাহরণ হিসেবে, বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ই-অংশগ্রহণ র‍্যাংকিং ২০১৮ সালে ৮২ থেকে ২০৩১ সালে ৪০ এবং ২০৪১ সালে ২০তম অবস্থানে উন্নীত করা হবে। একইভাবে জনপ্রতি ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার প্রতি সেকেন্ডে অনূর্ধ্ব ১০ কিলোবাইট থেকে ২০৪১ সালে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ কিলোবাইটে উন্নীত করতে হবে।

সারণি ৯.১: ডিজিটাল পরিমণ্ডল ও সূচকে বাংলাদেশের যোগ্যতার বিবর্তন

উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র ও নির্দেশক	তিনটি প্রধান মেয়াদে বাংলাদেশের উন্নয়ন স্তর					
	২০১৯ পর্যন্ত		২০২০-২০৩১		২০৩১-২০৪১	
বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক ২০১৯						
	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক
আইসিটি অভিগম্যতা*	৩৫.৭	১০৯	৫০	৫০	৮৫	২০
সরকারের অনলাইন সেবা	৭৮.৫	৫১	৭৫	৪৫	৯০	১৫
ই-অংশগ্রহণ	৮০.৩	৫১	৭০	৪০	৮৫	২০
আইসিটি ও ব্যবসায় মডেল সৃষ্টি	৫০.২	১০৩	৬৫	৫০	৭৫	২০
আইসিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক মডেল সৃষ্টি	৪২.১	১০৭	৫৫	৬০	৬৫	৩০
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম, ১৪১টি দেশের মধ্যে র‍্যাংকিং, ২০১৯						
	স্কোর	র‍্যাংক	স্কোর	র‍্যাংক	স্কোর	র‍্যাংক
স্কুলে ইন্টারনেট অভিগম্যতা	৩.৩	১১৫	৫	৬০	৬	৩০
ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (প্রতি ১০০ জনে)+	১২.৭	৮৮	২৫	৫০	৪০	২০
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ	৯.২	১১১	৪০	৬০	৫৫	৪০
মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করা	৮১.১	১০৬	১০০	৭০	১২০	৪০

* তারের লাইনে ব্রডব্যান্ড অ্যাকসেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; + ১ -৭ মাপের স্কোর নয়।

উপাত্তের উপলব্ধি, ব্যবহার ও নতুন অবকাঠামো থেকে একদিকে যেমন উদ্ভূত হয় অভাবিত সুযোগ ও সুফল, তেমনি আবার চ্যালেঞ্জও এসে হাজির হয়। উদ্ভূত তথ্য বিপ্লব পুরাতন সেবার উন্নতির জন্য এবং নতুন নতুন সেবার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধা তৈরী করছে। এটি এমন একটা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করছে যেখানে সকল অংশীজনরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং কাউকে পেছনে ফেলে রাখবে না। ডিজিটাল পরিবর্তনের দ্রুতগতির সাথে কার্যকরভাবে সাড়া দানের উপযোগী করতে প্রতিষ্ঠান ও এর নিয়ম পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা ও উদ্ভাবন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি সমৃদ্ধশালী, টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলোতে সরকারকে প্রাধান্য দিতে হবে সেগুলো হলো: (১) অভিগম্যতা ও অভিযোজন; (২) দায়িত্বশীল ডিজিটাল রূপান্তর; (৩) উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত, তথ্যসমৃদ্ধ প্রশাসন; (৪) সুরক্ষিত ও সহিষ্ণু জনগোষ্ঠী, প্রক্রিয়া ও অনুশীলন; (৫) ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক, ইন্টারোপারেবল ডিজিটাল আইডেনটিটি এবং (৬) আস্থাশীল উপাত্ত উদ্ভাবন। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে বাংলাদেশকে ঝুঁকি নিয়ে হলেও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সরকার ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ সেবা সরবরাহ থেকে সরে গিয়ে অধিক সক্ষম ডিজিটাল প্লাটফর্ম এবং অবকাঠামো তৈরীর দিকে ধাবিত হবে। যাতে বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং বিদ্বজ্জন সক্ষম হয় এবং আধুনিক ব্যক্তিগত সেবাসমূহের জন্য নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

বাংলাদেশের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রবৃদ্ধি চালকে মৌলিক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে উপকরণ প্রাধান্যের স্তর থেকে উদ্ভাবনভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোতে হবে । উৎপাদন অগ্রাধিকারে সরল পণ্যের নকল ও প্রতিরূপ থেকে উদ্ভাবনে পরিবর্তনসহ প্রক্রিয়া ও পণ্য আধুনিকায়নে জোর এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মোট উৎপাদিকার অবদান বৃদ্ধির ওপর যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাধান্য দিতে হবে একটি শক্তিশালী আইসিটি গবেষণা ও উন্নয়ন বাজার তৈরির জন্য প্রাথমিক স্তরে সরকারি বিনিয়োগ গড়ে তোলার ওপর, যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ তাদের রাজস্বের ৩০ শতাংশ পরিমাণ হয়। কৃষি থেকে পরিবহন সকল অর্থনৈতিক খাত এবং এগুলো উৎপাদনে তাদের পণ্য ও প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বিজ্ঞান-নিবিড়-সফটওয়্যার উদ্ভাবনের সোর্সিং-এ বর্ধিত হারে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে। মেধা সম্পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইকোসিস্টেমের সাথে একীভূত করতে হবে এবং সেগুলো পণ্য ও প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হবে, যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উদ্ভাবন থেকে ২৫ শতাংশ আয় আসে। আইসিটি উদ্ভাবনের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার হার ৭০ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। যাতে সড়ক দুর্ঘটনার ফলে মোট দেশজ আয়ে বর্তমানে যে প্রায় ২ শতাংশ ক্ষতি হয়, তা অনেক কমিয়ে আনা সম্ভবপর হবে। তদুপরি দেশীয় পণ্য ও এদের প্রসেসের দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য বিকাশমান প্রযুক্তি উদ্ভাবন ব্যবহার করা দরকার। জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থার সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোকে একীভূত করা হবে, যাতে এসএমইগুলো এই লক্ষ্য সামনে রেখে তাদের পণ্যের ডিজাইন ও প্রসেস উন্নয়নের কাজ শুরু করতে পারে। ফলে ২০৪১ সালের মধ্যে আইসিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ঘিরে স্থানীয় উদ্ভাবনের অবদান তাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধিতে বার্ষিক ২০ থেকে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত রাজস্ব যুক্ত হতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উত্থানকে বাংলাদেশের অনুকূলে রূপান্তর করতে হবে। আইসিটি, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনকে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি করতে বাংলাদেশের গবেষণা ও উন্নয়ন বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হবে, যা ২০৪১ এ মোট দেশজ আয়ের ২ শতাংশে উন্নীত হবে, যেমনটি পরিশিষ্ট ৯গ এ প্রদর্শিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে, এ ক্ষেত্রে সরকারের অবদান অধিক হবে, ২০৪১ সালের মধ্যে আরএন্ডডি- তে বেসরকারি খাতের অবদান হবে ৮০ শতাংশ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে প্রধান উদ্ভাবন সূচকগুলোতে তার অবস্থান উন্নীত করা, যা পরিশিষ্ট ৯খ ও পরিশিষ্ট ৯গ এ তুলে ধরা হয়েছে। প্রযুক্তি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গতি বিদ্যমান মূল প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন থেকে অর্থনীতির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনের দিকে বিবর্তিত হতে থাকে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নীত করে শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে তাদের বর্তমান ভূমিকা সীমিত না রেখে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও শিল্প সংক্রান্ত উদ্ভাবনের দিকে চালিত করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রায় ২০ শতাংশের গন্তব্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অগ্রগতির এই পথ পরিক্রমায়, গবেষণা ও উন্নয়ন লক্ষ্য হবে প্রযুক্তি আত্মীকরণ ও অভিযোজন থেকে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে অভিগমন। এই উদ্ভাবন-চালিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন-সক্ষমতায় র‍্যাংকিং-এ ১৯৩০ সালে ১৩৭টি দেশের মধ্যে ৯৭ থেকে লাফিয়ে ২০৪১ এ পৌঁছে যাবে। যেমনটি পরিশিষ্ট ৯ঙ এ উল্লেখিত হয়েছে। প্যাটেন্ট পূরণ থেকে শুরু করে প্রকাশনা পর্যন্ত প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল ২০৪১ সালের মধ্যে একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিবে।

আইসিটি ও উদ্ভাবন শিল্পের প্রবৃদ্ধি বেগবান করাই হবে প্রধান লক্ষ্য। রাজধানী ঢাকাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রযুক্তি উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পীঠস্থান গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, কক্সবাজার ও এর উপকূলরেখা আইসিটি উদ্ভাবন-কেন্দ্রিক সামুদ্রিক মৎস্য চাষ ও বায়ু শক্তি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। বৈষম্য সৃষ্টির জন্য প্রযুক্তিকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এই প্রযুক্তিই ক্যালিফোর্নিয়ার খামার ভূমিতে গড়ে তোলে নতুন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র, একটি গ্যারেজে জন্ম নেয় সিলিকন ভ্যালি। একইভাবে প্রযুক্তিই ঘুমন্ত শহর ব্যাঙ্গালোরকে রূপান্তরিত করেছে ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্রভূমিতে। বাংলাদেশও রাজধানীর বাইরে নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রযুক্তিকে নতুন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের জন্য বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে ২০৪১ সালের মধ্যে মোট বাণিজ্যের শতাংশ হিসেবে ০.২ থেকে ২০ শতাংশে এর হাইটেক নেট রপ্তানির উন্নয়ন, মোট বাণিজ্যের শতাংশ হিসেবে ১.২ থেকে ৮ শতাংশে আইসিটি সেবা রপ্তানি এবং বিদ্যমান ৮ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে জ্ঞান-নিবিড় দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করা, যা পরিশিষ্ট ৯ঘ এ তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বাস্তবায়ন প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে উচ্চ আয়ের কর্মসুযোগ তৈরি করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উন্মোচিত প্রযুক্তি সম্ভার সহ বাংলাদেশ কিভাবে তার নিজের জন্য আইসিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে সর্বোচ্চ সুফল আদায় করতে পারে - এটি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাগ্রসর অটোমেশন দ্বারা কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্র অব্যাহতভাবে হারিয়ে যাচ্ছে এবং অটোমেশনের ফলে প্রযুক্তি সম্ভাবনার প্রদর্শনী অনুযায়ী আরএমজি খাতের কায়িক শ্রমের অধিকাংশই অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। তাই সরকার, বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজ, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য এখনই

সময় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়নের অনুকূলে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধের জন্য নীতি ও প্রশাসনে উদ্ভাবনমূলক নতুন পদ্ধতি গড়ে তুলতে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা। উদাহরণ হিসেবে, ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশের ১৬০ মিলিয়ন মানুষের জীবনে অশেষ সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে। কৃষি ও জনস্বাস্থ্য এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ড্রোন স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারবে। নির্ভুল চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে ড্রোন ব্যাপকভাবে সহায়ক হতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব খাদ্য পরিচর্যা ও পরিবেশের মতো মানবিক অবস্থার যে ক্ষেত্রগুলো উন্নত করতে পারে, বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলে সেই তাৎপর্যময় ক্ষেত্রগুলোতে প্রাধান্য দেয়া হবে। বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত চালিত হয় নিম্নব্যয় প্রতিযোগ-সক্ষমতাসহ একটি বিশাল তারুণ্যময় শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের মতো প্রথাগত শক্তি দ্বারা, যা জুতা, বস্ত্র, তৈরি পোশাক ও পাটের মতো মূল শিল্প খাতগুলোকে সহায়তা যোগায়। অবকাঠামোর ওপর প্রাধান্য প্রদান সত্ত্বও, প্রাগ্রসর প্রযুক্তি যেমন ইন্টারনেট অব থিংক্স, ব্লকচেইন, রোবটিক্স, এবং সংযোজনীয় ম্যানুফ্যাকচারিং বিদ্যমান শক্তির সাথে একীভূত করা হলে তা ম্যানুফ্যাকচারিং-এর প্রতিযোগ-সক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। বাংলাদেশ এই বর্ধিত ও কল্প-বাস্তবতার সুবিধা গ্রহণ করবে, যাতে অনেক দ্রুতগতিতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয়, এমনকি নিম্নদক্ষ কর্মীরাও যাতে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে জটিল দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জন করে। কারখানাগুলোতে কর্মসুযোগ হারিয়ে যাবার চেয়ে আরো বেশি কাজ তৈরির জন্য বিগ ডেটা, ডেটা অ্যানালিটিক্স, কৃত্রিম বুইদ্ধিমত্তা ও যান্ত্রিকায়ন একীভূত করার ওপর সবিশেষ প্রাধান্য প্রদান করা হবে।

৯.৫ ডিজিটাল ও উদ্ভাবনমূলক সুবিধাবলির ব্যবহার কৌশল

উদ্ভাবনী অর্থনীতির গঠন কৌশল নিরূপণে বাংলাদেশকে মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখী হয়ে এগোতে হবে যাতে টিএফপি'র অবদান থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন ধারাকে বিদ্যমান ০.৩ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশে উন্নীত করা যায়। রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত আয়ের মর্যাদায় আসীন হতে বাংলাদেশের জন্য মোট দেশজ আয়ে মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতার এরূপ বিশাল অবদান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে কোরিয়া, ভারত, তাইওয়ান ও অন্যান্য দেশগুলো থেকে আহরিত শিক্ষার আলোকে (পরিশিষ্ট ৯৬ এ প্রদত্ত সারমর্ম অনুযায়ী), সরকারের উচিত একটি ত্রি-মুখী কৌশল গ্রহণ: (১) সফটওয়্যার ও প্রসেস উদ্ভাবন এবং সেবার ডিজিটায়ন; (২) বিজ্ঞান ও হাই-টেক উদ্ভাবনের সাথে শ্রম সুবিধার একীকরণ; এবং (৩) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন - প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিম্ন কার্বন অর্থনীতির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চৌকস যন্ত্রপাতির ব্যবহার, যা চিত্র ৯.১ এ প্রদর্শিত হলো।

চিত্র ৯.১: বাংলাদেশের উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতির জন্য ত্রি-মুখী কৌশল

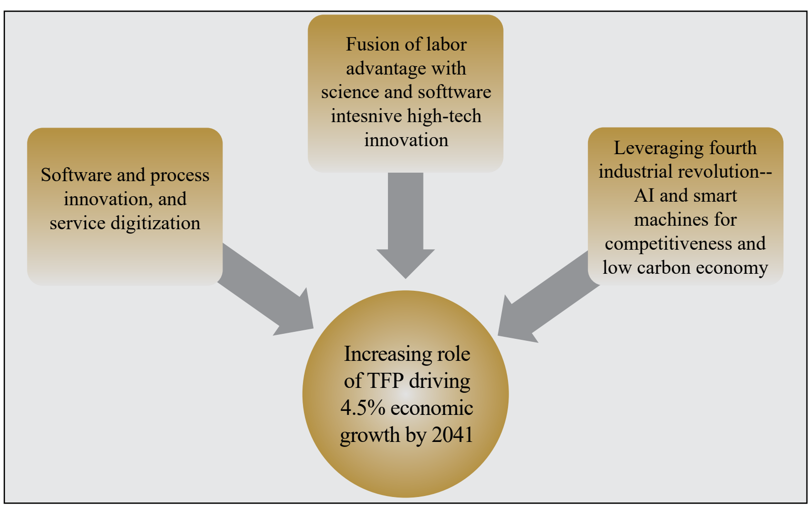

সফটওয়্যার ও প্রসেস উদ্ভাবন এবং সেবার ডিজিটায়ন: প্রবৃদ্ধির জন্য আইসিটি'র ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রবহমান সম্ভাবনা রয়েছে। রি-ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সেবার ডিজিটায়ন ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাবে এবং লেনদেন ব্যয় হ্রাস করবে, ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চতর হবে। এই কৌশলের মূলে রয়েছে সফটওয়্যার উদ্ভাবন। এক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানির বিস্তার ঘটবে।

স্বল্প সেবা প্রাপ্তদের জন্য সরকারি সেবা প্রদানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি এবং অর্থ পরিশোধে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার সমতা-বিধানকারী। এগুলো সেবাসমূহকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যায়। এমনকি ব্যক্তির আঙুলের ডগায় নিয়ে আসে। এতে দুরত্ব, খরচ ও ভাড়া কমে যায় এবং নগদহীন সমাজের দিকে ধাবিত হওয়া যায়। এরূপ সক্ষমতা অর্জনও সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যাতে জনগণের জন্য উত্তম সেবা নিশ্চিত করা যায়। এটি এমনভাবে করতে হবে যাতে এটি সহজে এবং দ্রুততার সাথে জনগণের তথা সরকারি কর্মজীবী ও রাজনীতিবিদ উভয়ের, বেসরকারি খাত এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

যা হোক, প্রায় অপরিহার্যভাবে দেশের ডিজিটায়ন প্রচেষ্টাসমূহে রয়েছে বহুমুখী, আনইন্টার-অপারেবল আইডি ব্যবস্থা, ডিজিটাল সেবা পদ্ধতি এবং ডিজিটাল অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা। এভাবে এগুলোকে একত্রিত করাটাই যথেষ্ট নয়, বরং সমন্বিত সেবা এবং অর্থ পরিসেবার প্লাটফর্মেও মাধ্যমে সমস্ত ক্যাম্পে ইন্ট্রা-অপারেবিলিটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এটি কেবল গণমুখী সেবার নকশা প্রণয়ন সহজতর করছে তা নয়। অর্থাৎ, এটি সরকারের সকল সেবার সাংগঠনিক কাঠামোর চেয়ে নাগরিকদের চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। এটি একেবারে নতুন ধরনের সেবাসমূহের নকশা প্রণয়ন সহজতর করেছে।

জাতীয় ডিজিটায়ন প্রচেষ্টার গতি বাড়িয়ে এটির পরিপক্বতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

১) বহুমুখী বিভাগের সেবার ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারা (সেবা ইন্টার অপারেবিলিটি);

২) বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং এবং অ-ব্যাংকিং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন;

৩) শারীরিক ও মৌখিক অধিকারের বিষয়গুলোতে প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী নাগরিকের নাগালের মধ্যে থাকতে হবে; এবং

৪) সকল সেবা প্রদানকারী এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যেক নাগরিককে সনাক্ত করবে (ইউনিক আইডি)।

উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপে, উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনায় ও বিচ্ছিন্নতা সনাক্তকরণে তথ্য বিরাট ভূমিকা পালন করে। অতএব এটি প্রমাণ সাপেক্ষ নীতিনির্ধারণকে পরিবর্তনের উল্লম্ফনে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে, বিদ্যমান সেবা এবং নুতন নুতন সেবা সৃষ্টির উন্নতিকে সক্ষম করে তুলতে উদ্ভুত তথ্য বিপ্লবকে শক্তিশালী করতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়।

একই সময়ে প্রযুক্তির সম্ভাব্য শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাবসমূহকে কর্মপোযোগী,চলমান এবং পর্যাপ্তভাবে মোকাবেলা করতে হবে। যাতে এটা নিশ্চিত হয় যে,অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই হয়েছে এবং সামাজিক সংহতি শক্তিশালী হয়েছে। মিথ্যা সংবাদের মতো উদ্বেগজনক বিষয়সমূহের বিস্তার এবং বড় বড় কোম্পানীর ব্যক্তিগত তথ্যেও নিয়ন্ত্রণ নাগরিক কেন্দ্রিক নিয়মানুবর্তিতা এবং গণ ডিজিটাল সাক্ষরতার মাধ্যমে সনাক্ত করতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলো বহুমুখী অংশীজন অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবা সরবরাহকে সহজতর করতে পারে এবং উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন গ্রহণ করতে পারে। যাতে ক্রয়, সক্ষমতা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হালনাগাদ ত্বরান্বিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে শ্রম সুবিধার একীকরণ: যদিও কমে যাচ্ছে, তথ্যানুসারে এখনো বাংলাদেশে পর্যাপ্ত শ্রম সুবিধা রয়েছে। অন্যদিকে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করছে বিপুল সংখ্যক স্নাতক ডিগ্রিধারী। এই কৌশলগত উপাদান সামনে নিয়ে আসে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মানসিক সক্ষমতার সাথে শ্রম সুবিধার একীকরণের বিষয়টি, যা ক্রমবর্ধনশীল ও টেকসই প্রতিযোগিতা সুবিধা গড়ে তোলার জন্য জরুরি। উদাহরণ হিসেবে, মান বৃদ্ধি ও বর্জ্য হ্রাসের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় উদ্ভাবন যুক্ত করে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের শ্রমভিত্তিক সাফল্যকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। একইভাবে চাষাবাদে সফটওয়্যার উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের একত্র মিশ্রণ ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি অপচয়ের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। স্থানীয় গ্র্যাজুয়েটদের উদ্ভাবনে যুক্ত করে প্রতিযোগ-সক্ষমতা উন্নয়নে সাফল্য পাওয়া গেলে তা সার্বিক রপ্তানি তৎপরতায় গতি সঞ্চার করবে। এর ফলে বিদ্যমান রপ্তানি খাতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে, যা প্রযুক্তির কারণে হারিয়ে যাওয়া কর্মসংস্থানের চেয়ে আরো বেশি সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। এছাড়াও, স্মার্টফোন সংযোজন বা ইলেকট্রনিক পণ্যের মতো আমদানি বিকল্প খাতগুলোতে প্রতিযোগ-সক্ষমতার উন্নতি শুরু হবে, ফলে রপ্তানির নতুন নতুন জানালা উন্মোচিত হবে।

কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি: রূপকল্পের কৌশল বাস্তবায়ন-সাফল্যের মূল লক্ষ্য হলো গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন বাজারের সৃষ্টি। একবার যদি আমরা গবেষণা ও উন্নয়ন বিনিয়োগকে লাভজনক উদ্ভাবনের একটি পরিমাপযোগ্য মডেলে রূপান্তর করতে পারি, বাজার শক্তি তখন এই সাফল্যকে উন্নীত করতে সক্রিয় হয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করবে।

১) ***গবেষণা ও উন্নয়ন ও উদ্ভাবন কাউন্সিল:*** এ কাউন্সিল চিহ্নিত উদ্ভাবনমূলক সুযোগের সদ্ব্যবহারকল্পে এর চাহিদা ও সরবরাহ উভয় দিক শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা ছাড়াও প্রয়োজনীয় নীতি ও নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার কাজও সম্পন্ন করবে। উদ্ভাবন কাউন্সিল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাংলাদেশকে উপকরণ-প্রাধাণ্যের স্তর থেকে উদ্ভাবন-চালিত স্তরে উন্নীত করবে। সেই সাথে প্রাধান্যে পরিবর্তন এনে তৈরি পোশাক ও অনুকরণ-ভিত্তিক আমদানি বিকল্পের মতো রপ্তানিমুখী হাল্কা শিল্প থেকে জ্ঞান অর্থনীতিতে রূপান্তর ও সংহতির জন্য উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিকশিত করবে। ফলে সংশ্লিষ্ট নির্দেশকগুলোতে বাংলাদেশের র‍্যাংকিং উর্ধ্বমুখী হবে, যা পরিশিষ্ট ৯খ এ তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ৯.২: বাংলাদেশের জাতীয় উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম

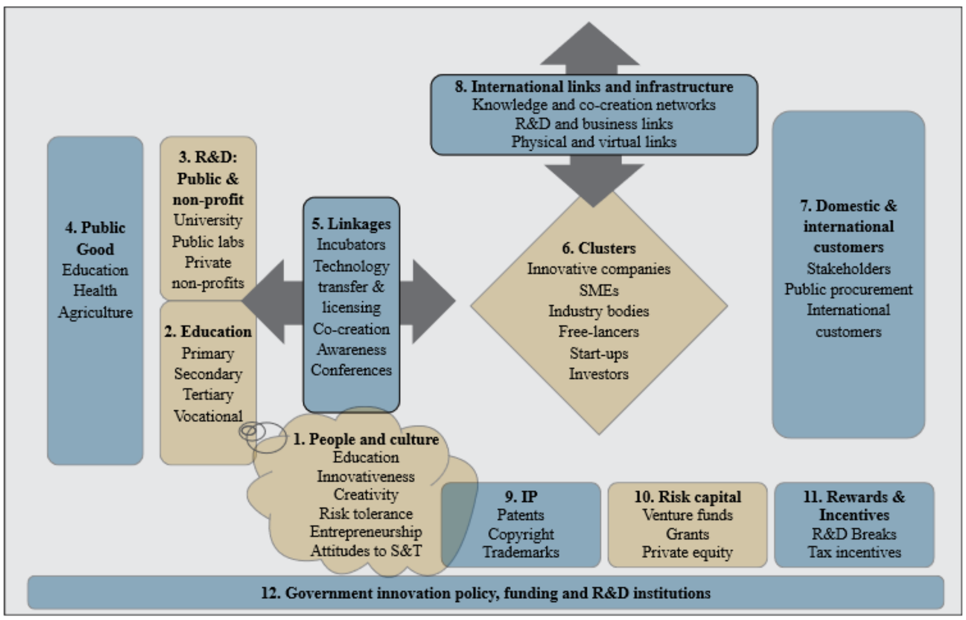

উৎস্য : গোরান রোস, লিজা ফার্ণস্ট্রোম, অলিভার গুপ্ত (২০০৫): "জাতীয় উদ্ভাবন পদ্ধতি:ফিনল্যান্ড, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনা" হতে গৃহীত।

ইকোসিস্টেমের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে বাম-ডান প্রক্রিয়া প্রচার অনুসন্ধানের মাধ্যমে এবং তারপরে ডায়াগ্রামের উচ্চ নীচে সহায়ক কর্মীদের আলাদা আলাদা ভূমিকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে। চরম বামে অবস্থানকারী কর্মীরা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তার ও চাহিদার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে, যা পূর্ণতা পায় মাঝামাঝি অবস্থানের কর্মীদের মাধ্যমে এবং চূড়ান্তভাবে ডানে চাহিদা/দাবী আসে কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে সরবরাহ করা হয়। যেখানে জনগণ ও সংস্কৃতি (আইটেম-১) চূড়ান্ত মধ্যস্থতাকারী, যারা উদ্ভাবনের মাধ্যমে জীবনের গুণগতমানের উন্নতিবিধানের আকাংখ্যা নির্ধারণ করে। শিক্ষা (আইটেম-২),সামাজিক মনস্তত্ব ও প্রত্যাশাসমূহ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে গবেষণা এবং উন্নয়ন কমিউনিটি (আইটেম-৩) সম্ভাব্য জিনিসের একটি গতিশীল চিত্র তৈরী করে। সরকারি পণ্য নির্দেশক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মমুখী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন পণ্য ও সেবাসমূহের জন্য চাহিদা প্রত্যাশা করে ।

প্রয়োজন ও চাহিদার প্রকাশ মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থানকারী উদ্ভাবকদের মধ্যে সংযোগের (আইটেম-৫) হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়। এই লিংকেজসমূহের মধ্যে রয়েছে অনেক স্থানীয় কর্মীরা, যারা সচেতনতা তৈরী করে,ধ্যান-ধারণার উৎপাদনশীলতাকে উদ্দীপিত করে, জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিতরণ করে এবং আদিকল্প সমাধানের উন্নয়ন ঘটায়। এটিকে সাধারণত দেখা হয় উৎপাদন ইনকিউবেশন প্রক্রিয়া হিসাবে। প্রকৃত উদ্ভাবন উন্নয়ন ক্লাস্টারগুলোর মধ্যে ঘটে(আইটেম-৬), যেখানে উদ্যোক্তার

সত্তাসমূহ অন্যান্য সহায়ক কর্মীদের সাথে সহযোগিতা ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবণী সেবা ও পণ্যের উন্নয়নকে তরান্বিত করে। আইটেম ১ থেকে ৫ এর মধ্যে সেইসব কর্মীরা আছে এবং অন্যান্য কোম্পানী,শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিনিয়োগকারীরা আছে। ইন্ডাস্ট্রি ক্লাস্টারের ধারণাটিকে মাইকেল পটার ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিদ্বন্ধী এবং প্রতিযোগিতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তেমনি সহসৃষ্টি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও তা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, আইসিটি ক্ষেত্রের অনেক কোম্পানী সহযোগিতার ধারণাকে সমর্থন করে। উদ্ভাবনী ক্লাস্টারের স্বত্তাসমূহের প্রকৃত ও পণ্য ও সেবার উন্নয়ন ঘটাতে প্রয়োজন হয়, যা আজ আর কোন আদিকাল্পিক বিষয় নয়। যেহেতু এগুলো প্রকৃত ব্যবহারকারী ও গ্রাহকদের মাধ্যমে বাজারেও পরীক্ষা করা হয়। একটি ব্যাবসার কেস উপস্থাপন করতে হবে পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের জন্য। স্থানীয় এবং আন্তজার্তিক ক্রেতাদেরকে (আইটেম-৫) চূড়ান্তভাবে সেবা প্রদান করা হয় যখন উদ্ভাবনী পণ্য উন্নয়নের সকল শর্ত সম্পন্ন করা হয় এবং প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি ঘটে।

আর্ন্তজাতিক যোগাযোগ এবং অবকাঠামো (আইটেম-৮) জ্ঞান, প্রযুক্তি, বাজার এবং বৈশ্বিক অংশীদারদের নাগাল পেতে সহায়তা করে। নেটওয়ার্ক অর্থনীতি দাবি করে যে,পণ্য ও সেবাসমূহ বৈশ্বিক মান নিয়ন্ত্রণ করবে উদ্ভাবনী পণ্যের আপেক্ষিকভাবে সামান্য সংশোধন কিংবা পরিমার্জনের মাধ্যমে বৈশ্বিক দুয়ার খুলে দিতে সহসৃষ্টি একটি বৈশ্বিক কর্মকান্ড হয়ে উঠতে পারে।

নিম্ন স্তরের কর্মীরা (আইটেম ৯ থেকে ১২ পর্যন্ত) সহযোগিতামূলক নীতি, কৌশল, সক্ষম সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করেন উদ্ভাবনের সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরীর জন্য। সরকারি নীতি তহবিল এবং ক্রয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইটেম-১২) কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় এবং নেটওয়ার্কিংয়ের অবকাঠামো তৈরী করে উদ্ভাবন বিকাশের জন্য প্রাথমিক চাহিদা তৈরী করে। আইপি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষা (আইটেম-১১) উদ্ভাবন উপলব্ধিতে সক্ষম করে তুলেতে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২) ***শেখ হাসিনা ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট:*** এই ইনস্টিটিউট হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দক্ষতা তৈরীর এক শিক্ষণ পরিবেশ। এটি হবে একটি বিশেষায়িত শিক্ষণ কেন্দ্র, এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ২১ শতকের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনীয় উচ্চতর দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবে। প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকবে যেখানে থেকে আরএন্ডডি সেন্টারকে দেখবে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডাষ্ট্রির ছাত্র ও গবেষকরা গবেষণা কাজে সহযোগিতা করতে পারে। এতে বিভিন্ন সামনের সারির প্রযুক্তিতে আইপি তৈরীর মাধ্যমে বিশ্বমানের গবেষণার সুযোগ তৈরী হবে।

৩) ***শিল্পপ্রধান গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন ল্যাব***: এই ল্যাবগুলো মূলত চিহ্নিত উদ্ভাবনী সুযোগের বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা সেই উপাদানগুলোও চিহ্নিত করবে, যেখানে গবেষণা ও উন্নয়নের একাডেমিক অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়ন তথা উদ্ভাবনের লাভজনক ব্যবহার তুলে ধরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও অনুরূপ ল্যাব গঠনে সহায়ক হবে, ফলে কর্পোরেট গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাব গঠিত হবে।

৪) ***উদ্ভাবনে সহায়তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন:*** গ্র্যাজুয়েট তৈরির পাশাপাশি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন কাউন্সিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হবে। ঐ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের জড়িত করবে। এর ফলে গ্র্যাজুয়েটদের মান উন্নত হবে এবং সেই সাথে উদ্ভাবন ও উদ্যোগ গ্রহণের নতুন পথও তৈরি হবে। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমান্বয়ে মৌলিক গবেষণার দিকে এগিয়ে যাবে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করবে প্রবৃদ্ধির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে, গঠন করবে অর্থনৈতিক গুচ্ছ। পরিশিষ্ট ৯খ এ সংক্ষিপ্তভাবে কিছু সংখ্যক কৌশলগত করণীয় তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হলো: (১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সংযোগ বাড়িয়ে শিক্ষামূলক গবেষণা উদ্যোগসমূহের পুনর্বিন্যাস; (২) শিল্প চাহিদা পূরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিকাশসহ নতুন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন; (৩) শিল্পের প্রতিযোগ-সক্ষমতা সহায়ক উদ্ভাবন ও গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে শিল্পের সাথে সংযুক্ত করা; (৪) প্রায়োগিক গবেষণা, প্রযুক্তি সমন্বিতকরণ ও সিস্টেম পর্যায়ে উদ্ভাবনার ওপর প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষামূলক গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের বাজার সৃষ্টি; (৫) প্রযুক্তি হস্তান্তর করা; এবং (৬) নতুনতর উদ্ভাবনের জন্য পথসন্ধানী বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুকূলে সহায়তা প্রদান। ঠিক চীনের মতোই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও অত্যন্ত উচ্চাভিলাসী বহুসংখ্যক মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে অবশ্যই অংশ নিতে হবে এবং এগুলোর বাস্তবায়নে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষায়িত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে, বিশেষ করে আইসিটি শিল্পের আসন্ন উপখাতসমূহের কাজে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, এমন শিক্ষাক্রম তৈরির জন্য দেশ ও বিদেশের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাবে।

শিক্ষাঙ্গনের ভেতরে ও বাইরে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ বিভিন্ন কর্মীদের উৎসাহিত করতে মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বড় আকারের আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান একটি কার্যকর পদ্ধতি হবে। আশা করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতীয় আরঅ্যান্ডডি কর্মসূচি ও প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবে, প্রযুক্তি বিস্তার ও ব্যবহারের সুগম ক্ষেত্র তৈরি করবে, ইনকিউবেশন কেন্দ্র ও সম্ভাবনাময় কোম্পানিগুলোর প্রবর্ধন করবে এবং বিদেশি প্রযুক্তি ও অংশীদারদের মাঝে সংযোগ স্থাপনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাব সুবিধা প্রদান করবে। তবে এটি হতে হবে প্রযুক্তিগতভাবে সর্বাধুনিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাগ্রসর আইসিটি উপ-খাতগুলোতে, সবচাইতে প্রাগ্রসর কোম্পানিগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। এটি অবশ্যই সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হবে, যেখানে এর উদ্দেশ্যাবলি, লক্ষ্যমাত্রা এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময় পরিধির মধ্যে অর্জনের কর্মপন্থা বিষয়ে বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত হবে।

গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প সংযোগ বিকাশের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এই লক্ষ্যে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে একটি নীতি বাস্তবায়ন দল তৈরি করা হবে। এই দলের লক্ষ্য হবে পর্যাপ্ত অর্থায়ন সুবিধা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক যোগ্য নেতৃত্বের নিযুক্তি দানসহ প্রাথমিকভাবে চার থেকে ছয়টি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তি হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপন করা। অর্থবহ প্রযুক্তিগত অর্জনসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ বিস্তারের জন্য এটি কৌশলগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সদ্যোজাত কোম্পানিগুলোর জন্য কর মওকুফ ও প্রণোদনামূলক ভর্তুকি দানের নীতিমালা গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে, যেমনটি চীনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই সদ্যোজাত উদ্যোগগুলোর মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জাতীয় ও স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

আরঅ্যান্ডডি ও উদ্ভাবনে অর্থায়ন: তিনটি প্রধান ধাপের সমন্বয়ে গঠিত আরঅ্যান্ডডি ইকোসিস্টেমের সুষম প্রবৃদ্ধির জন্য আরঅ্যান্ডডি সম্পদ বিতরণ বিবর্তিত হতে থাকে। শুরুতে সরকারের বিশেষায়িত আরঅ্যান্ডডি কেন্দ্রগুলোতে জাতীয় আরঅ্যান্ডডি বাজেটের প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যয় হবে এবং কর্পোরেট ল্যাবে ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ব্যয় হবে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ ও ৫ শতাংশ। ২০৪১ সালের মধ্যে এই দৃশ্যকল্পে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে, কর্পোরেট আরঅ্যান্ডডি ল্যাবের উত্থানের সাথে এর ব্যয়ও বেড়ে গিয়ে উন্নীত হবে ৭০ শতাংশে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তখন ব্যয় হবে ২০% আর বাকি ১০ শতাংশ সরকারি ল্যাবগুলোতে। একইভাবে শুরুতে মোট আরঅ্যান্ডডি বাজেটের প্রায় ৯০ শতাংশই সম্পন্ন হবে সরকারি ব্যয়ে, যেটি কমে গিয়ে ২০৪১ এ পৌঁছবে ২০ শতাংশেরও কম। পরিশিষ্ট ৯গ এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

একটি উন্নত দেশ হবার জন্য প্রযুক্তি সহ অগ্রযাত্রা: ডিজিটায়ন, সংযোগশীলতা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি হওয়ায় উন্নত বাজার বিশ্লেষণ, জ্ঞানের আদান-প্রদান, পণ্য ও সেবার ডিজাইন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস, বিতরণ মডেল ও পরিচালন দক্ষতাও ত্বরান্বিত হয়। প্রযুক্তির বদৌলতে প্রথা-বহির্ভূত উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবনমূলক ব্যবসায় মডেল সহ নবীন উদ্যোক্তাদের জন্য বাজারে প্রবেশের ব্যয়ও ক্রমেহ্রাস পাচ্ছে। টেকসই উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রবর্তী করার জন্য প্রযুক্তির এই শক্তিকে অর্থবহভাবে ব্যবহারকল্পে সরকার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, শিল্প, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাবিদদের সু-সংহত উদ্দেশ্যাবলি স্থির করার জন্য মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন যাতে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা অবদান অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪১ এ জিডিপির ৪.৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

প্রযুক্তির অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হবে: গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণে, এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত নির্দেশনা অনুযায়ী একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রযুক্তির প্রয়োগ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ শুরু হবে শ্লথ গতিতে এবং পরে সম্পূরক সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা দ্বারা চালিত হয়ে তা ত্বরান্বিত হবে। ফলে প্রবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির অবদান, যেমনটি এই পরিকল্পনায় বিবৃত হয়েছে, পরবর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় ২০৩১ সালের মধ্যে তিনগুণ অথবা তারও বেশি বাড়তে পারে। প্রাথমিক বিনিয়োগ, কলা-কৌশলের চলমান পরিশোধন ও প্রয়োগ এবং প্রচুর লেনদেন ব্যয় প্রাথমিক স্তরে প্রযুক্তির গ্রহণকে সীমিত করতে পারে।

উপকরণ-চালিত অর্থনীতি থেকে উদ্ভাবন-চালিত অর্থনীতিতে রূপান্তরে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও ব্যবধান বাড়াবে। কাজের চাহিদায় পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্পষ্ট হবে। এর কিছু হবে সামাজিকভাবে ও বোধশক্তি দ্বারা চালিত এবং কিছু কাজ যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা কঠিন ও যার জন্য প্রয়োজন অধিকতর ডিজিটাল দক্ষতা। নতুন

ধরনের কাজে ব্যক্তি শ্রমিকদের খাপ খাইয়ে নেয়ার সমস্যা মোকাবেলায় যদি তাদের দক্ষতা ঝালিয়ে নেয়া হয়, বা এর অধিকতর উন্নয়ন ও শ্রমবাজারে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করা হয়, এরূপ ক্ষেত্রে অর্থনীতির অধিকতর উৎপাদনশীল অংশে সম্পদ পুনঃসংস্থান গতি পাবে।

প্রযুক্তির সুফল লাভের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়, ফলে দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্ট হচ্ছে এবং বর্তমান ডিজিটাল বিভাজন আরো দৃঢ় হচ্ছে। বিভিন্ন দেশগুলোতে যে বৈচিত্র্যময় কৌশল ও প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে, তা বাংলাদেশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সুচিন্তিতভাবে কার্যকর বিকল্প বেছে নেয়া হবে। গবেষণায় দেখা যায় যে, আজকের তুলনায় ডিজিটাল সুবিধাবলি সম্পন্ন অগ্রণী দেশগুলো ২০৩১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ২০ থেকে ২৫ শতাংশ নিট অর্থনৈতিক সুফল আহরণ করতে পারে, বাকি দেশগুলোর বেলায় তা হবে মাত্র ৫ থেকে ১৫ শতাংশ।

অবকাঠামোতে এককালীন পরিবর্তনের বিপরীতে মতো না হয়ে প্রযুক্তি-চালিত পরিবর্তনে সংঘটিত হবে রূপান্তরের নিরন্তর প্রবাহের জন্য প্রয়োজন হবে জীবনব্যাপী শিক্ষার সংস্কৃতি, কাজের প্রাণবন্ত রূপ এবং ডিজিটাল অঙ্গনে সহযোগিতা অঙ্গীভূত করা। এর লক্ষ্য হবে পরবর্তী দশকগুলোকে এই পরিবর্তন ধারাকে উত্তম থেকে বৃহৎ অর্থনৈতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে একটি সম্মতিপূর্ণ ও ক্রমোন্নয়ন পদ্ধতিতে প্রযুক্তি থেকে অর্থনৈতিক সুফল যুক্ত করা। মোট উৎপাদিকায় ক্রমাগত অগ্রগতি লাভের জন্য পরবর্তী দুই দশকব্যাপী প্রতি বছর সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে প্রতিক্রিয়ার অবিরাম সমন্বয় দ্বারা প্রযুক্তির গতিশীলতা বৃদ্ধির অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি নীতি সমর্থন দানেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত উন্নত দেশের অবস্থানে নিয়ে যাবার মূল চাবিকাঠি।

পরিশিষ্ট ৯

পরিশিষ্ট ৯ক. সরল পণ্যের নকল ও প্রতিরূপ তৈরি থেকে উদ্ভাবনে উৎপাদন অগ্রাধিকার পরিবর্তন এবং টিএফপি'র অবদানকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সঞ্চালন

উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র	তিনটি প্রধান মেয়াদে বাংলাদেশের উন্নয়ন স্তর		
	২০১৯ পর্যন্ত	২০২০-২০৩১	২০৩১-২০৪১
উন্নয়ন স্তর	উপকরণ চালিত স্তর	বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন চালিত স্তর	উদ্ভাবন চালিত স্তর
প্রতিযোগিতার উৎস	সস্তা শ্রম	উৎপাদনের সক্ষমতা	পণ্য ও পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে উদ্ভাবন দক্ষতা
শিল্পনীতির প্রধান উদ্দিষ্ট	তৈরি-পোষাকের মতো রপ্তানিমুখী হালকা শিল্প	প্রযুক্তিঘন শিল্প	উচ্চতর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহপ্রদান
	অনুকরণের মত আমদানি বিকল্প তৈরি	জটিল পণ্য উৎপাদন	জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ও সংহতকরণ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা	উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্ক উন্নয়নের সূত্রপাত কৃষি ও শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন তথ্য অবকাঠামোর উন্নয়ন যোগাযোগ ও ইন্টারনেট ঘনত্বের বিস্তার	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান পুন:নির্ধারণ নতুন আরঅ্যান্ডডি কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি আরঅ্যান্ডডি স্থাপনে উৎসাহ প্রদান গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে শিল্পের সাথে সংযুক্তকরণ প্রায়োগিক গবেষণা প্রযুক্তি সংমিশ্রণ, এবং পদ্ধতি স্তরের উপর গুরুত্ব দিয়ে আরঅ্যান্ডডি ও উদ্ভাবনের জন্য বাজার সৃষ্টি	উপাদান উদ্ভাবনে প্রাধান্য বিজ্ঞানকে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে রূপান্তর নতুন দিগন্তপ্রসারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ধ্বংসাত্মক উদ্ভাবন

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে অবস্থান						
সূচক	স্কোর (১-৭)	র‍্যাংক/১৩৭	স্কোর (১-৭)	র‍্যাংক/ ১৩৭	স্কোর (১-৭)	র‍্যাংক/ ১৩৭
উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নতকরণ	৩.৭	৭৯	৪.৫	৫০	৬	৩০
উদ্ভাবনের জন্য সক্ষমতা	৩.৮	৯৭	৪.৫	৬০	৫	৩৫
আরঅ্যান্ডডি'তে কোম্পানির ব্যয়	২.৮	১১৩	৩.৮	৬৫	৪.৫	৩০
আরঅ্যান্ডডি'তে বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সংস্থার সহযোগিতা	২.৫	১৩০	৩.৯	৭০	৪.৫	৩৫
	০.৩%		২.৫%		৪.৫%	

পরিশিষ্ট ৯খ. বাংলাদেশের উদ্ভাবন নীতির বিবর্তন এবং উদ্ভাবন সূচকে অবস্থান

উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র	বিবর্তনের স্তর		
	২০১৯ পর্যন্ত	২০২০-২০৩১	২০৩১-২০৪১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং অংশীজনের ভূমিকা	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৌশল অন্তর্ভুক্ত	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং অংশীজনের ভূমিকা	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৌশল অন্তর্ভুক্ত

উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র	বিবর্তনের স্তর		
	২০১৯ পর্যন্ত	২০২০-২০৩১	২০৩১-২০৪১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং অংশীজনের ভূমিকা	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৌশল অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের ওপর প্রাধান্য দান মোট দেশজ আয়ের ০.৬% আরঅ্যান্ডডিতে অর্থায়ন। আরঅ্যান্ডডিতে প্রায় ১০০% সরকারি অর্থায়ন	প্রসেস উদ্ভাবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গুরুত্ব প্রদান প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অভিযোজন আরঅ্যান্ডডি অর্থায়ন মোট দেশজ আয়ের ১% এ বৃদ্ধি আরঅ্যান্ডডি ব্যয়ের ৫০% বেসরকারি খাত দ্বারা নির্বাহ হয়	প্রযুক্তি সংমিশ্রণ ও উন্নয়ন পণ্য উদ্ভাবন প্রযুক্তি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র উন্মোচন আরঅ্যান্ডডি অর্থায়ন মোট দেশজ আয়ের ২% এ বৃদ্ধি আরঅ্যান্ডডি বিনিয়োগের ৮০% বেসরকারি খাত দ্বারা নির্বাহ হয়
মানবসম্পদ	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ স্নাতকের সংখ্যা বৃদ্ধি কারিগরি প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি	কৌশলগত ক্ষেত্রগুলোতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ আজীবন শিক্ষা এবং বিশাল আরঅ্যান্ডডি সম্পদ সমাবেশ	মানবসম্পদ চালিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও শিল্প উদ্ভাবন
শিক্ষা	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মানসম্মত শিক্ষায় প্রাধান্যদান হেকেপ প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণা তহবিল প্রদান	শিল্পমুখী গবেষণাধর্মী ডিগ্রী কর্মসূচি প্রচলন ও বিস্তার পণ্য ও প্রসেস তৈরিতে একাডেমিক গবেষণার ফলাফল ব্যবহার	একাডেমিক গবেষণা প্রযুক্তি আবিষ্কার ও পণ্য উদ্ভাবন দ্বারা নতুন অর্থনৈতিক জানালা উদঘাটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরঅ্যান্ডডি তহবিলের ২০% বরাদ্দ
সরকারি ক্রয়	অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশি উৎস হতে প্রযুক্তি পণ্য ক্রয়ের ওপর প্রাধান্য দান	প্রযুক্তি পণ্যের সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে যৌথ উদ্যোগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং স্থানীয় মূল্য সংযোজনকে প্রাধান্য দান	বাণিজ্যিক উদ্ভাবনের জন্য সরকারিভাবে কেনা প্রযুক্তিসমূহের অভিযোজন ও উন্নয়ন
আরঅ্যান্ডডি বাজেট ও অনুদান বিতরণ	সরকারি কেন্দ্রসমূহে: ৮০% বেসরকারি ল্যাবে: ১৫% বিশ্ববিদ্যালয়ে: ৫%	সরকারি কেন্দ্রসমূহে: ৪০% বেসরকারি ল্যাবে: ৮০% বিশ্ববিদ্যালয়ে: ১০%	সরকারি কেন্দ্রসমূহে: ১০% বেসরকারি ল্যাবে: ৭০% বিশ্ববিদ্যালয়ে: ২০%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরঅ্যান্ডডি	মৌলিক গবেষণা: ৭০% প্রায়োগিক গবেষণা: ২০% উন্নয়ন: ১০%	মৌলিক গবেষণা: ৫০% প্রায়োগিক গবেষণা: ৪০% উন্নয়ন: ১০%	মৌলিক গবেষণা: ৪০% প্রায়োগিক গবেষণা: ৫০% উন্নয়ন: ১০%
উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতামূলক সূচকে বাংলাদেশের উন্নয়ন	বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক: ১১৬ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম: ১০৫ ব্লুমবার্গ উদ্ভাবন সূচক: এশিয়ায় সর্বনিম্ন	বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক: ৭০ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম: ৬০ ব্লুমবার্গ উদ্ভাবন সূচক: এশিয়ায় মধ্যবর্তী অবস্থান	বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক: ৪০ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামঃ ৩৫ ব্লুমবার্গ উদ্ভাবন সূচক: শীর্ষ ৩৫ এর মধ্যে

পরিশিষ্ট ৯গ. আইসিটি পণ্য ও সেবা উৎপাদন, ব্যবহার ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের উন্নতি[১৩]

উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র ও নির্দেশক	তিনটি প্রধান মেয়াদে বাংলাদেশের বিবর্তন স্তর					
	২০১৯ পর্যন্ত		২০২০-২০৩০		২০৩১-২০৪১	
	বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক, ২০১৯					
	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক
হাই-টেক নেট রপ্তানি, মোট বাণিজ্যের %	০.২	৯৩	১০	৫০	২০	১০
আইসিটি সেবা রপ্তানি, মোট বাণিজ্যের %	১.১	৭৮	৫	৪০	১০	৮
জ্ঞান-নিবিড় কর্মসংস্থান, %	৮.৩	১০২	১৫	৬০	৩০	৩৫
কম্পিউটার সফটওয়্যারে ব্যয়, মোট দেশজ আয়ের %	০.২	৭৫	০.৪	৫৫	০.৫	৪০
হাই ও মিডিয়াম হাই-টেক ম্যানুফ্যাকচার, %	০.১	৮১	০.৪	৫৫	০.৫	৩৫

পরিশিষ্ট ৯ঘ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল আহরণে বাংলাদেশের উন্নতি

উদ্দিষ্ট ক্ষেত্র ও নির্দেশক	তিনটি প্রধান মেয়াদে বাংলাদেশের বিবর্তন স্তর					
	২০১৯ পর্যন্ত		২০২০-২০৩০		২০৩১-২০৪১	
	বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক, ২০১৯					
	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক
মৌলিক প্যাটেন্ট/ বিলিয়ন পিপিপি ডলারে জিডিপি	০.১	১১১	৪০	৫০	৬০	২০
পিসিটি (ডওচঙ-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফিলিং) মৌলিক প্যাটেন্ট/ বিলিয়ন পিপিপি ডলার জিডিপি	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৩	৪৫	৫	২৫
মৌলিক শিল্প ডিজাইন/ বিলিয়ন পিপিপি ডলার জিডিপি	২.৩	৪৯	১৫	৩৫	২৫	২০
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আর্টিকেল/ বিলিয়ন পিপিপি ডলার জিডিপি	২.২	১১০	১০	৫০	১৫	৩৫
গবেষকবৃন্দ, এফটিই: প্রতি মিলিয়ন মানুষে	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৪০০০	৫০	৫,০০০	২০
উল্লেখ করার মত দলিল, এইচ সূচক	১০.৪	৬৩	২০	৪০	৩৫	২৫
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ প্রাপ্তি, মোট বাণিজ্যের %	০	১০৩	০.৪	৫০	০.৭	৪০
বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে স্নাতক, %	১১.৩	৯৮	২০	২৫	৩০	১২
উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি%, মোট	১৭.৬	৯৭	৫০	৫০	৮০	১৫

পরিশিষ্ট ৯ঙ. বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার সারমর্ম

ক্রমিক সংখ্যা	দেশ	সংশ্লিষ্টতার মাত্রা	পর্যবেক্ষণ
১	যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব	মাঝারি	এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য স্টার্ট-আপকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবনী প্রয়াসে
২	ভারত	মাঝারি	এর একরৈখিক মডেল অনুসরণের জন্য উপযুক্ত নয়। তবে প্রসেস ও পণ্য উদ্ভাবন ভালো শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।
৩	চীন	মাঝারি	বাংলাদেশের জন্য প্রসেস উদ্ভাবনে প্রাধান্য দান এবং আইটি ও সফটওয়্যার রপ্তানিতে সাফল্য থেকে নিঃসন্দেহে ভালো শিক্ষা নেয়া যায়। তবে যৎসামান্য বা শূন্য ইনক্রিমেন্টাল উদ্ভাবন সহ আমদানি বিকল্পে সহায়তা দানের কৌশল সমর্থনযোগ্য নয়। তদুপরি মিতব্যয়ী উদ্ভাবনকেও পরিমাপযোগ্য প্রবৃদ্ধি মডেল বলে মনে হয় না।

১৩ শ্রমের স্থানচ্যুতি বিষয়ে আইএলও এবং সরকারের এটুআই কর্মসূচির যৌথ পরিচালনায় সম্পাদিত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সাময়িকভাবে নিম্নবর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়ঃ ২০৪১ সালের মধ্যে (১) আরএমজি ৬০% চাকুরি হারাবে; (২) আসবাবপত্র ৫৫% চাকুরি নিয়ে ঝুঁকিতে পড়বে; (৩) চামড়া খাতে ৩৫% চাকুরি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে ; এবং (৪) পর্যটনশিল্প খাতে ২০% চাকুরি হারিয়ে যাবে। এছাড়া, (৫) কৃষি প্রক্রিয়াকরণে এ ০.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এগুলো সাময়িক ভবিষ্যদ্বাণী, সঠিক সংখ্যা নিরূপণের জন্য আরো শ্রমসাধ্য গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। একই সাথে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সৃষ্ট হবে, তার ব্যাপ্তি বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যও গবেষণা পরিচালিত হওয়া দরকার।

ক্রমিক সংখ্যা	দেশ	সংশ্লিষ্টতার মাত্রা	পর্যবেক্ষণ
৪	জাপান	মাঝারি	বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনুকরণ ও পুনরুদ্ভাবনমুখী রেপ্লিকেশন-এর জন্য বিদেশি প্রযুক্তির ব্যাপক রিপ্যাকেজিং অনুমোদনযোগ্য নয়। তবে মূলধনী মেশিনারি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি আত্মীকরণে অগ্রগতি বাংলাদেশের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।
৫	রাশিয়া	নিম্ন	সংহতিনাশী উদ্ভাবনের মডেল ও শ্রমকেন্দ্রিক রেপ্লিকেশনের (১৯৪০ এবং ১৯৫০ দশকের মতো) ফলশ্রুতিতে পুনরুদ্ভাবন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত নয়। ক্রমবর্ধিত উদ্ভাবন ও প্রাপ্তব্য প্রযুক্তির বিস্তারে প্রাধান্য দান আদর্শ রোল মডেল হিসেবে অনুসরণযোগ্য।
৬	কোরিয়া	উচ্চ	বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কেন্দ্রিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়।
৭	তাইওয়ান	মাঝারি	পণ্যের ক্রমবর্ধিত উন্নয়নে প্রসেস উদ্ভাবন বাংলাদেশের জন্য রোল মডেল হতে পারে। কোরিয়ার সরকারি অর্থায়নপুষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্প সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা সঞ্চারে গবেষণা ও উন্নয়নের (আরঅ্যান্ডডি) সুফল প্রদর্শনের কৌশল কর্পোরেট আরঅ্যান্ডডি ল্যাব স্থাপনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহী করতে মূল ভূমিকা পালন করে। জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এ ধরনের কৌশল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এর ফলে, কোরিয়ার আরঅ্যান্ডডি ব্যয় ২০১৫ তে মোট দেশজ আয়ের ৪.৩% এ পৌঁছালেও এই আরঅ্যান্ডডি বিনিয়োগের প্রায় ৯০ শতাংশই শিল্পখাতের অংশ। তদুপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্তি মানব সম্পদ উন্নয়নেও অবদান রাখছে।
৮	মালয়েশিয়া	নিম্ন	ক্রমবর্ধিত উদ্ভাবনের জন্য এসএমই'তে প্রাধান্য দান একটি ভালো দৃষ্টান্ত। কৌশলগত উদ্ভাবনশীল প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন - এটির প্রতিরূপায়ণ কঠিন।
৯	সিঙ্গাপুর	নিম্ন	সিলিকন ভ্যালির প্রতিরূপায়ণে অবকাঠামো চালিত পদ্ধতি (যেমন- হাই-টেক পার্ক) একটি অত্যন্ত অকার্যকর মডেল।
১০	সৌদি আরব	নিম্ন	অবকাঠামোতে ব্যাপক ব্যয়সহ হাইটেক ফার্মগুলোকে আকৃষ্ট করতে হাইটেক সুবিধাদানে বড় রকমের ব্যর্থতার ঝুঁকি রয়েছে।

অধ্যায় ১০

অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য
পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ

অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ

১০.১ প্রেক্ষাপট

আজকের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে, স্বল্পব্যয়ী ও দক্ষ পরিবহন সেবা অর্থনীতির প্রতিযোগ-সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক, যা দেশের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও, দক্ষ পরিবহন দারিদ্র্যের অবসান সহ একটি দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক উন্নয়নের ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং, একটি দক্ষ ও স্বল্পব্যয়ী পরিবহন নেটওর্য়াক বিনির্মাণ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষমতার একটি মূল নির্ধারক।

১০.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে অর্জিত অগ্রগতি

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ২০২১ এর জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং জীবনযাত্রার উন্নত মানের সাথে সঙ্গতি বিধান করে একটি গতিশীল ও কার্যকর পরিবহন নেটওর্য়াক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে আসে। পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন তাই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্য। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর পরিবহন খাতের রূপকল্প হলো একটি দক্ষ, টেকসই, নিরাপদ এবং আঞ্চলিকভাবে সুষম পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন একে অন্যের পরিপূরণ হবে এবং যেখানে পরস্পরের সাথে সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকবে। পরিবহন ব্যবস্থার মান ও উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ঢাকার সাথে কার্যকর পরিবহন সংযোগসহ দুটি সমুদ্র বন্দরের উন্নয়ন, দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে রেলপথে কার্যকর সংযোগ স্থাপন, সড়ক-রেল-নৌপরিবহনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিবহন সম্পৃক্ততার উদ্যোগে অংশগ্রহণ, যা বাংলাদেশের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে স্থল পথে সংযোগ স্থাপনের সহায়ক হবে। এর সবগুলো ক্ষেত্রেই আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। লক্ষ্য অনুযায়ী এমআরটি লাইন-৬ (বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল) এর কাজ ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হবে। প্রচলিত চার লাইনের সড়কগুলো ছয় লাইনে উন্নতি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতু স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বিমান ও রেল আধুনিকায়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর আওতায় আরো তিনটি এমআরটি লাইনের (লাইন-১; লাইন-৫: উত্তর, এবং লাইন-৫: দক্ষিণ) নির্মাণ কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ব্যবহারকারীদের নিকট হতে চার্জ ও ফি আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তনে এবং পরিবহন সেবা অবকাঠামো বিনির্মাণে অধিকহারে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বিস্তারের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ উন্নত করার জোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর পরিবহন খাতের উদ্দেশ্যাবলি ও কৌশল সুচিন্তিত ছিল। সব ধরনের পরিবহন সমন্বয়, জাতীয় মহাসড়কগুলোর উন্নয়ন, আন্তঃনগর ও আঞ্চলিক সংযোগশীলতা, বাণিজ্যিক উপকরণাদির মূল্যে নিম্নগামিতা, পরিবহন নেটওয়ার্কের সম্পদ সংরক্ষণে যে জোর দেয়া হয়েছিল, এতে যথাযথ অগ্রগতি হয়। সড়ক ব্যবহারকারীদের নিকট হতে মাশুল আদায়ের চিন্তাভাবনা এবং পরিবেশগত সংবেদনশীলতাও বেশ যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়। একই সাথে, পরিবহন খাতে সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা বাড়ানোর কৌশলও সঠিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি খাতের সাথে পরিবহন খাত বাজেট বরাদ্দে উচ্চ অগ্রাধিকার পায়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর কৌশল ও অগ্রাধিকারের সাথে সঙ্গতি রেখে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রকল্পগুলোর সবকয়টির জন্যই সম্পদ বরাদ্দ করা হয়। সড়ক ও সেতুর ক্ষেত্রে ২০১০-২০১৯ মেয়াদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন পরিবহন অবকাঠামো যুক্ত হয়েছে। পরিবহনের সকল ধরনের জন্যই সেবা সুবিধা বিস্তৃত হয়েছে। বিমান পরিবহনে বেসরকারি অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বড় বড় নগরীর অধিকাংশই এখন বিমান সেবা দ্বারা সংযুক্ত। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অধীনে অধিকতর সংহতির জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বাস্তবায়ন সক্ষমতায় ঘাটতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ[১৪]। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও, তা শেষ করতে গিয়ে পেছনে পড়ে থাকতে হচ্ছে। একইভাবে রেলপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার নিচে থেকে যায়। অভ্যন্তরীণ নৌপথের জন্য বড় সমস্যা হলো প্রচুর পলি জমা হওয়া এবং বড় ধরনের ড্রেজিং ও সংরক্ষণে অপর্যাপ্ততার কারণে নৌপথের নাব্যতা। এছাড়াও, নিরাপত্তার মানও দুর্বল। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের কাজের পরিকৃতি উন্নত হওয়ায় আন্তর্জাতিক

১৪ দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যালোচনা (জিইডি, ২০১৮) - পরিবহন খাতে বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতার বিশদ পর্যালোচনার জন্য।

বাণিজ্য অধিকতর সুগম হয়েছে, তবে মংলা বন্দরের সেবা সুবিধা প্রত্যাশার চেয়ে শ্লথগতিতে বেড়েছে। আন্তঃআঞ্চলিক পরিবহন সংযোগশীলতার এজেন্ডাও প্রত্যাশার চেয়ে ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। যদিও এই পশ্চাৎপদতার আংশিক কারণ আঞ্চলিক রাজনৈতিক সমস্যার সাথে জড়িত। তবে সংশ্লিষ্ট মহাসড়ক, রেল ও নৌ সংযোগের মন্থর বাস্তবায়নের কারণে ভৌত সংযোগশীলতা পিছিয়ে পড়েছে।

নীতির দিক হতে, আন্তঃমোডাল পরিবহন সংযোগ এবং পিপিপি-ভিত্তিক পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নয়নে অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার পেছনে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্ম তৎপরতায় সম্প্রতি কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য সূচিত হয়েছে, যা উৎসাহব্যঞ্জক। একটি সুপরিকল্পিতভাবে প্রণীত সড়ক-ব্যবহারকারীর মাশুল নির্ধারণের মাধ্যমে সড়ক ব্যবহারকারীদের নিকট হতে ব্যয় সংগ্রহের যে-কৌশলের কথা ভাবা হয়েছিল, সেটি এখানো কার্যকর করা যায়নি। পরিবেশগত দিক হতে, নৌপরিবহন সেবা সম্প্রসারণে অপ্রতুল অগ্রগতি উদ্বেগের বিষয়। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা, অথচ যাত্রী চলাচল ও মালামাল স্থানান্তরে এর অংশ কম এবং নিম্নমুখী[১৫]।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বাস্তবায়ন ও নীতি সংশ্লিষ্ট এই প্রতিবন্ধকতাগুলো সমন্বিতভাবে সমাধান করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে প্রবৃদ্ধি অধিকতর ত্বরান্বিতকরণ এবং রপ্তানি সম্ভারে বৈচিত্র্যকরণের জন্য প্রয়োজন হবে কারখানা থেকে বন্দরে চলাচল এবং বন্দর থেকে কারখানা গেটে মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিসহ ভারী যন্ত্রপাতি আমদানির সময়মত অন্তর্প্রবাহ। সমুদ্র ও বিমান বন্দর সেবার সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহনের সহজতা রপ্তানি বহুমুখীকরণ কৌশলে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সহজে আমদানিকৃত উপকরণ সংগ্রহ করা যায় এবং উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিপণন কেন্দ্রে পণ্য ও সেবা পরিবহন করা যায়।

১০.৩ পরিবহন খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প

পরিবহন খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে-

- যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে অবিরাম প্রবাহ বিদ্যমান এবং চাহিদা অনুযায়ী পরিবহন সুবিধা পাওয়া যায়।
- জনগণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ও সঠিক সময়ে পরিবহন সুবিধার বিভিন্ন মোডের মধ্যে দক্ষ পছন্দের সুযোগ রয়েছে।
- সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রবেশ ও প্রস্থানে কোন বাধা ব্যতিরেকেই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সকল পরিবহন সেবা প্রদান করা ।
- বিকল্প পরিবহন মোড পছন্দ করার সুযোগসহ যাত্রী, মালামাল ও সেবা চলাচলের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অত্যন্ত শক্তিশালী আন্তঃজেলা ও আন্তঃআঞ্চলিক সম্পৃক্ততা বিদ্যমান।
- নিরাপত্তার মান উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিরাপত্তা মানের সাথে পূর্ণ আনুগত্যের আইনি বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- "মাস র‌্যাপিড ট্র্যানজিট" (এমআরটি)/মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক এবং বেসরকারি বিকল্প, যা ব্যাপক যানজট এড়িয়ে সহজ চলাচলের জন্য নিত্য যাত্রীদের ভারসাম্য রক্ষা করে - এগুলো একত্রীকরণের মাধ্যমে নগরের যানবাহন প্রবাহ।
- রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সংযুক্তি নির্বিশেষে আইন ভঙ্গকারীদের জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধানসহ সকল ধরনের পার্কিং ও ট্র্যাফিক আইন প্রয়োগ করা।

১০.৪ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবহন খাতের লক্ষ্যমাত্রা

পরিবহন খাতের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমস্যাবহুল তবে উচ্চ-আয় অর্থনী-তিতে পরিবহন পরিবেশের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উচ্চ আয় দেশ হওয়ার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়। এই পরিবর্তনের জন্য সময় পরিক্রমার বিভিন্ন স্তরে সঠিক অগ্রগতি প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সারণি ১০.১ এ

১৫ দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বিডিপি ২১০০ (জিইডি, ২০১৮), অধ্যায়-১০।

নির্দেশিত হলো[১৬]। সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় দেখা যায় যে, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা ও ব্যয় সাশ্রয়তা উন্নত করার জন্য আন্তঃমোডাল পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসহ একটি ক্রমবর্ধনশীল ও রূপান্তরশীল অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাতে পরিবহন সেবার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ পরিবহনের জন্য পরিবহন সেবায় ভারসাম্য আনার জন্যে সড়ক নেটওয়ার্কে অত্যধিক নির্ভরশীলতা থেকে সরে এসে রেলপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এটি যাত্রী চলাচল ও মালামাল বহন উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে, তবে বিশেষ করে মালামাল বহনে বেশি প্রযোজ্য। উচ্চতর মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধি থেকে সৃষ্ট বর্ধনশীল চাহিদা মেটাতে নৌ-বন্দর ও বিমান চলাচল সক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে। নগর পরিবহনে নাটকীয় পরিবর্তন হবে যখন প্রাথমিকভাবে রাজধানী শহর ঢাকা ও সন্নিহিত এলাকা গুলোতে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি)/মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক এর মতো বিকল্প পরিবহন সুবিধা চালু হবে এবং এটি ধীরে ধীরে সকল প্রধান শহরগুলোতে সম্প্রসারিত হবে।

সারণি ১০.১: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য পরিবহন খাতের লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক		২০১৮ (ভিত্তি বছর)	২০২১	২০৩০	২০৪১
যাত্রী পরিবহন (বিলিয়ন যাত্রী/কিলোমিটার)	সড়ক	১৬৯	২৪৬	২০৭২	৪২১৫
	অভ্যন্তরীণ নৌপথ	১৬	২৩	২৫২	৮৪৩
	রেলপথ	১০	১৫	২০৩	৫৬২
মালামাল পরিবহন (বিলিয়ন টন কিলোমিটার)	মোট	১৯৫	২৮৪	২৫২৭	৫৬২০
	সড়ক	২৪	৩১	৭১	১৭৭
	অভ্যন্তরীণ নৌপথ	৫	৭	২০	৭৪
	রেলপথ	২	৩	১০	৪৪
বিমান পরিবহন (বিলিয়ন যাত্রী/মিলিয়ন টন)	মোট	৩১	৪১	১০১	২৯৫
	যাত্রী	১২.৪০	১৪.৩০	২৯.১	৫৫.৯৭
সমুদ্র বন্দরে কার্গো পরিবহন (মিলিয়ন সংখ্যা/ মিলিয়ন টন)	মালামাল	০.৩৮	০.৪৫	০.৬৫	১.১৪
	কন্টেইনার	২.২	৩.৬	১২.৫	৪৮.২
আরবান মাস ট্রানজিট	টন	৮৬	১২২	৪১৭	১৬১২
অবকাঠামোগত মান	নগরের সংখ্যা	০	১	৮	সকল প্রদান শহর
	দেশের র‍্যাংকিং	১২০	১১৮	৬০	৪০
	স্কোর	২.৮	২.৯	৪.০	৫.০

উৎস: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রক্ষেপণ

১০.৫ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য পরিবহন খাতের কৌশল

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করা হবে। তবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ কৌশলের বাস্তবায়নে যে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলোর সমাধানে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অপর অগ্রাধিকার হবে পরিবহন খাতের প্রকল্পের বাস্তবায়ন যে সব প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাগুলোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলোর মোকাবেলা করা। তৃতীয় অগ্রাধিকার হলো সরকারি বেসরকারি কৌশলের সংস্কার, যার উদ্দেশ্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে অধিকতর অগ্রগতি অর্জন। পরিশেষে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহের অন্যতম একটি এই যে, পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের আরো বেশি কৌশলী হওয়া উচিত এবং তদনুযায়ী এতে সম্পদ বরাদ্দ করা সমীচীন। কোনটিকে রূপান্তরশীল অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বিবেচনা করা হবে সেটির অগ্রাধিতকার পাওয়া উচিত। এই উদ্যোগ ইতোমধ্যেই ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শুরু করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ একে আরো শক্তিশালী করবে মূলত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত পরিবহন প্রকল্প সময়মতো গ্রহণ এবং তার সফল সমাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

১৬ প্রক্ষেপণের ভিত্তি সরোয়ার জাহানের নিবন্ধঃ অর্থনৈতিক পরিবহন ও অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধির সমর্থনে মানসম্মত অবকাঠামো ও পরিবহন উন্নয়ন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য প্রেক্ষাপট গবেষণাপত্র।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার নিরূপণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ: পরিবহন খাতে ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ব্যাপক, যা সারণি ১০.১ এ প্রতিফলিত। এগুলোর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্পদ এবং শক্তিশালী বাস্তবায়ন সক্ষমতা। বাংলাদেশে এ দুটোরই ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবহন কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিচক্ষণতার সাথে পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ। দীর্ঘমেয়াদি পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক কারিগরি সহায়তা নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবহন খাত মহাপরিকল্পনা ২০৪১ (টিএসএমপি ২০৪১) প্রণয়নের বিষয়টিতে নতুন করে দৃষ্টি দেয়া হবে। পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে জাপান, কোরিয়া ও চীনে বেশ কিছু উত্তম প্রকৃতির পরিবহন পরিকল্পনা ও উন্নয়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা গ্রহণ করবে। টিএসএমপি ২০৪১ এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন বিনিয়োগসমূহের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে। এছাড়া ২০২১-২০৪১ মেয়াদে বাংলাদেশের জন্য আন্তঃমোডাল পরিবহনের সর্বোচ্চ সমন্বয়মূলক চিত্র তুলে ধরাসহ অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভারসাম্যপূর্ণ আন্তঃমোডাল পরিবহন সুবিধা তৈরি: পরিবহন নেটওয়ার্কে সড়কের প্রাধান্য আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকলেও ভূমি সংকট, সামাজিক বাধা, পরিবেশগত উদ্বেগ ও একক ব্যয় বিবেচনাসমূহ পরিবহন নেটওয়ার্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও রেলপথের ওপর অধিকতর গুরুত্বদানের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। পরিবহনের এই দুটি মাধ্যমই স্বল্প-ব্যবহৃত। সড়কের ওপর চাপ কমাতে এবং সেই সাথে আন্তঃমোডাল সমন্বয় শক্তিশালী করতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ মাধ্যমদ্বয়ের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। নৌ-পথের সংযোগ বাণিজিক উপকরণাদির বন্দর থেকে কারখানা গেট এবং কারখানা গেট থেকে বন্দরে একটি বড় ধরনের উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হবে। একটি সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে আন্তঃমোডাল পরিবহনের ভারসাম্য উন্নয়নের জন্য এগুলোসহ অন্যান্য বিকল্প গ্রহণ করা হবে। পরিবর্তনশীল ট্র্যাফিক গতিশীলতার সঠিক প্রতিফলনের জন্য এই প্রক্রিয়া নিয়মিত ভাবে হালনাগাদ করা হবে।

বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি: বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা অনেকগুলো বড় পরিবহন প্রকল্পের বাস্তবায়নের গতি শ্লথ করে, ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্প শেষ করতে দেরি হয়। এতে এই বিনিয়োগগুলোর মানসহ মুনাফার হারহ্রাস পায়। সকল চলমান প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার ওপর সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এটিকে আরো শক্তিশালী করবে। এই লক্ষ্যে বড় বড় সব কয়টি পরিবহন প্রকল্পের সমাপ্তি পরিবীক্ষণসহ নির্ধারিত সময়ে অর্থ ছাড় নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প বাস্তবায়নের নতুন বিনিয়োগ অনুমোদন সংযুক্তকরণ, ক্রয় নীতিমালার উন্নয়ন, প্রকল্প ডিজাইনে অধিকতর মনোযোগ প্রদান, প্রকল্প অনুমোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রস্তুতি নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি সক্ষমতার উন্নয়নসহ বেসরকারি খাত থেকে চুক্তি ভিত্তিতে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন জনবল নিযুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বৃহৎ ও জটিল ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে এবং সম্মত মান ও মূল্যে যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের বিধানসহ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর প্রকল্প চুক্তি সম্পাদনের ওপর জোর দেয়া হবে।

পরিবহন অবকাঠামোর টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা: সারণি ১০.১ এ উপস্থাপিত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিবহন অবকাঠামোর ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ। সরকার কর্তৃক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানসহ বাজেট হতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন করা হয়। বাস্তবায়ন সক্ষমতায় ঘাটতির কারণে প্রায়শই এই অর্থায়নের পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়নি। তা সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে যে অর্থায়ন প্রয়োজন তা বিপুল এবং ২০২১-২০৪১ মেয়াদে এজন্য প্রতি বছর প্রয়োজন হবে জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ। এককভাবে বাজেট থেকে এই বিপুল অর্থায়ন সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি থেকেই সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মেয়াদে পরিবহন অবকাঠামোর অর্থায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই উদ্যোগ শুরু হয় ধীর গতিতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ক্ষেত্রে গতিময়তা যুক্ত হলেও সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের পূর্ণ সম্ভাবনা এখনো অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। এই বিশাল পরিবহন অবকাঠামো কর্মসূচির টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উন্নত মানসম্পন্ন কর্মী বাহিনীসহ সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে এবং সম্ভাব্য সবচাইতে ভালো উৎসগুলো থেকে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন করতে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আশু সমাধান করবে। উত্তম পদ্ধতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অর্থায়ন পরিকল্পনা ও পরিকৃতি মান নিরূপণে সরকারি ও বেসরকারি খাতগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে ঝুঁকি সমভাবে বহনের বিষয়টিতেও মনোযোগ দেয়া হবে।

পরিবহন সেবার মান ও নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করার জন্য মূল নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন: অগ্রগতি সত্ত্বেও, সামগ্রিক পরিবহন অবকাঠামো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট একক উপাদানের মানের বৈশ্বিক নিম্ন র‍্যাংকিং এর কারণে বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগ-সক্ষমতা নিম্নগামী, যা রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে একটি বড় বাধা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ পরিবহন অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট পরিবহন সেবার মান উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধকতার কারণে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা সংশ্লিষ্ট মান হ্রাস পায়। এছাড়া সেবা সংশ্লিষ্ট মানের অভাব, দুর্বল নিরাপত্তা মান ও পরিবীক্ষণ, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাব এবং পরিবেশগত মান সংশ্লিষ্ট পরিবহন খাতের অপর্যাপ্ত পরিবীক্ষণের ফলে এ সমস্যা তীব্র হয়। অবকাঠামো ও সেবার মান উন্নয়নে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বেশ কিছু সংখ্যক নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। সড়ক ব্যবহাকারীদের নিকট হতে পর্যায়ক্রমে মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে, যা সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও পরিবেশগত দূষণসহ যানজট সৃষ্টির জন্যও দায়ী। মাশুল বাবদ সংগৃহীত সম্পদ সড়ক, সেতু ও মহাসড়কের সংরক্ষণে ব্যবহৃত হবে। সরকার সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে বেশ কিছু সংখ্যক নীতি উদ্যোগ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে এবং দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধতা ও আনুগত্যহীনতার জন্য আইনগতভাবে শাস্তির বিধানসহ সেগুলো বাস্তবায়ন করছে। এগুলো আরো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন, রেল ও বিমানের নিরাপত্তা মান পর্যালোচনা করে তা যথাযথভাবে শক্তিশালী করা হবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের জন্য আইনগত বিধানসহ পুরোপুরি পরিবীক্ষণের আওতায় আনা হবে। সড়কসহ পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়নে পরিবেশগত বিবেচনায় যথা গুরুত্ব প্রদান করা হবে। দক্ষতার সাথে জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। বিদ্যুৎ চালিত আন্তঃনগর ট্রেন, মেট্রোরেল, বাস, কার প্রভৃতির মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানিযুক্ত পরিবহন উৎসাহিত করা হবে। যাত্রা বিরতিকালীন সেবা, অন লাইনে ব্যবহার বান্ধব টিকেট ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা সংগ্রহ এবং যথাসময়ে চলাচলের দিক থেকে রেল সেবা এবং বন্দরে পণ্য খালাসকরণের জন্য সেবা সংশ্লিষ্ট মান নির্ধারণ করা হবে।

সরকারি পরিবহন কর্তৃপক্ষের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্রস্তাবিত পরিবহন অবকাঠামো কৌশলের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে পরিবহন খাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা। একটি নির্দিষ্ট সমস্যা হলো মানসম্মত কর্মীবাহিনী গঠন, যেখানে বিশেষ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন সরকারি কর্মচারী ও কৌশলগত পেশাজীবী কর্মী সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে সামগ্রিক সরকারি প্রশাসনের জন্য এটি একটি সাধারণ সমস্যা হলো পরিকৃতির জন্য জবাবদিহিতার অভাব। এ ব্যাপারে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ কিছু উদ্যোগ প্রবর্তিত হয় যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা ও কর্মকৃতি মূল্যায়নসহ সরকারি প্রশাসন শক্তিশালী করার কাজ, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ মেয়াদে এই উদ্যোগসমূহ আরো শক্তিশালী করা হবে।

উপ-খাতসমূহের কৌশল

সড়ক পরিবহন কৌশল: সড়ক পরিবহন কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

- বিদ্যমান মহাসড়কগুলোতে একাধিক লেন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কগুলোর উন্নয়ন ও সংহতকরণ, সেই সাথে দীর্ঘ-দূরত্বের এক্সপ্রেস-ওয়ে'র অভিগম্যতা নিয়ন্ত্রণ স্থাপন এবং স্থানীয় সড়কের সাথে সংযোগশীলতা সহজ করার জন্য সার্ভিস-লেন নির্মাণ। উচ্চ-গতিতে চলাচল সুবিধার জন্য স্থায়ী উৎকৃষ্টতার ছাপ (হলমার্ক) যুক্ত মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাধান্য দান করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে করিডরগুলোর জন্য প্রতি ঘন্টায় ৮০-১১০ কিলোমিটার বেগে চলাচলের লক্ষ্য নির্ধারিত হবে, যা বর্তমানে ঘন্টায় মাত্র ২৫-৩৫ কিলোমিটার। শহর ঘিরে পরিকল্পিতভাবে বাইপাস গড়ে তোলা হবে এবং পূর্ব নির্ধারিত অবস্থানগুলোতে প্রবেশ/প্রস্থানের সাথে নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসওয়ে'র সুবিধা প্রদান করা হবে।

- মহাসড়ক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সুফল আহরণের জন্য সেগুলোর সাথে আন্তঃআঞ্চলিক হাইওয়ে, অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ, বন্দর, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সুবিধা, রেল স্টেশন ও রেলে মালামাল পরিবহনের কেন্দ্রসমূহ এবং বড় বড় পর্যটন রিসোর্টগুলোর সংযোগশীলতা স্থাপন করা হবে।

- জাতীয় মহাসড়ক ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত নয় এমন সকল জেলার জন্য আন্তঃজেলা সংযোগশীলতা নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান সড়ক ও সেতুসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে এবং যেখানে প্রয়োজন নতুন সম্প্রসারিত সড়ক নির্মাণ করেই এটি অর্জন করা সম্ভব। সকল আন্তঃজেলা সড়কেই চার লেন সুবিধা নির্মাণ করা হবে। সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানোর জন্য স্বল্পগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য একটি পৃথক লেনও তৈরি করা হবে।

- মহাসড়কে চলাচল সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে মহাসড়ক ও আন্তঃজেলা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির অংশ হিসেবে যাত্রীদের জন্য অবকাশ কেন্দ্র, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কেন্দ্র এবং গ্যাস স্টেশন, জরুরি মেরামতির মতো আবশ্যকীয় সেবা গড়ে তোলা হবে। বেসরকারি খাত এতে বিনিয়োগ করবে। জমি বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র এবং নিরাপত্তা সুবিধা দানের মাধ্যমে সরকার নীতিগত সহায়তা প্রদান করবে।

- উৎপাদন ও বিপণন কেন্দ্রের মধ্যে সহজ পরিবহন সংযোগশীলতা স্থাপনের জন্য সকল জেলা ও উপজেলা সড়ক উন্নয়ন করা হবে। এছাড়াও, এটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধ করাসহ অবস্থানগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এই সড়কগুলো অন্ততপক্ষে দুই লেন বিশিষ্ট হবে, তবে যেখানে চলাচলের চাপ বেশি, সেখানে চার লেন বিশিষ্ট সড়ক নির্মাণ করা হবে।

- গ্রামের সকল রাস্তা হবে পাকা যাত্রী ও পণ্যেও চলাচল সুগম করার জন্য এগুলো ন্যূনপক্ষে এক লেন-বিশিষ্ট হবে। দারিদ্র্য নিরসন, মানব উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও স্বল্প অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ বিনিয়োগ বিস্তারের জন্য সড়ক সংযোগশীলতার প্রসার হবে অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ।

- মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট ও সড়ক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা হলো সড়ক খাতের জন্য একটি উচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য কৌশলগত উপাদান। অর্থায়ন সবসময়েই একটি বাধা। সড়ক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সম্পদ সংগ্রহে একটি সুগঠিত সড়ক ব্যবহারকারী মাশুল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন একটি স্থায়ী উৎস হতে পারে। মহাসড়ক ও সেতুর জন্য টোল আদায় হতে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় আসবে।

রেলপথ উন্নয়ন কৌশল: একটি অগ্রবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে পরবর্তী ২০ বছর সময় পরিধিতে কৌশলগত রেলপথ আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন করা হবে। এতে সন্নিবেশিত হবে একটি বহু-বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা, যা একটি নির্ভরযোগ্য তহবিল পরিকল্পনা দ্বারা পূর্ণ সমর্থিত হবে। এডিপি থেকে পর্যাপ্ত অর্থায়নসহ এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। রেলপথ সেবার জন্যও ব্যয় পুনর্ভরণের ওপর জোর দেয়া হবে। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি :

- যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ চাহিদা সন্তোষজনক ভাবে পূরণ নিশ্চিত করতে (অধিক সংখ্যক ট্রেন ও দীর্ঘ পথগামী ট্রেন) সরবরাহ বৃদ্ধি।
- সেবা চাহিদা পূরণে নতুন লাইন স্থাপন, সকল রেল লাইনকে ব্রডগেজ সিস্টেমে উন্নীতকরণ, নিরাপত্তা মান উন্নয়নসহ আধুনিক ট্র্যাফিক সিগনাল স্থাপন এবং রেলপথ অবকাঠামো বিস্তার ও শক্তিশালী করা।
- নিরাপত্তা মানসহ পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী করা।
- প্রতিবেশীদের সংশ্লিষ্ট করে আঞ্চলিক ট্রেন সেবার সংযোগশীলতা স্থাপন।
- পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক অভিজ্ঞতা এবং মসৃণ প্রবাহের জন্য স্টেশনসমূহের অধিকতর উন্নয়ন।
- রেলপথ সেবা বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে রেলে নিয়োজিত মানব সম্পদের উন্নয়ন।
- আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য নতুন ধরনের 'কোচ' তৈরি।
- বন্দরের কাজ সম্পন্ন করাসহ মালামাল 'লোডিং' ও 'আনলোডিং' এর সময় কমিয়ে আনা।
- অধিকতর লাভজনক করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ, অনলাইনে টিকেট ক্রয় এবং সময়মতো সেবা দান।
- মূল করিডরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- চাহিদার ভিত্তিতে নতুন ট্রেন সেবা বাড়ানো।
- নতুন অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো স্থাপন।

- সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দরসহ সকল সমুদ্র বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন।
- প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আন্তঃআঞ্চলিক সেবার জন্য উন্নত শুল্ক ছাড় ব্যবস্থা।
- সড়ক পরিবহনে মানসম্মত হস্তান্তর সুবিধা।
- পর্যটক ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ সেবাসহ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বাজার সুবিধার বড় অংশ আয়ত্তে রাখতে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা শক্তিশালী করা।
- বাংলাদেশ রেলপথ একটি মাল্টি-মোডাল পরিবহন ব্যবস্থায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন উন্নয়ন কৌশল: বড় ও ছোট ছোট নদীর এক আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার প্রায় সব কয়টিই একে অন্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় নদীগুলো দিয়ে অনায়াসেই সমুদ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়। নৌপথে সংযোগের এই ব্যাপক বিস্তৃতি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার ও লালন করা যায়, তবে এটি বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর আওতায় যাত্রী ও কার্গো পরিবহনের জন্য এই সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হবে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কৌশলের প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- যাত্রী ও পণ্য পরিবহন প্রবাহে সম্ভাবনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যাত্রাপথসমূহ নির্দিষ্টকরণ এবং এই পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়নসহ নৌবন্দর অবকাঠামোর উন্নয়ন।
- কৌশলগত ড্রেজিং, নদী শাসন, ও বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নদী পথের নাব্যতায় দ্রুত উন্নতিসাধন (এই ক্ষেত্রে বিডিপি ২১০০ এর বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হবে)।
- বাণিজ্য, ব্যবসায় ও পর্যটন সুবিধা বাড়াতে আন্তঃআঞ্চলিক নৌ-সংযোগশীলতায় প্রাধান্য প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের সুফল সর্বাধিক করতে অন্যান্য পরিবহন মোডের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনকে একীভূত করা।
- সঠিক বাস্তবায়ন ও যথাযথ মান নির্ধারণের মাধ্যমে নৌপরিবহনের নিরাপত্তা মান দ্রুত উন্নতিকরণ। রেডিও যোগাযোগ সুবিধা ও যাত্রী বহন বিধিমালার বাধ্যবাধকতা অনুসরণসহ নিরাপত্তামূলক সুবিধাদির পর্যাপ্ততা এবং সংশ্লিষ্ট নৌযান চলাচলের উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হবে।
- নৌযানের উপযুক্ততার লাইসেন্স দ্বারা সকল নৌযানের ন্যূনতম মান ও সেবা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।
- লাইসেন্স সুবিধাযুক্ত কার্যাবলি দক্ষতার সাথে ও যথাসময়ে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য দক্ষ কারিগরি-কর্মী ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষকে (বিআইডব্লিউটিএ) শক্তিশালী করা হবে। সার্বিক প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হবে।
- ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি কর্মচারীদের উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট জরিপ পরিচালনা, নদী শাসন ও ড্রেজিং পরিচালনা বাস্তবায়নে বিআইডব্লিউটিএ'র সক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে। এরই সমান্তরালে পিপিপি'র ভিত্তিতে এই কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য বেসরকারি খাতকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- বিপুল পরিমাণ সম্পদ চাহিদার প্রেক্ষাপটে, সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনায় বেশির ভাগ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার অধিকাংশের ব্যবস্থাপনা থাকবে বেসরকারি খাতের ওপর।
- নদীবন্দর সুবিধাবলির দ্রুত উন্নতি করা হবে। এজন্য এগুলোতে নিরাপত্তা ও উদ্ধার সেবা, সংরক্ষণ সুবিধা, কন্টেইনার কার্গোসহ কার্গোর জন্য 'ডকিং' ও 'আনলোডিং' সেবাসহ যাত্রীদের জন্য আধুনিক মানসম্মত সেবা সুবিধা সন্নিবেশিত হবে। আন্তর্জাতিক নৌবন্দরগুলো থেকে প্রয়োজনীয় কাস্টমস ও তদারকি সেবা প্রদান করা হবে।
- বিনিয়োগ থেকে যাতে যুক্তিযুক্ত হারে মুনাফা পাওয়া যায়, তাই বাণিজ্যিকভাবে যাত্রী ও কার্গো পরিবহনের মূল্য নির্ধারণ সম্পন্ন করা হবে।

বিমান পরিবহন কৌশল: বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই, বিমানে যাত্রী চলাচল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশ বছরে বিমানে পণ্য পরিবহনও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। আয় বৃদ্ধির সাথে এই চাহিদা আরো বাড়বে। বিমানে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন হবে নতুন নতুন বিমান বন্দর নির্মাণ, বিদ্যমান বিমান বন্দরগুলোর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, সংযোগকারী অবকাঠামোর উন্নয়ন (সড়ক, মেট্রো ও সমুদ্র সংযোগ প্রভৃতি) এবং আকাশ-সীমার উন্নততর ব্যবস্থাপনার জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ। বিমান খাতে বর্ধিত চাহিদা মোকাবেলার জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করবে:

- দেশের ক্রমবর্ধনশীল বিমান পরিবহন চাহিদা মেটানোর জন্য একাধিক অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসহ একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ।
- বিদ্যমান সকল বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য অতিরিক্ত রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে তৈরি; অধিক সংখ্যক এয়ার ক্রাফ্টের স্থান সংকুলানের জন্য গেট ও অ্যাপ্রন সক্ষমতার প্রসার; অধিক সংখ্যক যাত্রী ধারণের জন্য টার্মিনাল সক্ষমতা বাড়ানো; বিমানের অধিক ওঠানামা নিশ্চিত করতে বিমান চালনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াসহ গ্রাউন্ড ব্যবস্থাপনা, গুদাম ঘর, ওয়ার্কশপ সুবিধাদি, হ্যাঙ্গার সুবিধা প্রভৃতিসহ সম্পূরক সেবা সুবিধা।
- আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিমান বন্দরের নিরাপত্তা শক্তিশালী করা।
- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে, যেমন বন্দর, পর্যটন স্থল ও শিল্পাঞ্চলে অব্যবহৃত এয়ার-স্ট্রিপসমূহের উন্নয়ন।
- বিমান সেবার সর্বোচ্চ সুফল আহরণকল্পে বিমান বন্দরগুলোতে স্থল-পরিবহন সংযোগশীলতা শক্তিশালী করা।
- বর্ধনশীল বিমান কার্গোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ অতিরিক্ত ভিড় ও বিলম্ব হ্রাসের জন্য একটি বিশেষায়িত এয়ার কার্গো টার্মিনাল স্থাপন। এর ফলে রপ্তানি ও আমদানি পণ্যের জরুরি চালান ও গ্রহণ সহজ হবে।
- নিরাপত্তা ও প্রসারিত সক্ষমতাসহ মসৃণ আকাশ সীমা গড়ে তুলতে 'এয়ার নেভিগেশন সার্ভিস' (এএনএস) উন্নত করা। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়নের সাথে ভবিষ্যৎ এএনএস অবকাঠামো অধিকতর সুসংহত ও স্বয়ংক্রিয় হবে।
- একটি উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যয় ও সময় বাঁচাতে সংরক্ষণ, মেরামতি ও সংস্কার সুবিধাসহ সেবা সুবিধার উন্নয়ন।
- দক্ষতা-নিবিড় ও প্রতিযোগিতামূলক এই ব্যবসায় মানবসম্পদ উন্নয়ন জোরদার করা।
- বিমান বন্দরের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ আকর্ষণ করা।
- বিমানবন্দর সেবার জন্য উপযুক্ত ব্যয় পুনর্ভরণ নীতিমালা গ্রহণ। সমুদ্র বন্দরের মতো বিমান বন্দরও একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ, তাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা হবে।

সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন কৌশল: বাংলাদেশে মোট দেশজ আয় প্রবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর গতিতে বাড়ছে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাহিত পণ্য চলাচল। এই ক্রমবর্ধিত চাহিদার সমর্থনে এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগ-সক্ষম হয়ে ওঠার জন্য বন্দর খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বন্দর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

- বন্দরে কার্গো ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে জাহাজের নোঙ্গর দিবস ও 'গ্যাংশিফ্‌ট-এর উৎপাদন শক্তির অধিকতর উন্নয়নসহ প্রতিটি বন্দরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
- অধিকতর প্রতিযোগিতা স্পৃহা সঞ্চারসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাছাইকৃত কিছু সংখ্যক ক্ষেত্রে কার্গো সামলানোর কাজ ক্রমান্বয়ে বাইরের কোন কোম্পানির দ্বারা / বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালনা করা হবে।
- প্রধান বন্দরগুলোতে কার্গো সমলানোসহ এর চলাচল সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিকীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
- বন্দরের সংরক্ষণ এলাকা আরো বিস্তৃত করা হবে।
- বন্দর ও বন্দর-বহির্ভূত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান যথাসম্ভব কমিয়ে আনার মাধ্যমে জাহাজের টার্ন টাইমে উন্নতি ও প্রাক-নোঙ্গর বিলম্ব হ্রাসের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

- বড় বড় জাহাজের যাতায়াত সুবিধা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কাজ পরিচালনা করা হবে।
- বড় বড় কার্গোর অফ-লোডিং সামলানোর জন্য টার্মিনালের সক্ষমতার প্রসার ঘটানো হবে।
- গভীর সমুদ্রে কন্টেইনার সংরক্ষণ, বন্দর নির্মাণ দ্বারা বড় কন্টেইনার ট্র্যাফিক সামলানোর সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- আমদানিকৃত সামগ্রী নির্দিষ্ট গন্তব্যে দ্রুত পরিবহনসহ রপ্তানির জন্য পণ্যসামগ্রী ফ্যাক্টরি-গেট থেকে সহজে বন্দরে নিয়ে আসার জন্য বন্দরগুলোর সাথে আন্তঃমোডাল পরিবহন সংযোগশীলতা স্থাপন নিশ্চিত করা হবে।
- প্রধান প্রধান বন্দরের পরিকৃতি উন্নয়নের জন্য আধুনিক কার্গো-হ্যান্ডলিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে, বিশেষ করে ড্রাই বাল্ক কার্গো, কনভেনশনাল ও ইউনিটাইজড কার্গো-হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে।
- ব্যবহারকারীদের লেনদেন ব্যয় হ্রাসসহ কর্মসম্পাদনের সময় কমাতে কাগজবিহীন ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য এবং সুসংহত বন্দর পরিচালনা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি / ইন্টারনেট প্রবর্তন দ্বারা বন্দর সেবার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হবে। যে প্রধান প্রধান ক্ষেত্র অটোমেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, সেগুলো হলো: জাহাজ চলাচল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (ভিটিএমএস); কার্গো / কন্টেইনার সামলানোর কাজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজসহ বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে তথ্য প্রযুক্তি; নজরদারি ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা; এবং ইলেকট্রনিক বাণিজ্য (ইসি) / ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জ (ইডিআই)।

নগর পরিবহন উন্নয়ন কৌশল: টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা প্রদানই হলো নগর পরিবহন কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য। নগর পরিবহন কৌশলের লক্ষ্য হবে পরিবহন ও ট্র্যাফিক অবকাঠামোর উন্নয়ন যাতে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চাহিদা পূরণসহ সমন্বিত ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। যেখানে পরিবহনের সকল মোড (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক) দক্ষতার সাথে চলাচল করতে পারে এবং প্রতিটি মোড এই ব্যবস্থায় যথাযথভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। নগর পরিবহন কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাথমিকভাবে ঢাকা সিটি ও সন্নিহিত এলাকাগুলোতে এবং পরবর্তীতে সকল মেট্রোপোলিসে এলিভেটেড ও আন্ডার গ্রাউন্ড রেল উভয় ধরনের 'মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি মেট্রোরেল) সুবিধা গড়ে তোলা হবে।
- সকল বিভাগীয় সিটিতে বাসের দ্রুত চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট লেন চিহ্নিত করে 'বাস র‍্যাপিড ট্র্যানজিট (বিআরটি) সুবিধা গড়ে তোলা হবে।
- যাত্রী ও সাইকেল আরোহীদের জন্য বিশেষ লেন তৈরি।
- উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ও বিকল্প জ্বালানি চালিত যানবাহন বিস্তার।
- প্রথমে ঢাকায় স্বয়ংক্রিয় পরিবহন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং পরবর্তী অন্যান্য মেট্রোপলিসে এর বিস্তার করা। আইটিএস প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে ইলেকট্রনিক রোড প্রাইসিং, ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পাবলিক পরিবহন মোডের জন্য সমন্বিত টিকেট সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত হবে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান সকল মহানগর ও জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে ইন্টেলিজেন্ট ট্র্যান্সপোর্ট সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা হবে।
- বাস র‍্যাপিড ট্র্যানজিট (বিআরটি) ও মাস র‍্যাপিড ট্র্যানজিট (এমআরটি/মেট্রো রেল) এর মাধ্যমে মহানগর এলাকা ঘিরে সকল মহানগর ও শহরের সাথে সংযোগ শক্তিশালী করা হবে। কর্মস্থলে ও আর্থসামাজিক সুবিধাবলির মতো মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলো সহজলভ্য করতে পরিবহন পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহারের সমন্বিত উন্নয়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
- বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে পার্কিং সুবিধাকে উৎসাহিত করা হবে। ব্যতয়কারীদের জন্য জরিমানাসহ সকল পার্কিং আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।
- প্রচন্ড রকমের ভিড়ে আকীর্ণ সড়কগুলোতে দিনের সময় ব্যবহারে বিধিনিষেধ কার্যকর করা হবে। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সড়কগুলোর জন্য সবচাইতে ব্যস্ত সময়ে প্রবেশ ফি চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
- প্রথমে ঢাকা মহানগরীতে এবং পরে অন্য মহানগরীতে, পথচারী সড়ক স্থাপনের ওপর জোর দেয়া হবে।

১০.৬ যোগাযোগ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি হয়। নব্বই দশকের প্রথম ভাগে মোবাইল ফোন সুবিধা বিস্তারে ব্যক্তিখাতের নিবিষ্টতার সাথে টেলিযোগাযোগ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। টেলিযোগাযোগ খাতের মতোই বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের যুগ থেকে, ১৯৭২ সাল থেকে যার একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল, সেখানে থেকে ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়াও আজ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে বেসরকারি টিভি চ্যানেল চালু হলে প্রতিযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়, ফলে কর্মসূচির মানের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান উন্নতি হয়। বিগত দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এফএম চ্যানেল চালু হবার সাথে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে, রেডিও শ্রবণও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রিন্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। আজকাল বহুসংখ্যক বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হয়। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পাঠকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যায় বাংলাদেশি সংবাদপত্রগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণ। বাংলাদেশ ডাকঘর থেকেও দেয়া হয় এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস, ইলেকট্রনিক মেইল সার্ভিস, ইন্টারনেট ও ই-মেইল সার্ভিসের জন্য ই-পোস্ট সেবা সহ নানা ধরনের সেবা। বেসরকারি সংস্থা থেকে উচ্চমানের আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সেবা সরবরাহ করা হয়। এই অগ্রগতিসমূহ বাণিজ্য ও ব্যবসায় উদ্যোগসহ অনলাইন বাণিজ্যের জন্য প্রচুর সহায়ক হয়।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ মেয়াদে এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং কৌশলও সঠিক খাতে এগিয়ে নেয়া হয়। বাংলাদেশের জন্য যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বহুমুখী বৈচিত্র্যময় ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। সামাজিক মাধ্যম, ভিডিও ও প্রিন্ট মাধ্যমে তথ্য প্রবাহ বিপুল বেসরকারি বিনিয়োগসহ সামনে এগিয়ে চলে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর জন্য এটি সাফল্যের একটি প্রধান ক্ষেত্র।

এই সাফল্যের ওপরেই গড়ে উঠবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এবং তা বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও সেবার বিস্তারে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূলে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দান অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়াও, বেসরকারি প্রিন্ট, অডিও ও ভিডিও মিডিয়ার বিস্তার ত্বরান্বিত করাসহ যোগাযোগ সেবা এবং জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থার সুস্থ বিকাশের ধারাও অব্যাহত রাখা হবে। আইন ও বিধানের মাধ্যমে সরকারি ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং এটি নিশ্চিত করা হবে যে, তথ্য বিনিময় যেন বাস্তব ঘটনাভিত্তিক হয় এবং তা যেন সামাজিক অস্থিরতাকে তীব্র না করে বা আইন-শৃংখলা ভঙ্গের পরিস্থিতি তৈরি না করে। এ ধরনের তথ্য বিনিময় অপব্যবহার প্রতিরোধ করা হবে। একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের সহায়তাকল্পে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ তথ্য অধিকার আইনের বিধান বাস্তবায়ন করবে।

সেবার অধিকতর নির্ভরযোগ্যতাসহ মেইলের দ্রুত হস্তান্তরের মাধ্যমে ডাক সেবার আধুনিকায়ন অব্যাহত থাকবে। বৈশ্বিক ক্যারিয়ারসমূহের সাথে অংশীদারিত্বসহ বেসরকারি সেবার অনুকূলে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। মেইল ট্র্যাকিং এর মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার আধুনিকায়ন শক্তিশালী করা হবে।

অধ্যায় ১১

একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে নগর পরিবর্তনশীলতার ব্যবস্থা

একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে নগর পরিবর্তনশীলতার ব্যবস্থা

১১.১ নগরায়ণ ও উন্নয়ন

সমগ্র দেশে ৫১৬ টি নগর কেন্দ্র আছে। রাজধানী শহর ঢাকা হলো একটা মেগাসিটি-এর দুটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। সাতটি বিভাগীয় শহর রয়েছে যেগুলো এখন সিটি কর্পোরেশন হয়েছে। এছাড়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর রয়েছে ঢাকার কাছে (নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর) যা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়েছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে বাকী ৫৩টি জেলায় সিটি কর্পোরেশন এলাকা বাদে জেলা পর্যায়ের শহর। দেশে ৪৯২ টি উপজেলা রয়েছে । ২৯৩ টি উপজেলা শহর হলো পৌরসভা। উপজেলা শহর ছাড়াও বন্দর, শিল্প এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকাগুলোর কাছে ৩৮ টি নগর কেন্দ্র আছে, যা পৌরসভা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাকীগুলো উপজেলা শহর।

২০১১ সালের শুমারী অনুসারে, নগরের জনসংখ্যার অবস্থা নিম্নরুপ:

- ১০ লক্ষের অধিক জনসংখ্যার ২ টি সিটি (ঢাকা এবং চট্টগ্রাম);
- ৫,০০,০০০-১০,০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৬টি শহর (রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং বগুড়া);
- ২,০০,০০০-৫,০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১০ টি শহর (সাভার, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, কুস্টিয়া, যশোর, কক্সবাজার, ফেনী এবং মানিকগঞ্জ);
- ১,০০,০০০-২,০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২৫ টি শহর, প্রধানত বৃহত্তর জেলাসমূহ, জেলা শহরসমূহ এবং উপজেলা পর্যায়ের শহরসমূহ যেমন চৌমুহনী, ভৈরব, শ্রীপুর, সৈয়দপুর এবং তারাবো;
- ৫০,০০০-১,০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে বাকি জেলা শহরসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা পর্যায়ের শহরসমূহ
- ১০,০০০--৫০,০০০ জনসংখ্যার উপজেলা পর্যায়ের শহরসমূহ;

  (নারায়ণগজ্ঞ সিটি করপোরেশনের মধ্যে রয়েছে পূর্বতন নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদম রসুল পৌরসভা। গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মধ্যে রয়েছে পূর্বের গাজীপুর ও টংগী পৌরসভা);
- "আমার গ্রাম আমার শহর" সরকারের পল্লী রূপান্তরের একটা কর্মসূচি আছে নামে এর লক্ষ্য হলো শহরের স্থানান্তরিত হওয়া ঠেকাতে গ্রামীণ পর্যায়ে গুণগত নাগরিক সেবা প্রদান;
- জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা প্রদান করতে সরকার জেলা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে; এবং
- নতুন কর্মসংস্থান তৈরীতে সরকার সমগ্র দেশে একশত অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে। অর্থনৈতিক এলাকাগুলোর কাছে শহর বিকাশের ভালো সুযোগ রয়েছে। উদাহরণ হিসেব, জাইকা মহেশখালীর মাতারবাড়ী অর্থনৈতিক এলাকায় শহর প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

নগরায়ণ ও উন্নয়ন অত্যন্ত গভীর ও ইতিবাচকভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উৎপাদনের উপকরণসমূহের নৈকট্য এবং উচ্চ অর্থনৈতিক ঘনত্বের (স্থানের একক প্রতি মূল্য সংযোজন) কারণে নগরাঞ্চলসমূহই প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। এতে অবাক হবার মতো কিছু নেই যে, উচ্চ-ও মধ্যম-আয়ের দেশগুলো অধিকতর নগরায়িত এবং নিম্ন-স্বল্প আয়ের দেশগুলোর চেয়ে এদের নগরাঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক ঘনত্ব অধিকতর (চিত্র ১১.১)। নগরায়ণ ও মোট দেশজ আয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নগরাঞ্চলগুলোর উৎপাদনশীলতা সুবিধার নির্দেশক।

চিত্র ১১.১: নগরায়ণ, নগর অর্থনৈতিক ঘনত্ব এবং জিডিপি (২০০০)

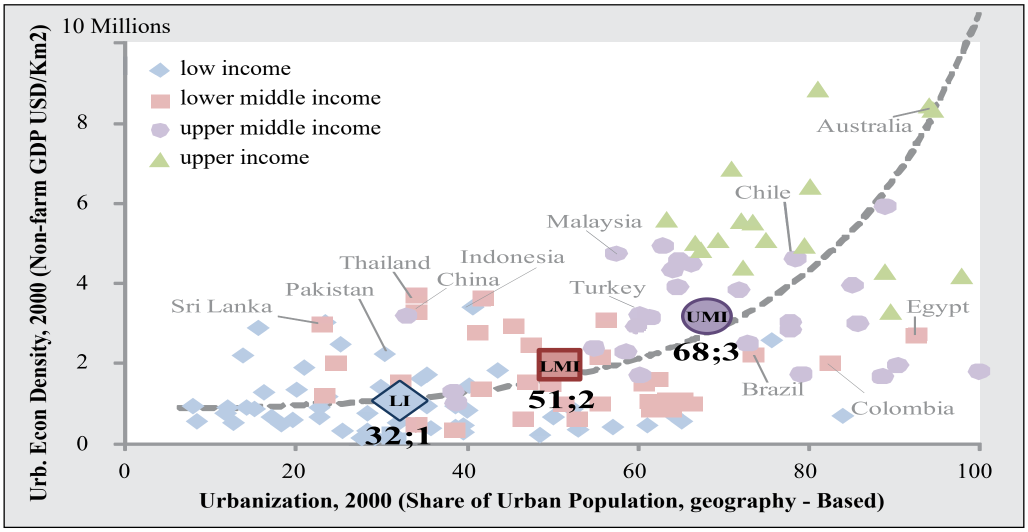

উৎস: বিশ্ব ব্যাংক, "বাংলাদেশ: ত্বরান্বিত, অন্তরভূক্ত ও টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে সুযোগ ও সমস্যাবলি"
রিপোর্ট নং ৬৭৯৯১। বিশ্বব্যাংক, ঢাকা

বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় (চিত্র ১১.২) । বাংলাদেশে নগর-গ্রামীণ মূল্য সংযোজন ও উৎপাদনশীলতার পার্থক্য এদের জনসংখ্যা ঘনত্বের পার্থক্যের চেয়ে অধিকতর ব্যাপক।

- শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৮০০ জন) গ্রামাঞ্চলের (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮০০ জন) দ্বিগুণেরও বেশি। এ বিচারে দেখা যায় যে, নগর অর্থনৈতিক ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) গ্রামীণ অর্থনৈতিক ঘনত্বের (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩২০,০০০ মার্কিন ডলার) প্রায় নয়গুণ।
- জনপ্রতি গড় জিডিপি-তেও গ্রামাঞ্চলের (মার্কিন ডলার ৪০০) চেয়ে শহরাঞ্চলে (মার্কিন ডলার ১৫০০) প্রায় চারগুণ বেশি।
- ফলে এটি স্পষ্ট যে, শহরাঞ্চলই বাংলাদেশের জন্য প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

চিত্র ১১.২: বাংলাদেশে গ্রাম-শহর ঘনত্ব ও উৎপাদনশীলতায় পার্থক্য [১৭]

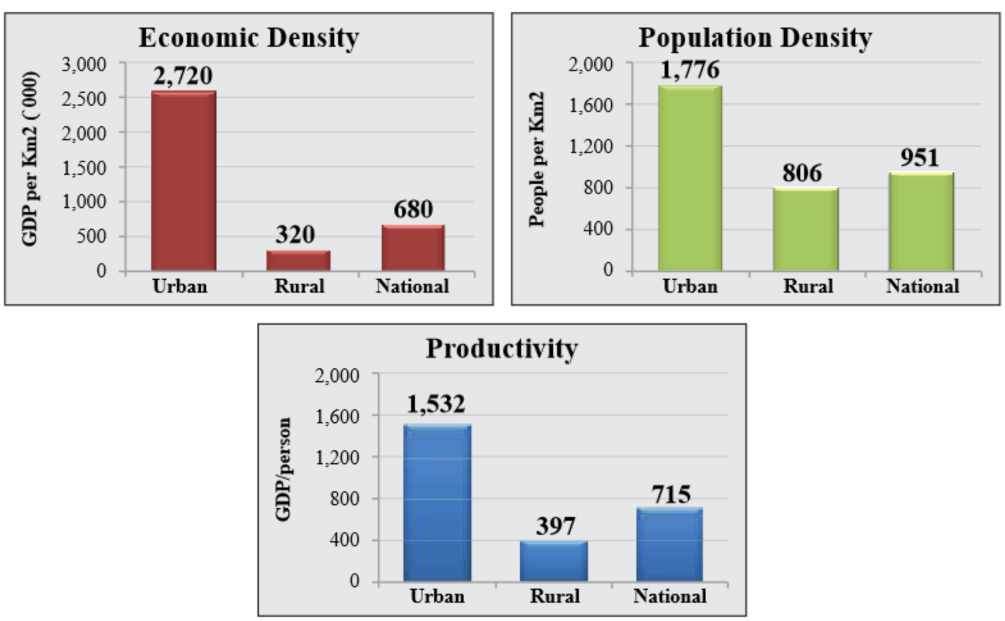

উৎস্য : বিশ্ব ব্যাংক (২০১২) ।

১৭ ২০১০ অর্থবছরের প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে

২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের প্রচেষ্টার সাথি হয়ে নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ভবিষ্যতে হাত ধরাধরি করে একত্রে এগিয়ে যাবে। তবে বাংলাদেশের জন্য উচ্চ-মধ্য-আয় এবং উচ্চ আয় দেশ অভিমুখে সম্ভাব্য দু'টি স্থানিক অর্থনৈতিক পথ খোলা রয়েছে (চিত্র ১১.৩)। প্রথমটি (পথ "এ") হলো বিদ্যমান নগর প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোকে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) উচ্চতর মূল্য সংযোজিত পণ্য ও সেবার দিকে রূপান্তরের অব্যাহত প্রচেষ্টা। আর দ্বিতীয়টি (পথ "বি") ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে কর্মসংস্থানসহ অ-কৃষি উৎপাদনকে অধিকতর বহুমুখী করা। এই পরবর্তী কৌশলটির মাধ্যমে অন্যান্য শহর ও নগরগুলোর বর্ধিত অর্থনৈতিক ভূমিকার পাশাপাশি একটি অধিকতর বৈচিত্র্যময় নগরায়ণ আনয়ন সম্ভব হবে। বেশ কয়েকটি উচ্চ-মধ্য-আয় এবং উচ্চ-আয় দেশের অভিজ্ঞতা দৃষ্টে উভয় পথেই অগ্রগতি সম্ভব হলেও বাংলাদেশের ঘনীভূত নগরায়ণের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ "বি" -তে বর্ণিত নগরায়ণের বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি স্বল্প ঝুঁকিসম্পন্ন বিকল্প রূপে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র ১১.৩: ইউএমআইসি অভিমুখে নগরায়ণ পথ -- একটি দৃশ্যকল্প বিশ্লেষণ[১৮]

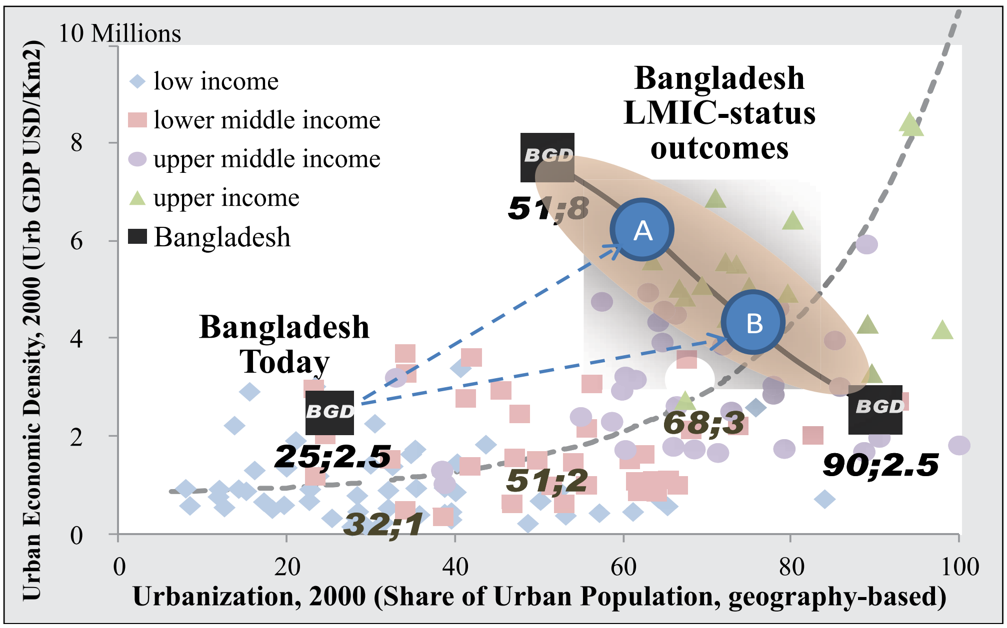

উৎস: বিশ্ব ব্যাংক

নগরায়ণের ধরন অনেকগুলো কারণেই জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক:

- প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ জরুরি।
- শিল্প কারখানার জন্য নগরাঞ্চলগুলোই আকর্ষণীয় অবস্থান, কেননা এখানে উপকরণ ও পণ্যের বাজারের সহজপ্রাপ্যতা রয়েছে। এছাড়া, নগরাঞ্চলে অবকাঠামো ও সেবার নৈকট্য সহজেই অধিগম্য।
- তবে অবস্থান হিসেবে নগর কেন্দ্রগুলো বেশ ব্যয়বহুল, কেননা এখানে ঘনত্বের কারণে জমির মূল্য ও মজুরিও বৃদ্ধি পায়।
- নগরায়ণ যদি সুব্যবস্থাপন্ন না হয়, তাহলে তা সেবাসুবিধা দানে ভিড়, দূষণ ও অদক্ষতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। এর ফলে প্রবৃদ্ধির মূলযন্ত্র অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

১১.১.১ নগর খাতে সাম্প্রতিক উন্নয়ন

১৯৬১-২০১১ এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তা ৫.১ কোটি থেকে উন্নীত হয় ১৫ কোটিতে। নগরের জনসংখ্যা প্রায় বিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৬১ সালের ৩০ লক্ষেরও কম থেকে তা উচ্চ হারে বৃদ্ধি পেয়ে

১৮ মূল বিশ্বব্যাংক বিশ্লেষণ করা হয় ২০১২ তে এবং এমআইসি'র জন্য তা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ২০২১ এ। বাংলাদেশ ২০১২ তে ছিল নিম্ন-আয় দেশ । বাংলাদেশ নিম্ন -মধ্য-আয় দেশের মর্যাদা পায় ২০১৫ তে। এখন তা উচ্চ মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবার জন্য এগিয়ে চলেছে। তবে নগরায়ণ দৃশ্যকল্পের জন্য বিদ্যমান বিশ্লেষণ কাঠামো অপরিবর্তিত রয়েছে।

২০১১ তে ৪.২ কোটি এসে দাঁড়িয়েছে। এই জনসংখ্যাগত গতিতত্ত্বের কারণে, নগর জনসংখ্যার অংশ ১৯৬১ সালের প্রায় ৫ শতাংশ থেকে ২০১১ তে ২৮ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৯ তে এটি ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে নগরায়ণের গতিধারা শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পর ১৯৭০ এর দশকে এটি গতি লাভ করে। বিশেষ করে ১৯৭৪-১৯৮১ এই সময় পরিধিতে নগরায়ণের প্রবৃদ্ধি ছিল দ্রুত। ২০০১ থেকে এই গতি প্রায় ৩ শতাংশে স্থিতিশীল হয়েছে, তবে তা এখনো জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে চলমান নগরায়ণ অভিজ্ঞতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রাজধানী শহর ঢাকায় নগর জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ঘনত্ব। জনসংখ্যার সাথে ঢাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘনত্বও সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী বৃহত্তম নগরী হলো চট্টগ্রাম, আয়তনে যা ঢাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এটি একটি বন্দর নগরী এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্ট স্বার্থও এখানে আকৃষ্ট হয়। বিগত দুই দশক যাবৎ বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম একত্রে সেবা দান করছে। অপর ছয়টি বিভাগীয় শহর কেন্দ্রগুলো-যথা রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও রংপুর এখনো প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হিসেবে তার অবস্থান আশানুরূপ বিকশিত হতে পারেনি। নগর অঞ্চলসমূহ বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর, বাংলাদেশের প্রধান প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হলেও, এখনো নগরায়ণ এলোমেলোভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের কিছু সংখ্যক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, বিশেষ করে নগর পরিবহন, আবাসন, মৌলিক নগর সেবা (পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেইনেজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) এবং নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ (বায়ু দূষণ, পানি দূষণ) সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি। তবে নগর দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

১১.১.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে নগর খাতে সংশ্লিষ্ট কৌশল ও নীতিমালা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ নগরায়ণ সমস্যার গুরুত্ব ও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এর কৌশলে নগরায়ণের পদ্ধতি আমূল সংস্কারের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে ঢাকা-কেন্দ্রিক নগরায়ণের পরিবর্তে অনেকগুলো নগরকেন্দ্রের সুষম উন্নয়নের ওপর। এতে নগর প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের অনুকূলে পরামর্শ এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণসহ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও বরাদ্দ উন্নয়নেও এতে পরামর্শ রাখা হয়। নগরের ভৌত পরিবেশ উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ একত্রীকরণের মাধ্যমে নগর সেবার ব্যাপক ও টেকসই বিস্তারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়। সব কিছু একত্র বিবেচনায় নিয়ে, নগরায়ণের জন্য এটি একটি সমন্বিত ও সুষম পদ্ধতি হয়ে উঠেছে এবং তা ২০১০ এ চালু কৌশল থেকে ভিন্ন ধরনের।

নগরায়ণে এই দূরদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর নগর কৌশলের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। নগর অবকাঠামো ও সেবায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করা হলেও দীর্ঘকালের অপূর্ণ চাহিদার পুঞ্জীভবন এবং নগরায়ণের অব্যাহত দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঐ সকল বিনিয়োগকে ছাপিয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর নির্বাচিত ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়নে অগ্রগতি হলেও আর কিছুই এগোয়নি। নগর সংস্থাগুলোর ওপর যে সামান্য আইনগত দায়দায়িত্ব রয়েছে তার বেশির ভাগই অন্যান্য সরকারি সংস্থার অধিকারভুক্ত। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এখনো হয়নি। ফলে, নগরায়ণ সংস্থাগুলোকে একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় জাতীয় সরকারের অর্থায়নের ওপর। নিজস্ব সম্পদ সমাবেশ অত্যন্ত নিম্ন (সমষ্টিগতভাবে জিডিপির প্রায় ০.১৬% মাত্র), যা দিয়ে তাদের চলতি ব্যয়ও মেটানো সম্ভব হয় না। বিগত ২০১০ ও ২০১৮ এর মধ্যে ঢাকার প্রাধান্য অধিকতর বৃদ্ধির সাথে অসম নগরায়ণও হয়েছে। নগরের বস্তিগুলোর জনসংখ্যাও ব্যাপকভাবে বাড়ছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে, নগরের স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যার জন্য নগরের পরিবেশে অব্যাহতভাবে অবনতি ঘটছে। ড্রেইনেজ সমস্যা, বিশেষ করে ঢাকায়, অত্যন্ত তীব্র হয়েছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ভারি বৃষ্টিপাতে সমস্ত রাস্তা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় ঢাকায় তৈরি হয় ঘন্টার পর ঘন্টা ট্র্যাফিক জ্যাম।

নগর এজেন্ডা এখন পরিষ্কারভাবে জরুরি তালিকায় যুক্ত হয়েছে। নগর এজেন্ডাকে সামনে এগিয়ে নিতে নগর প্রশাসন, বিশেষ করে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিকেন্দ্রীকরণ সংস্কারে কোন প্রকার অধিক্রমণ ছাড়াই দায়িত্বভার অর্পণ এবং আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ব্যাপারে বেশ কিছু উত্তম পদ্ধতির অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা থেকে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে।

১১.২ নগরায়ণের জন্য ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা

নগরায়ণ ও উন্নয়নের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে রূপান্তর করার কৌশলের অপরিহার্য অংশ হিসেবে এর নগর খাত রূপান্তর প্রাধান্য পাবে এমনটি আশা করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নগর খাতই ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য-আয় দেশে এবং পরিশেষে ২০৪১ এ উচ্চ-আয় দেশের মর্যাদা অর্জনের অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দান করবে। ২০৪১ এ নগরায়িত বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হবে আজকের উচ্চ-আয় অর্থনীতিগুলোতে যে নগর পরিবেশ পরিদৃষ্ট হয়, ঠিক তেমনি।

১১.২.১ নগর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প

বিশেষ করে, নগর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রূপকল্প হলো:

- এমন একটি অর্থনীতি যেখানে জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই নগরাঞ্চলে বসবাস করে এবং এমন একটি মানসম্মত জীবনব্যবস্থা যা তুলনীয় হতে পারে আজকের উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উচ্চ-আয় অর্থনীতিগুলোর জীবনযাত্রা মানের সাথে।
- নগরে এমন এক ভৌত পরিবেশ হবে, যেখানে বাস্তুসংস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নগরবাসীদের চাহিদার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য থাকবে। বিশেষ করে, সকল নগর হবে উপযুক্ত ড্রেইনেজ, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা সংবলিত বন্যামুক্ত অঞ্চল।
- এমন একটি নগরকেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামো সক্রিয় থাকবে, যেখানে কোন দারিদ্র্যতা তৈরি হবে না, কোন বস্তি থাকবে না এবং প্রতিটি খানা হবে ন্যূনতম মানসম্পন্ন মৌলিক আবাসনের সংশ্লিষ্ট সুবিধাযুক্ত।
- একটি নগরকেন্দ্রিক সেবা শিল্প থাকবে, যা মানসম্মত নগর অবকাঠামো সুবিধা প্রদানসহ চাহিদা অনুযায়ী উন্নত নগর সেবা প্রদান করবে।
- নগরবাসী কর্তৃক নির্বাচিত একটি নগর প্রশাসন কাঠামো, তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হবে এবং যা নগর উন্নয়ন করসহ সম্ভাব্য জাতীয় সরকারের অর্থায়ন, প্রদত্ত সেবা থেকে ব্যয় পুনর্ভরণ এবং দায়িত্বশীল ঋণ গ্রহণের একটি বলিষ্ঠ ও টেকসইযোগ্যতার সমন্বয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীন সত্ত্বা হবে।

১১.২.২ নগর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

এই রূপকল্পকে অগ্রগতির পরিবীক্ষণযোগ্য নির্দেশকগুচ্ছে রূপান্তরের জন্য নগর খাতের লক্ষ্যমাত্রা সারণি **১১.১** এ প্রদর্শিত হলো। উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, যা উচ্চ-আয় দেশগুলোতে দৃশ্যমান নগর পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্যাবলি বাংলাদেশের নগর পরিবেশের টেকসইত্ব নিশ্চিত করার জন্যও জরুরি, বিশেষ করে নগর প্রশাসন, নগর অর্থায়ন এবং নগরকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে।

সারণি ১১.১: নগর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

উদ্দেশ্যাবলি / লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮ (ভিত্তি বছর)	২০৪১ (প্রক্ষেপণ)
নগেরর জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার %)	৩০	৮০
প্রাথমিক শহরের সংখ্যা	২	৮
মোট নগর জনসংখ্যায় ঢাকা মহানগরের অংশ (%)	৩৩	২৫
মোট নগর জনসংখ্যায় অপর ৭টি প্রাথমিক নগরের অংশ (%)	২৩	৩০
বৈদ্যুতিক সংযোগসহ খানার সংখ্যা (%)	৯০	১০০
কলের পানি সংযোগসহ খানা র সংখ্যা (%)	৪০	১০০
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ খানার সংখ্যা (%)	৪২	১০০
বর্জ্য অপসারণ সংযোগসহ খানার সংখ্যা (%)		১০০
নগর দারিদ্র্যে (%)	১৫.৭	০
বস্তিতে বসবাসকারী খানার সংখ্যা (%) (ইউএন সংজ্ঞা অনুযায়ী)	৫৫	০
আধুনিক বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার সুবিধাসহ নগর কেন্দ্রের সংখ্যা (%)	তথ্য নেই	১০০

উদ্দেশ্যাবলি / লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮ (ভিত্তি বছর)	২০৪১ (প্রক্ষেপণ)
বর্জ্য পানি শোধন সুবিধাসহ নগর কেন্দ্রের সংখ্যা (%)	তথ্য নেই	১০০
সরকারি ব্যয়ের অংশ হিসেবে নগর-স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় (%)	৫	২৫
মোট দেশজ আয়ের অংশ হিসেবে নগর-স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় (%)	০.৭	৮
মোট করের অংশ হিসেবে নগর-স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর (%)	২.৩	২০
মোট দেশজ আয়ের অংশ হিসেবে নগর-স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর (%)	০.২	৪
ঢাকায় সবুজ অঞ্চল (বর্গমিটার, প্রতি মিলিয়ন জনে)	তথ্য নেই	৫
অপর ৭টি নগরের সবুজ অঞ্চল (বর্গমিটার, প্রতি মিলিয়ন জনে)	তথ্য নেই	১২
পানির গুণগত মান শতভাগ সুরক্ষাসহ সংরক্ষিত নগর জলাশয় (%)	০	১০০
বায়ুর মান (বার্ষিক গড়, মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটার পিএম২.৫)	৮৬	১০
পানি নিষ্কাশনসুবিধাসহ বন্যামুক্ত নগর অঞ্চল (%)	০	১০০
জোনিং আইন মেনে চলা (%)	তথ্য নেই	১০০
পার্কিং আইন মেনে চলা (%)	তথ্য নেই	১০০
আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যালযুক্ত নগর রাস্তা	তথ্য নেই	১০০
গণ-পরিবহন সম্পৃক্ত প্রাথমিক শহর	০	৮

উৎস: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রক্ষেপণ

১১.৩ নগর সংস্কার কৌশল

নগর খাতের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ নগর উন্নয়নকে সামনে এগিয়ে নিতে উত্তম পদ্ধতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে।

১১.৩.১ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা

মার্সার নগরের বাসযোগ্যতা সূচক ও অনুরূপ অন্যান্য সূচক থেকে জানা যায় যে, অনেক দেশেরই বেশ ভালো দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নগরায়ণ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং অনেকগুলো দক্ষ ও উন্নত মানের নগরও গড়ে উঠেছে। এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে প্রচুর পরিকল্পনা, কৌশল, প্রতিষ্ঠান ও নীতি তৎপরতার ফলশ্রুতিতে। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলো থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে আলোকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য তার নিজস্ব কৌশল এবং সংস্কার সূচি গড়ে তুলবে। এ ধরনের মৌলিক শিক্ষার কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. উন্নত মানের নগরগুলো এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এবং শক্তিশালী ও দায়বদ্ধ নগর সরকার। এই সরকারগুলো জাতীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট নগরের অধিবাসীদের কাছে দায়বদ্ধ।

২. নগর সরকারসমূহের দায়দায়িত্ব আইনগত কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে। জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে দায়িত্বগুলো কখনো পরিবর্তিত হয় না। সরকারের উচ্চতর পর্যায়ের সাথে সেবা বিতরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংঘাত বা অধিক্রমণ কখনো হয় না।

৩. জনমালিকানার ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা নগর সরকারের দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সাথে সমন্বয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট নীতিতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকে এবং এর অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলি একান্তভাবেই নগরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

৪. একটি আইনগতভাবে সুনির্দিষ্ট আর্থিক কাঠামোর মাধ্যমে নগরসমূহের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং এই কাঠামো গড়ে তোলা হয় জাতীয় অনুদান, বাজার হতে ঋণ সংগ্রহ ও করের অংশের সমন্বয়ে এই কাঠামো গড়ে তোলা হয়।

৫. ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়কৃত মাশুল নগর সরকারের অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. জনস্বার্থ সুরক্ষা এবং দেশের জন্য সমস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি যেমন পরিবেশগত নিরাপত্তা, পানির গুণগতমান ও বায়ুর মান প্রভৃতি বিষয়ে ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক এই মানগুলো পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৭. কিছু সংখ্যক পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে যৌথ-অর্থায়ন বা প্রণোদনা পরিশোধ আকারে জাতীয় অনুদান ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়।

৮. নগর পরিকল্পনা ও কৌশল সংশ্লিষ্ট নগর এবং উচ্চতর পর্যায়ের সরকারের মধ্যে একটি অংশগ্রাহী দায়িত্ব। নগর পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক, যা অধিবাসীদের সাথে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সুবিন্যস্ত পরামর্শ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত।

সারকথা এই যে, উত্তম কর্মপদ্ধতির আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দুটি বড় এজেন্ডাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে, যার সমাধান করেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এর প্রথমটি হলো, নগর অর্থায়নের বিষয়। আর দ্বিতীয়টি হলো নগর প্রশাসন সমস্যার সমাধান। দু'টোই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং এর সমাধানও হতে হবে একসাথে। আসল সমস্যা হলো একটি দায়বদ্ধ নগর সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা হবে জনর্নির্বাচিত, অধিবাসীদের চাহিদার প্রতি দায়িত্বশীল, পর্যাপ্ত আর্থিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী এবং সর্বোপরি যেখানে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসন ভোগ নিশ্চিত করা যাবে।

১১.৩.২ নগর সংস্কার সংশ্লিষ্ট আইন

এই সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দরকার আইনগত কাঠামোতে সঠিক পরিবর্তন করা। পরিবর্তিত কাঠামোতে নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হবে এবং বিশেষ করে জাতীয় সরকারের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে একই ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি যাতে পরিহার করা যায় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে। সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমূহ পর্যালোচনার জন্য সরকার নগর বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করবে। এই টাস্ক ফোর্স থেকে একটি সুপারিশমূলক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এটি করা হলে তা সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে আইনি বাধ্যবাধকতার আওতায় চলে আসবে। নগরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদত্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসনের মাত্রা এবং অর্থায়নের প্রকৃতি এই আইনেও স্পষ্টীকরণ করা হবে। নগর এলজিআই বরাবরে প্রদত্ত আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রাও হবে এই আইনের একটি অংশ এবং এতে নগর এলজিআই'গুলোর নিকট জাতীয় সম্পদ হস্তান্তর সহ তাদের কর আদায়ের দায়িত্ব দান ও সরকারি ঋণ গ্রহণ কর্তৃত্বের ভিত্তি কী, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হবে।

১১.৪ নগর অর্থায়ন কৌশল অভিমুখে

১১.৪.১ নগর অর্থায়ন ব্যবস্থার সংস্কার

নগর অবকাঠামোর জন্য আর্থিক চাহিদার পরিমাণ বিশাল, শুধুমাত্র জাতীয় সরকারের সম্পদ হস্তান্তরের ভিত্তিতে এই বিপুল আর্থিক চাহিদা মেটানো প্রায় অসম্ভব। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এই ধরনের নির্দেশনা রাখে যে, নগর অর্থায়ন কৌশলের জন্য প্রয়োজন হবে কর, সেবার বিনিময়ে আদায়কৃত মাশুল, সম্ভাব্য হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়িত্বশীল ঋণগ্রহণ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

কর সংস্কার ও ফিস: এমনকি জাতীয় পর্যায়েও যেহেতু বর্তমানে কর প্রশাসনিক সক্ষমতা সাধারণভাবে দুর্বল, সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে কর আদায়ের দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তবে স্থানীয় সরকারগুলোর একটি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের উৎস হলো সম্পত্তি কর। যা আরো ভালোভাবে ব্যবহার করা উচিত। সম্পত্তি কর ভালোভাবে উন্নীত করা হলে এবং নগর সরকারগুলো এ ব্যাপারে আরো অভিজ্ঞ হবার পর নগরের আয়কর সহ অন্যান্য বিকল্প রাজস্ব আদায়ের বিষয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

- প্রথম পর্যায়ে সম্পত্তি করের উৎকর্ষ সাধনের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে। সঠিকভাবে বিন্যস্ত সম্পত্তি কর থেকে জিডিপির ১.০- ১.৫ শতাংশ সমপরিমাণের রাজস্ব কর সংগ্রহ সম্ভব, যা অর্জিত হলে নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে উল্লম্ফন সংঘটিত হবে। বর্তমানে এই উৎস থেকে জিডিপির মাত্র ০.১৬ শতাংশ আহরিত হয়।
- সম্পত্তি করের একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্থানীয় সরকারগুলোর সহায়তার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

- সম্প্রতি সেবা ফিস ও চার্জ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও এর পরিমাণ জিডিপির মাত্র ০.১৪ শতাংশ । উন্নত সেবা দিয়ে স্থানীয় সরকারগুলো এই উৎস হতে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে যা ২০২০ এর জিডিপির ০.৫ শতাংশ থেকে ২০৩১ সালের জিডিপির ১.০০ শতাংশ সমমানে উন্নীত হতে পারে।
- সম্পত্তি কর এবং সেবা ফিস ও চার্জ একত্র করা হলে নগর সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক স্বায়ত্বশাসন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।
- সময়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত অর্থনীতিগুলোর মতো জাতীয় আয়কর ছাড়াও অতিরিক্ত আয়কর আদায়ের বিষয় বিবেচনায় নেয়া হবে।

সরকারি সম্পদ হস্তান্তর ব্যবস্থার সংস্কার: সম্পদ হস্তান্তরে অধিকতর স্বচ্ছতা ও প্রক্ষেপণযোগ্যতার জন্য সরকারি হস্তান্তর ব্যবস্থা সংস্কার করা হবে। সকল হস্তান্তর অবশ্যই নির্দিষ্ট দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। স্থিতিশীলতা ও প্রক্ষেপণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে একটি আইনগত কাঠামোর মধ্যে হস্তান্তর ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

- আইনগত কাঠামোতে বিধৃত দায়িত্ব ও সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে জাতীয় মন্ত্রণালয় ও এলজিআই'গুলো দ্বারা সম্পাদিত ব্যয়ের মধ্যে উন্নত ভারসাম্য গড়ে তোলা হবে।
- হস্তান্তর ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর মূল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, প্রাপ্ত দান ও অর্জন সংশ্লিষ্ট উপাদান। যে নগরগুলোতে জনসংখ্যার অংশ বড়, দারিদ্র্য হার বেশি, স্থানীয় কর সমাবেশের বিকল্প ব্যবস্থা দুর্বল সেখানে বড় ধরনের অনুদান মঞ্জুরি দেয়া হবে। এই সমদর্শী নীতির ফলে খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহীর মতো পেছনে থাকা নগরগুলোতে প্রবৃদ্ধি গতিশীল হয়ে উঠবে।
- নগরগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য ন্যায্যতা ও প্রণোদনাকে একত্র করে একটি দ্বিপাক্ষিক হস্তান্তর ব্যবস্থা ব্যবহৃত হবে। এভাবে যে নগরগুলো উদ্ভাবনমুখী এবং সেবা বিতরণের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ যত্নবান, কেবল সেগুলোই হবে জাতীয় সরকারের বিশেষ প্রণোদনা তহবিল হতে সুবিধা লাভের দাবিদার।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য নিরসন সংশ্লিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য বিকাশের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ-উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য তহবিল আলাদাভাবে সংরক্ষিত হবে।

নগর সরকার প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থার সংস্কার: ঋণ কখনো ঝুঁকিমুক্ত বিকল্প নয়, এজন্য প্রয়োজন হয় ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ সক্ষমতার প্রতি বিশেষ মনোযোগসহ সতর্ক ব্যবস্থাপনা।

- বর্তমানে সকল প্রকার হস্তান্তর (অনুদান বা ঋণ) আসে জাতীয় বাজেট হতে। নগর সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বল অর্থায়ন ও সক্ষমতা ঘাটতির কারণে অন্তবর্তীকালীন সময়ে এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
- সময়ের সাথে, নগর সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার পর ঋণ-সেবা সামর্থ্যের দিক থেকে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ও সক্ষম তাদের জন্য ঋণ গ্রহণের বিকল্প সুবিধা দান করা হবে।
- সাধারণভাবে, সংশ্লিষ্ট এলজিআই এর ঋণ-সেবা সক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুগঠিত উচ্চ-মুনাফার সম্ভাবনাযুক্ত প্রকল্পের ভিত্তিতে দায়িত্বশীলতার সাথে ঋণের অর্থায়ন সম্পন্ন হওয়া উচিত। এ ধরনের ঋণ গ্রহণে অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন না করলেও বিশ্বাসযোগ্য নগর সরকার প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুরূপ ঋণ গ্রহণে এই বন্ডগুলোর বিপরীতে করমুক্ত সুবিধাসহ সহায়তা দান করতে পারে।
- নগর সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণগ্রহণ কৌশল জাতীয় ঋণ ব্যবস্থাপনার সাথে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গতিশীল হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় এ ধরনের ঋণ কর্মসূচির পরিবীক্ষণ করবে এবং জাতীয় ঋণ কৌশলের পূর্ণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৫ নগর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংস্কার

একটি উচ্চ-আয় দেশের উপযোগী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিন্যাসের মূল অংশ হিসেবে বিকেন্দ্রীকৃত ও স্বায়ত্বশাসিত নগর সরকারের প্রয়োজনীয়তার ওপর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। কৌশলগত ও নীতিগত দিক হতে প্রশ্ন হলো, কতো তাড়াতাড়ি এই রূপান্তর কাজ শুরু করা যায় এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজ এগিয়ে নেবার জন্য গৃহীত প্রচেষ্টাকে সংহত ও অব্যাহত রাখা যায়।

১১.৬ নগর সংস্কার কৌশল

নগর ব্যবস্থাপনা সংস্কারের সকল কৌশলের জন্য প্রয়োজন ত্রি-মুখী কর্মপদ্ধতির সমন্বয় : (১) উন্নততর সেবায় অংশীদারি শক্তিশালী করার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভূমিকা পুর্নসংজ্ঞায়ন; (২) সরকারি নগর সেবার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং (৩) একটি জবাবদিহিতামূলক নগর সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১১.৬.১ সরকারি-বেসরকারি ভূমিকা ও অংশীদারিতা

বিশ্বের মেগা সিটিগুলোতে সেবা সুবিধা প্রদানে সক্ষমতায় ঘাটতি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অনেক নগরীতেই দেখা গেছে তারা তাদের ভূমিকায় পরিবর্তন এনে শুধুমাত্র মৌলিক সেবাসমূহ যেগুলো মুখ্যত সরকারি পণ্য বিতরণ করছে এবং বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তৎপরতা সামলানোর দায়িত্বভার নিয়েছে বেসরকারি খাত। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বাংলাদেশের জন্যও একই নীতি অনুসরণ করা হবে। টেলিযোগযোগ, পরিবহন, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার বিতরণে ইতোমধ্যেই প্রাণবন্ত বেসরকারি খাতের উত্থান হয়েছে। মৌলিক শিক্ষা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওগুলোর মধ্যেও শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে। তবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সেবা যেমন- বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এখনো সরকার নিয়ন্ত্রিত। তবে তা মিশ্র পরিকৃতি, দুর্বল অর্থায়ন ও সীমিত বিনিয়োগসহ মূল নগর সেবার ক্ষেত্রেও (যেমন গৃহায়ণ, পরিবহন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) প্রযোজ্য। বেসরকারি খাতে গৃহায়ণ বাজার সাধারণভাবে উদ্দীপনামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক হলেও তা জমির উচ্চ মূল্য, দীর্ঘমেয়াদি গৃহায়ণ ঋণের অপর্যাপ্ততা, অদক্ষ ভূমি বাজার ও অন্যান্য প্রবর্তনমূলক সমস্যায় আকীর্ণ।

বাংলাদেশে গৃহায়ণ সমস্যার বিশালতার প্রেক্ষাপটে গৃহায়ণ বাজারের দ্রুত সংস্কার আবশ্যক। এতে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে বেসরকারি খাতকে। সরকারের পক্ষ থেকে এতে সমর্থন দানের জন্য ভূমি বাজার পরিচালনার উন্নতি, দীর্ঘমেয়াদি বন্ধক শিল্প গঠনে সহায়তা, নগর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বল্পমূল্যে আবাসন সুবিধা সরবরাহের অনুকূলে কর সুবিধা/ভর্তুকি দিয়ে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভূমি বাজার সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ভূমি রেকর্ডের ডিজিটায়ন, ভূমি নিবন্ধন ও ভূমি হস্তান্তরের আর্থিক ব্যয় কমিয়ে আনাসহ ভূমি হস্তান্তর সহজীকরণ। দক্ষ নগর পরিবহন ব্যবস্থা নগর কেন্দ্রসমূহের বিকেন্দ্রীভবনে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে এবং উপশহর অঞ্চলগুলোকে আবাসন সুবিধার উপযোগী করে তুলতে পারে। সরকার গৃহায়ণ সমস্যা লঘু করতে সরকারের খাস জমিতে স্বল্পমূল্য আবাসন নির্মাণের জন্য অনুমোদন দিতে পারে এবং এই ধরনের আবাসনের জন্য স্থান ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ শিথিল করতে পারে।

শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো এমন একটি গৃহায়ণ-অর্থায়ন কর্মসূচি যা তুলনামূলকভাবে নিম্ন সুদ হারে ঋণ সুবিধার নমনীয় উৎস। এই সুবিধা তৈরির অনুকূলে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হতে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হবে। উচ্চ-আয় দেশগুলোতে বিনিয়োগে নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে গৃহায়ণ-অর্থায়ন সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যবস্থা এবং এ কারণে সেখানে স্বল্প-মূল্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পর্যাপ্ত ও প্রতিযোগিতামূলক। এছাড়াও, গৃহায়ণ বন্ধকের জন্য সেখানে একটি মাধ্যমিক বাজারও রয়েছে, যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থায়ন ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকে।

গৃহ সুদ পরিশোধের জন্য কর মওকুফ, প্রাথমিক আবাসন বিক্রয় হতে প্রাপ্ত মুনাফার ওপর স্বল্প করারোপ এবং স্বল্পমূল্য আবাসনের জন্য মূলধন/সুদে ভর্তুকি দানের মতো আর্থিক প্রণোদনা সুবিধা দান করা যেতে পারে। পরিশেষে, নতুন প্রযুক্তি ও পরিবশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে স্বল্পমূল্য আবাসন সুবিধা নির্মাণের জন্য প্রণোদনা সৃষ্টির অনুকূলে নীতিগত সমর্থন দান করা হবে। বাংলাদেশে পুরকৌশলসহ স্থাপত্য প্রকৌশলে অনেক মেধাবী ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাকৃতিক জলবায়ু ও বিপর্যয় ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন স্বল্পব্যয়ী আবাসনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নতুন ডিজাইন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা সহায়তা প্রদান করা হবে। ভারতে "২০২০ এর মধ্যে সকলের জন্য আবাসন উদ্যোগ"-এর প্রেক্ষাপটে সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা চলমান রয়েছে[১৯]। এই অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ দিক-নির্দেশনা লাভ করবে।

পরিবহন প্রসঙ্গে, সরকারি খাত হতে সড়ক নেটওয়ার্কের অবকাঠামোগত সেবা সুবিধা প্রদান করা হলেও, পরিবহন সেবা সীমিত সংখ্যক সরকারি বাস সেবাসহ প্রধানত বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরগুলোর জন্য উপযুক্ত গণ-চলাচল (মাস ট্র্যানজিট) সুবিধার অভাব একটি মারাত্মক সমস্যা। বেসরকারি বাসের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সড়ক সুবিধা, দুর্বল ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সেবা ও নিরাপত্তা মান সংশ্লিষ্ট দুর্বল বিধি-বিধান নিম্ন মানের সেবাদানে অবদান রাখে। বাসগুলোর অতিমাত্রায় ভিড় রীতিমতো বিস্ময়কর, যা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক উদ্বেগ সৃষ্টি করে। দেশকে অগ্রগতির সোপানে

১৯ ভারত সরকার ২০১৫ তে "২০২২ এর মধ্যে সকলের জন্য আবাসন" উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এগিয়ে নিতে, সকল বড় নগরীগুলোর জন্য মাস ট্র্যানজিট সিস্টেম স্থাপনের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এর কাজ শুরু হয়েছে। ট্র্যাফিক সংকেত, ট্র্যাফিক আইনের কঠোর প্রয়োগ, পার্কিং এর বিধিনিষেধ সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং ভিড়যুক্ত ট্র্যাফিক করিডোর ব্যবহারের মাধ্যমে সময় সংশ্লিষ্ট নগর ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপক উন্নতি করা হবে। বাস / ট্যাক্সি সেবা প্রদানকারীদের কর সুবিধা দিয়ে এবং বেসরকারি পরিবহনের মান ও আসন সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে নিরাপত্তা মান উন্নয়নসহ বেসরকারি পরিবহন বিকল্পের বেসরকারি সরবরাহ বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন সেবার জন্য বেসরকারি খাতই হলো সেবার একমাত্র উৎস। ওয়াটার অ্যান্ড পয়ঃনিষ্কাশন অথরিটিজ (ওয়াসা) নামে স্বায়ত্বশাসিত সেবা সংস্থা শুধু তিনটি প্রধান নগরী-ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় রয়েছে। এই তিনটি সংস্থা থেকে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ করা হয়। তবে শুধুমাত্র ঢাকা ওয়াসা সীমিত পরিসরে আধুনিক স্যুয়ারেজ সেবা দিয়ে থাকে। অন্যান্য নগরগুলোতে পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন থেকে পাইপবাহিত পানি সরবরাহ করা হয়। নগর অঞ্চলে বাণিজ্যিক কর্মসূচি হিসেবে বেসরকারি পর্যায়ে পানি ব্যবসার সুবিধা অনুপস্থিত। যে এলাকাগুলোতে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পানি সরবরাহ করা হয় না বা যেখানে এই সরবরাহ নির্ভরযোগ্য নয়, সেখানে ব্যক্তি উদ্যোগে মোটর পাম্পের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং হস্তচালিত নলকূপই পানি সরবরাহের সাধারণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঢাকাসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ নগর কেন্দ্রগুলোতে আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন সিস্টেম, অনুপস্থিত। মানববর্জ্যের বেশিরভাগ ভূ-গর্ভস্থ "পিট" অথবা স্থানান্তরযোগ্য আধারে গিয়ে সঞ্চিত হয়। এগুলো পরিষ্কার করার জন্য বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের সহায়তা নেয়া হয়। আবর্জনা অপসারণের কাজ প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের / পৌরসভা থেকে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোন সংগঠিত বেসরকারি সেবা বিতরণ নেই। যে এলাকাগুলোতে বেসরকারি সেবা বিতরণ হয় না, সেখানে ছোট আকারে ও অনানুষ্ঠানিকভাবে অথবা চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে অতিরিক্ত সামষ্টিক উদ্যোগ হিসেবে আবর্জনা অপসারণে বেসরকারি সেবার প্রচলন আছে।

পানি ও স্যানিটেশন সমস্যা সমাধানে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশল হলো সরকারি সেবা দ্রুত বিস্তারের পাশপাশি বেসরকারি সরবরাহকেও উৎসাহিত করা। এটি করা হবে সঠিক নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও যথোপযুক্ত ব্যয় পুনর্ভরণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সরকারি বর্জ্য/ পয়ঃনিষ্কাশন শোধন সুবিধার সাথে সমন্বয় এবং বর্জ্য/ পয়ঃনিষ্কাশন নিক্ষেপণের জন্য উপযুক্ত বিধি-বিধান স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক।

১১.৬.২ সরকারি নগর সেবা সংস্থা শক্তিশালী করা

পানি সরবরাহ ও কঠিন বর্জ্য অপসারণে বেসরকারি অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। তবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে সকল নগরেই পর্যাপ্ত সংখ্যক আধুনিক স্যুয়েজ সুবিধা স্থাপনের ওপর। পয়ঃনিষ্কাশন ও কঠিন বর্জ্য'র অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার জন্য পানি দূষণের ফলে যে প্রকট স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্ট হবে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এ সমস্যার মোকাবেলা করা হবে। পয়ঃনিষ্কাশন নিক্ষেপণ ও এর যথাযথ শোধন জনকল্যাণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এটি সরকারি খাতের দ্বারাই ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে। সকল পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ওয়াসার মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে, যা পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নিক্ষেপণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। বর্তমান ওয়াসাগুলোকে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যেখানে তারা সেবা দিয়ে থাকে। নগর সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও তাদের আওতাভুক্ত আবাসিকদের সেবা সংস্থাগুলোর সেবা বিতরণ সক্ষমতাসহ আর্থিক কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় পুনর্ভরণ নীতিমালা শক্তিশালী করা হবে।

পয়ঃনিষ্কাশন ও কঠিন বর্জ্যের যথাযথ নিক্ষেপণের জন্য প্রয়োজন আধুনিক বর্জ্যশোধন সুবিধা। এই ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অগ্রগতি অসামান্য এবং বাংলাদেশ এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। বর্জ্য নিক্ষেপণ প্রণালী ও মানের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং নগর সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

নগর পরিবহনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে দক্ষ মাস ট্র্যানজিট সিস্টেম স্থাপন। এটি ভূ-গর্ভস্থ রেল সিস্টেম বা নগরের ভূ-উপরিস্থ দ্রুতগতি রেলের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হবে। এই উচ্চ-অগ্রাধিকারযুক্ত নগর বিনিয়োগ কাজ দ্রুত শুরু হবে ঢাকায় এবং পরবর্তীতে তা আটটি বিভাগীয় নগরীতে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হবে। যেহেতু এগুলো উচ্চ পুঁজিঘন উদ্যোগ, তাই এর অর্থায়ন আসবে এডিপি থেকে অথবা পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমে। তবে, এগুলোর টেকসইযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সকল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের পুনর্ভরণকল্পে সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধের নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

১১.৬.৩ একটি জবাবদিহিমূলক নগর সরকার অভিমুখে

সংস্কার কৌশলের তৃতীয় ও সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ পদক্ষেপ হলো উন্নত নগর সরকার। নগর সরকারের কার্যকর পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল বাধাগুলো অপসারণ হবে সংস্কার কৌশলের উদ্দিষ্ট: অস্পষ্ট ম্যান্ডেট ও সেবা দায়িত্ব; জবাবদিহিতার অভাব; দুর্বল আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন; দুর্বল সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ সেবা সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি; এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনা। বস্তুত, মূল কাজগুলো সম্পাদনের দায়িত্ব হবে নগর সরকারের এবং নগর সরকারই এই কাজগুলো দক্ষ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এভাবে দুই-ধাপ বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব বিন্যস্ত করে কৌশলগত উপায়ে যৌথভাবে জাতীয় ও নগর সরকার এই দায়িত্ব সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কাজ, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ। এতে নগর সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং জাতীয় বাজেট থেকে মঞ্জুরি, ব্যবহারকারীদের মাশুল, নগর সরকারের বন্ড ও আওতাভুক্ত করের (প্রধানত সম্পত্তি কর) সঠিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিশদ ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

১১.৭ জাতীয় এজেন্ডার সাথে নগর এজেন্ডার সমন্বয়

বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা এটি নিশ্চিত করবে যে, জাতীয় এজেন্ডা ও নগর এজেন্ডার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এতৎসত্ত্বেও কিছু সাধারণ ক্ষেত্র থাকবে, যেখানে সমন্বয় প্রয়োজন হবে। এগুলোর মাঝে রয়েছে, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য মান নির্ধারণ, পানির গুণগত মান, বায়ুর মান, "জোন" নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিরাপত্তার মান। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে জাতীয় আইন ও বিধিনিষেধ বহাল থাকবে এবং সকল নগরের জন্যও তা বাধ্যতামূলক হবে। তবে এই সকল আইন, বিধিমালা ও নির্ধারিত মান বাস্তবায়নের প্রাক্কালে প্রায়শই উপযুক্ত সংলাপ ও পরামর্শের প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারগুলোতে নগর সরকারের অংশগ্রহণসহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

১১.৮ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ

বর্তমানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নগর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা ও বিনিয়োগে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এই মন্ত্রণালয় থেকে সকল স্থানীয় সরকারকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ওয়াসা'র মতো বড় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ তদারকি করা হয়। প্রস্তাবিত সংস্কারে মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে। নগর সরকারগুলোর নিকট বিকেন্দ্রীভবন সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ও বিনিয়োগ অর্থায়নে মন্ত্রণালয়ের আর কোন ভূমিকাই থাকবে না। ওয়াসা নগর সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। সকল নগরের জন্য, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা হবে নগর সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবে, রাজউক ঢাকা নগর সরকারের একটি অংশ হয়ে পড়বে ।

স্থানীয় সরকারের প্রধান ভূমিকা হবে সার্বিক নগর পরিস্থিতির পরিকল্পনা, অনুমোদিত জাতীয় পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নগর উন্নয়ন সুগম করার অনুকূলে নীতি প্রণয়ন এবং নগর উন্নয়নের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ। মন্ত্রণালয় জাতীয় নগর উন্নয়নে অগ্রাধিকারসহ সংশ্লিষ্ট নগর সংস্কারের সীমানা নির্ধারণ ও পরিকল্পনায় নেতৃত্বদানসহ নগর সরকারের সাথে সমন্বয় ও নিবিড় পরামর্শক্রমে সেগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, তা নগরায়ণের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, উদ্ভূত সমস্যা ও বিষয়াবলি সনাক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট নগর সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অর্থায়নের ব্যাপারে একটি অধিকতর সীমিত তবে কৌশলগত ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। এতে দুই ধরনের তহবিল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে: প্রণোদনামূলক তহবিল ও বিশেষ কর্মসূচি তহবিল। প্রণোদনামূলক তহবিলের উদ্দেশ্য হবে সেবা বিতরণে উদ্ভাবনমূলক তৎপরতা ও ঝুঁকি গ্রহণে বিভিন্ন নগরের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা। বিশেষ কর্মসূচি তহবিল থেকে জাতীয় সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য নগর সরকারকে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ থেকে নগর পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে সঠিক ভূমিকা ও সমন্বয়ের কার্যপ্রণালী বেরিয়ে আসবে। এ ব্যাপারে কোন সর্বজনীন কাঠামো পাওয়া সম্ভব নয়। পরিকল্পনা কাজে বিবর্তনের সূচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং বাস্তবায়ন-সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যথোপযুক্ত সমন্বয়সহ কার্যপ্রণালীর সাথে দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রগুলো পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে জনগণের অংশগ্রহণ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১১.৯ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে নগর খাতে অর্থায়ন চাহিদা ও বিকল্প উৎস

নগর খাতে অর্থায়ন চাহিদা বিশাল। তবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল দ্বারা উপরে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্কার এক্ষেত্রে একটি শক্ত বুনিয়াদ তৈরি করবে।

বর্তমানে, নগর অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রধান উৎস হলো সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। নগর অবকাঠামোতে মোট বিনিয়োগের (আবাসন, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা সেবা) পরিমাণ জিডিপির প্রায় ১.২ শতাংশ। নগর সরকারগুলোর পক্ষে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে তাদের দৈনন্দিন কর্মপরিচালনার অর্থায়নও সম্ভব হয় না এবং নিজস্ব সম্পদ হতে কোন প্রকার বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তও থাকে না। বেসরকারি নগর সেবা প্রধানত আবাসনসহ নগর পরিবহন সেবার (বেসরকারি বাস, ত্রিচক্র সিএনজি ও রিক্সা) সাথে যুক্ত।

আরো দু'টি অর্থায়ন কৌশল প্রয়োজন হবে। এর প্রথমটিতে রয়েছে, বেসরকারি অর্থায়ন এবং দ্বিতীয়টিতে নগর সেবার জন্য একটি শক্তিশালী ব্যয় পুনর্ভরণ কর্মসূচি। তথাপি, নগর খাতে এডিপি বরাদ্দ ২০১৭ তে জিডিপির ১.২ শতাংশ থেকে ২০৩১ এ ২.০ শতাংশে এবং ২০৪১ এ ২.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বৈধভাবে প্রাপ্ত অধিকারের ভিত্তিতে, এই সম্পদের বেশিরভাগ থোক বরাদ্দ আকারে নগর সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। সামান্য অংশ হস্তান্তরিত হবে প্রণোদনামূলক তহবিল আকারে।

১১.১০ নগর সেবায় বেসরকারি উদ্যোগ

বর্তমানে আবাসন সেবার অধিকাংশই আসছে বেসরকারি খাত হতে। এছাড়াও নগর পরিবহন সেবায় বেসকারি খাতের একক প্রাধান্য রয়েছে। ২০১৮ তে বেসরকারি খাতের জন্য বিনিয়োগ প্রাক্কলিত হয় জিডিপির ১.২ শতাংশে। ভবিষ্যতে আধুনিক বাংলাদেশের জন্য নগর খাতের ক্রমবর্ধনশীল সেবা চাহিদা পূরণকল্পে এটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে। বিশেষ করে, নগর সেবার বেসরকারি অর্থায়ন বর্তমানে জিডিপির ১.২ শতাংশ থেকে প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩১ এ জিডিপির প্রায় ২.০ শতাংশে এবং ২০৪১ এ জিডিপির ৩.০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত অর্থায়নের বেশিরভাগই হবে আবাসনে। অন্যান্য যে ক্ষেত্রগুলোতে বেসরকারি প্রাধান্য বহাল থাকবে সেগুলো হলো- নগর পরিবহন, নগরের পানি সরবরাহ এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ।

১১.১১ স্ব-অর্থায়ন ও ব্যয় পুনর্ভরণ

বর্তমানে নগর সরকারগুলোর নিজস্ব সম্পদ হতে নগর অবকাঠামোর স্ব-অর্থায়ন একেবারেই কম। নগর সরকারগুলোর জন্য উপরিবর্ণিত সম্পদ সমাবেশ কৌশল এই অবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। এই প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে ব্যয় পুনর্ভরণের বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়। নগর সরকারের পরিচালন ব্যয়সহ স্থানীয় সড়ক, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পার্ক ও জলাশয় সংরক্ষণের মতো জন-কল্যাণমূলক কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহের অর্থায়ন আসবে স্থানীয় সরকারের কর সম্পদ হতে, অপরপক্ষে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণের মতো সেবার ব্যয় নির্বাহে ব্যয় পুনর্ভরণ তহবিল প্রধান ভূমিকা পালন করবে। ব্যয় পুনর্ভরণ নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য হবে পরিচালনা ও সংরক্ষণ ব্যয়ের শতভাগ পুনরুদ্ধার। দীর্ঘ মেয়াদে ব্যয় পুনর্ভরণের জন্য মূলধন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ পুনরুদ্ধারও যুক্ত করা হবে। স্ব-অর্থায়ন ব্যবস্থা উন্নত হলে নগর সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সীমিত আকারে ঋণ গ্রহণও করতে পারে।

সারণি ১১.২: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে নগর খাতের অর্থায়ন চাহিদা ও বিকল্প

অর্থায়ন উৎস / বিকল্প	২০২০	২০৩১	২০৪১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (মোট দেশজ আয়ের %)	১.৫	২.০	২.৫
স্ব-অর্থায়ন: ব্যয় পুনর্ভরণ (মোট দেশজ আয়ের %)	০.৩	১.০	১.৫
বেসরকারি বিনিয়োগ (মোট দেশজ আয়ের %)	১.৫	২.০	৩.০
মোট বিনিয়োগ (মোট দেশজ আয়ের %)	৩.৩	৫.০	৭.০
মোট বিনিয়োগ (২০১৭ এর মূল্যে বিলিয়ন টাকা)	৮০৬	৩০১০	১০৪৩৭

উৎস: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রক্ষেপণ

অধ্যায় ১২

একটি গতিশীল প্রাণবন্ত ব-দ্বীপে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি বিনির্মাণ এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন

একটি গতিশীল প্রাণবন্ত ব-দ্বীপে টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি বিনির্মাণ এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন

১২.১ প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা একটি সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যা হলো, বৈশ্বিক তথা জাতীয় পর্যায়ের সমৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তব হুমকি। নগর-রাষ্ট্র হংকং ও সিঙ্গাপুর এবং ২০ লাখের কম জনসংখ্যার কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ অর্থনীতি বাদে নদ-নদীসহ মোট ১৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ১৭ কোটি জনসংখ্যাসহ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ জন নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। দেশের ব-দ্বীপ গঠনসহ এর নদ-নদীর বিন্যাস ও জলবায় পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির দিক থেকে বিশ্বের ১৭১টি দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। প্রশান্ত মহাসাগরের দু'টি ক্ষুদ্র দ্বীপ অর্থনীতিকে (টোঙ্গা ও ভানুয়াটু) বাদ দিলে, ফিলিপাইন ও গুয়াতেমালার পরে বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ দেশ হিসেবে তৃতীয় অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশ।

জোয়ারের স্ফীতি, লবণাক্ততা, বন্যা, নদী ভাঙন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের নিয়মিত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই দেশের খাদ্য নিরাপত্তাসহ গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জীবিকার জন্য ক্রমাগত সমস্যা তৈরি করে চলেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ক্রমবর্ধনশীল ঝুঁকির ফলে উপকূলীয় বেষ্টনীর একটি বিশাল এলাকা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবার যে আশঙ্কা তীব্র হয়ে উঠেছে, তার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যাপক সংখ্যক অধিবাসীকে এ অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত হতে হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোতে উজানের মিঠা পানির প্রবাহ শুষ্ক হবার ফলে কৃষি কাজের জন্য এবং মিঠা পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মৌসুমি বৃষ্টিপাত বেড়ে যাচ্ছে, ফলে ঘটছে নদীতে দুকূল-প্লাবী প্রবাহ ও ঘন ঘন বন্যা; এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধি নানাবিধ স্বাস্থ্যগত সমস্যা তীব্র করার পাশাপাশি কৃষির ফলনেও মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত কোন কোন অংশে ভূগর্ভস্থ পানি অতি-উত্তোলনের ফলে ভূ-উপরিস্থ অ্যাকুইফার মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক এলাকায় সেচ-কৃষির জন্য পানি ঘাটতির সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। ভূগর্ভস্থ পানির অতি-আহরণ ও অপর্যাপ্ত পুনর্ভরণের কারণে নগরাঞ্চলের বহু অংশেই পানি স্তর অনেক গভীরে নেমে গেছে। পানি সরবরাহের বহু উৎস আর্সেনিক দূষণের মারাত্মক শিকার। সামনের দিনগুলোতে নগরাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমপ্রসারমান শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতার জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। সমন্বিতভাবে এই অরক্ষিত অবস্থার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সমাধান না করা গেলে খাদ্য নিরাপত্তা, প্রবৃদ্ধির উদ্দীপনা এবং দারিদ্র্য নিরাময় প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখোমুখী হতে হবে।

এই চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি ব-দ্বীপ সম্ভাবনাও অসামান্য। বাংলাদেশের মাটি ও পানির মিশ্রণ একে পরিণত করেছে এক উচ্চমানের উর্বর ভূমিতে, যেখানে বহুবিধ ফসল চাষের অনন্য সুযোগ রয়েছে। নদী পথে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোসহ প্রায় সকল জেলা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। অভ্যন্তরীণ নৌপথ সার্বিকভাবে দেশের যাত্রী ও মালামাল চলাচলে পরিবেশবান্ধব ও স্বল্পব্যয় পরিবহন বিকল্প হিসেবে সুবিধা দিয়ে থাকে, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য। নদ-নদী, মিঠা পানির জলাভূমি, খাল-বিলের অঢেল প্রাচুর্য মৎস্যসম্পদের জন্য অবাধ সম্ভাবনায় ভরা। অতি সম্প্রতি ক্রমবর্ধনশীল ব্যবসা ও বাণিজ্যিক তৎপরতা হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত সমুদ্রের সম্ভাবনা বর্ধিত হারে কাজে লাগাচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ মৎস্য সম্পদের প্রধান উৎসে পরিণত হচ্ছে । সুনীল অর্থনীতির পরিপূর্ণ সুফল এখনো অনাহরিত রয়েছে।

এই সকল ভৌগোলিক অবস্থার নিরিখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর অধীনে একগুচ্ছ আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা ও কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার মোকাবেলায় একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ চালু করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ উপলব্ধি করে যে, এই সমস্যাগুলোকে উন্নয়ন কৌশলের সাথে সঠিকভাবে একীভূত না করা হলে উন্নয়নের স্থায়িত্ব হুমকির মুখে পড়বে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর আওতায় জাহাজ শিল্প, সমুদ্রবন্দর সেবা ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ওপর প্রাধান্য প্রদানসহ সুনীল অর্থনীতির সুফল কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়।

১২.২ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল নীতিমালা বাস্তবায়নে অগ্রগতি

শক্তিশালী পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয়। এর ফলাফল চরিত্রগতভাবে দীর্ঘমেয়াদি এবং একটি সীমিত সংখ্যক নির্দেশকের ভিত্তিতে এর সঠিক অগ্রগতি পরিমাপ করাও বেশ কঠিন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে, আন্তর্জাতিক অগ্রগতির নিরিখে ও বাংলাদেশের উন্নয়ন চাহিদার দিক থেকে পরিবেশগত অবস্থার অগ্রগতির একটি বিশদ পর্যালোচনা কর্মসূচি গৃহীত হয় [২০]। এই বিশ্লেষণে একটি মিশ্র অবস্থার ছবি পাওয়া যায়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তার মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় নিয়মবদ্ধভাবে পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনকে একীভূত করে এবং পরিবেশগত সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি ও কৌশল চিহ্নিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি বৈশ্বিক উৎসাহ এবং বাংলাদেশে এর ঝুঁকির বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি প্রণেতাদের ধারণাকে নাড়া দিতে সমর্থ হয় এবং এখন এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাকে সমাধানের জন্য বিবেচনায় নিয়ে আসতে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল বৈশ্বিক আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বৈশ্বিক কর্ম-পরিকল্পনায় স্বাক্ষরদাতা দেশ।

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিগত বছরগুলোতে অনেক আইন ও বিধিমালা পাস হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাব প্রশমন তথা অভিযোজনের জন্য কর্মসূচি ও নীতিমালাও গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বায়ু ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দানসহ এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। আইনগত কাঠামো ছাড়াও ইট ভাটা থেকে বায়ু দূষণ ব্যবস্থাপনাসহ চামড়া শিল্প থেকে পানি দূষণ হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সাথে বাস্তবায়নের উদ্দিষ্ট আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবুও, বিদ্যমান পরিবেশগত আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধানের সার্বিক বাস্তবায়ন এখনো একটি বড় সমস্যা। মুখ্য ভূমিকা পালনকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ঘাটতি ও অপর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ বাস্তবায়নের অগ্রগতিকে সীমিত করেছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক তুলনায় দেখা যায়, বায়ু মানের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। একইভাবে, প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য সুরক্ষা তথা বনাঞ্চল আবরণীর দিক থেকে বাংলাদেশ তার সমশ্রেণীভুক্ত দেশগুলোর শেষের দিকে রয়েছে। সামগ্রিক পরিবেশগত পরিস্থিতি নির্দেশকে ১৮০টি দেশের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে নিম্ন পর্যায়ে ৫% এ অবস্থান নির্দিষ্ট করেছে।

কৌশল ও নীতির ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার জন্ম সূচিত হয় ২০১৮ এর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঘটনাসহ দেশের ব-দ্বীপ গঠন দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য এটি একটি সমন্বিত কৌশল। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ নিরসনে হবে একটি প্রধান উপকরণ এবং একই সাথে তা দারিদ্র্য নিরাময়সহ টেকসই উন্নয়ন সম্ভাবনার ব্যাপক উন্নতি সাধন করবে।

জলবায়ু প্রশমন উদ্যোগে গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে নিম্ন কার্বন উন্নয়ন পথপরিক্রমা অনুসরণের আকাঙ্খা বাংলাদেশ তার "অভীপ্সিত জাতীয়ভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবদান (এনডিসি)"-তে প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, পরিবহন ও শিল্প খাতে ১২ মেগাটন সমতুল্য কার্বন ডাই অক্সাইড বা উক্ত খাতসমূহের স্বাভাবিক অবস্থা হতে ৫% কমাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাংলাদেশ তিন খাতে আরও অতিরিক্ত ২৪ মেগাটন সমতুল্য কার্বন ডাই অক্সাইড বা স্বাভাবিক অবস্থা হতে ১০% কমাতে প্রতিজ্ঞা করেছে।

জলবায়ু অভিযোজন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রদূত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অরক্ষিত কমানোর উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সামগ্রিক জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত। উক্ত অভিযোজন পরিকল্পনা প্রাসঙ্গিক নতুন ও অন্যান্য বিদ্যমান নীতি, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে বিশেষত বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, কৌশলের সাথে সুসঙ্গতভাবে একীভূত করা হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগে সাড়া দান তৎপরতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহতভাবে উন্নত হয়, যা সুপরিচালিত আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহত ও প্রাণহানির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস প্রাপ্তিতে প্রতিফলিত হয়। সরকার কর্তৃক ২০১২ তে নতুন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থাপন, একই বছরে জাতীয় দুর্যোগ আইন ২০১২ পাস এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-১৫) বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে এই অগ্রগতি অর্জিত হয়। এই সকল গুরুত্ববহ কৌশলগত

২০ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যালন পর্যবেক্ষণ: জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন,ঢাকা।

ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পরিবর্তন সূচিত হয়, যা ত্রাণ বিতরণের স্থলে দুর্যোগ-প্রস্তুতির ওপর অধিক গুরুত্ব স্থাপন করে। এতৎসত্ত্বেও, বিশেষ করে বন্যা ও নদী ভাঙন থেকে অব্যাহতভাবে শস্যের ফলন, বসত ভিটা, সহায় সম্পদ ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এই প্রয়োজনীয়তা সামনে নিয়ে আসে যে, দুর্যোগ-প্রস্তুতিতে শক্তিশালী করার অব্যাহত প্রচেষ্টা ছাড়াও সরকারকে পানি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ করে পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির উন্নততর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দিতে হবে।

১২.৩ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও একটি জলবায়ু সহিষ্ণু ব-দ্বীপ জাতির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ রূপকল্প

পরিবেশগত অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের উচ্চমূল্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি জলবায়ু সহিষ্ণু ও পরিবেশগতভাবে সুস্থ দেশে রূপান্তরিত করা আবশ্যক। উত্তম কর্মপদ্ধতির বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য-আয় দেশের মর্যাদায় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয় অর্থনীতির দিকে অভিযাত্রাকে সুগম করতে এবং সহিষ্ণুতা বিনির্মাণে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপাদানগুলোকে প্রবৃদ্ধি কৌশল ও দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের সাথে একীভূত করা হবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ২০৪১ এ হবেঃ

- জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশের বসবাস নগরাঞ্চলগুলোতে এবং জীবনযাত্রার যে মান তারা ভোগ করবে তা আজকের উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে পরিদৃষ্ট মানের সঙ্গে তুলনীয়।
- ইকোলজি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনসংখ্যার চাহিদার মধ্যে এখানে একটি চমৎকার ভারসাম্য বজায় থাকবে। বিশেষ করে, ভূমির উৎপাদনশীলতা সুরক্ষিত, বন সম্পদ সংরক্ষিত ও সুসমৃদ্ধ, জীববৈচিত্র্য উন্নত এবং প্লাবন বা পানি ঘাটতি প্রতিরোধের জন্য পানিসম্পদ সুব্যবস্থিত হবে।
- উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্ন বায়ুসহ নগরগুলো স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত থাকবে।
- চরম দারিদ্র্যের অবসান, বস্তির বিলুপ্তি এবং প্রতিটি খানা একটি ন্যূনতম মৌলিক আবাসন মানসম্পন্ন হবে।
- যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনে দ্রুত ও সর্বাত্মকভাবে মোকাবেলা করার জন্য দেশ পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে।
- পরিবেশগত প্রশাসন এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যেখানে প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির চমৎকার মিশ্রণ ঘটবে; এরই ধারাবাহিকতায় দূষণকারীদের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি এবং পরিবেশগত নীতি ও কর্মসূচির বিকেন্দ্রীকৃত বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

১২.৪ মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

এই রূপকল্পকে অগ্রগতির পরিবীক্ষণযোগ্য নির্দেশকে রূপান্তরের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যমাত্রা সারণি **১২.১** এ প্রদর্শিত হলো। উচ্চ-আয় দেশগুলোতে পরিদৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এই উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সামনের দিনগুলোতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলির ব্যাপ্তি ও বিশালতা সারণি **১২.১** এর লক্ষ্যমাত্রায় প্রদর্শিত। অতীত সমস্যাবলি পুঞ্জীভবনের ফলাফল আংশিকভাবে এই অবস্থার জন্য দায়ী। তবে, পরিবেশগত সমস্যাবলি মোকাবেলার সক্ষমতাই ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করা সহ উচ্চ-আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সক্ষমতা নির্ধারণ করবে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এজেন্ডা ও উচ্চ-আয় এজেন্ডা পরস্পরের হাতে হাত রেখে সামনে এগিয়ে যাবে।

সারণি ১২.১: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য মূল উদ্দেশ্যাবলি ও লক্ষ্যমাত্রা

উদ্দেশ্যাবলি / লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮ ভিত্তিবর্ষের মান	২০৪১ অভীষ্ট মান
মোট জনসংখ্যায় নগরবাসী জনসংখ্যার অংশ (%)	৩০	৮০
ট্যাপের পানি সংযোগসহ নগরের খানা (%)	৪০	১০০
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ নগরের খানা (%)	৪২	১০০
নিরাপদ বর্জ্য অপসারণ সংযোজনসহ নগরের খানা (%)	পাওয়া যায় নি	১০০
কলের পানি সংযোগসহ গ্রামীণ খানা (%)	০	৫০
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গ্রামীণ খানা (%)	০	৫০
নিরাপদ বর্জ্য অপসারণ সংযোগসহ গ্রামীণ খানা (%)	০	১০০
চরম দারিদ্র্য (%)	২৪	<৩

উদ্দেশ্যাবলি / লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮ ভিত্তিবর্ষের মান	২০৪১ অভীষ্ট মান
বস্তিতে বসবাসকারী জনসংখ্যা (%)	৫৫	০
বর্জ্য পানি শোধন সুবিধাসহ নগর কেন্দ্র (%)	পাওয়া যায় নি	১০০
মোট দেশজ আয়ের অংশ হিসাবে পরিবেশগত ব্যয় (%)	১	৩.৫
মোট দেশজ আয়ের অংশ হিসাবে পরিবেশ সমন্বয়কারী সত্তার ব্যয় (%)	০.০০৫	০.৫
দূষণকারীদের কাছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি বাস্তবায়ন (ঘটনার %)	০	১০০
কার্বন ট্যাক্স (জ্বালানি মূল্যের %)	০	১৫
ঢাকাসহ প্রধান সিটিগুলোতে সবুজ অঞ্চল (বর্গ কি.মি./প্রতি মিলিয়ন জন)	পাওয়া যায় নি	৫-১২
দুর্যোগ প্রস্তুতি (%)	পাওয়া যায় নি	১০০
পানির গুণাগত মান সাথে নগর পানি সম্পদের অনুবর্তিতা (%)	০	১০০
বায়ুর মান (বার্ষিক গড়)	৮৬	১০
উপযুক্ত নিষ্কাশন সুবিধাসহ বন্যা মুক্ত সিটি'র শতাংশ	০	১০০
ভূমি ক্ষয়ের শতাংশ (%)	১৮	৫
বন আচ্ছাদিত এলাকা (ভূমির %)	১৫	২০
অভয়ারণ্য ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং	নিচের ৫%	শীর্ষ ৩০%
পরিবেশগত পরিকৃতি সূচক, আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং	নিচের ৫%	শীর্ষ ৩০%

উৎস: প্রেক্ষিত পারিকল্পনা ২০৪১ প্রক্ষেপণ। (ভিত্তি বর্ষের মানে সর্বশেষ প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহৃত)

১২.৫ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহিষ্ণুতার জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল

বস্তুত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কৌশলের মূল উদ্দিষ্ট হবে প্রবৃদ্ধি কৌশলে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিবেচনাসমূহ অঙ্গীভূত করা। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বাংলাদেশে গ্রহণ করা হবে একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল। সুনির্দিষ্ট কৌশল, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার তৎপরতায় অন্তর্ভুক্ত হবে:

১২.৫.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবেশগত ব্যয় অঙ্গীভূত করা

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যায়ে, পরিবেশগত সুরক্ষাকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রবৃদ্ধি কৌশলে প্রাধান্য প্রদান করা হবে। ২০৪১ সালের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি দৃশ্যকল্পে পরিবেশগত অবক্ষয়ের ক্ষতি স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং নীতি দৃশ্যকল্পে ক্ষতি পুষিয়ে নেবার ব্যবস্থাদি অঙ্গীভূত হবে।

১২.৫.২ জলবায়ু পরিবর্তনের অরক্ষণশীলতা হ্রাস ও সহিষ্ণুতা বিনির্মাণকল্পে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বিডিপি ২১০০) বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসংখ্যার অরক্ষিত অবস্থা হ্রাস করা। বিডিপি ২১০০ তে অন্তর্ভুক্ত প্রধান নীতিমালা, বিনিয়োগ কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যদি যথাযথভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে তা ভিত্তিমূলে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি অরক্ষিত অবস্থা উৎসে সমাধানসহ জনগণের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনবে এবং সহিষ্ণুতা বিনির্মাণে অর্থবহ অবদান রাখবে।

উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে: পোল্ডার ব্যবস্থাপনার দ্রুত উন্নতি; হাওর অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি; গঙ্গা নদীর বাঁধ প্রকল্প; ব্রহ্মপুত্র নদ বাঁধ প্রকল্প; গোরাই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প; নদী খনন ও নদী শাসন প্রকল্প; এবং প্রধান প্রধান লেকের (প্রধান প্রধান হাওর, বাঁওড় ও বিল) বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য সংরক্ষণ প্রকল্প। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো অরক্ষণশীলতার মূল উৎসসমূহে আমূল পরিবর্তন সূচিত করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে হাওর অঞ্চলসহ সমতল ভূমিতে উন্নততর বন্যা নিয়ন্ত্রণ; নদী ও বৃষ্টিপাত-ভিত্তিক ভূ-উপরিস্থ মিঠা পানির উন্নততর প্রাপ্তব্যতা; নদী প্লাবনসহ নদীর পাড় ভাঙনের উন্নততর নিয়ন্ত্রণ; লবণাক্ততা হ্রাসসহ সমুদ্রের পানি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ; সমুদ্র হতে পানি অনুপ্রবেশের ফলে সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ; এবং বিভিন্ন খালবিল ও জলাশয় সুরক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণি ও উদ্ভিদ জাত, পাখিদের প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য সুরক্ষা করা।

গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে পানিসম্পদে সরকারি ব্যয় এখনকার জিডিপি'র ০.৮% থেকে বৃদ্ধি করে ২০২০ এ জিডিপি'র ২% এ উন্নীত করা; পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় বর্তমানের অতি সামান্য পরিমাণ থেকে ২০২০ এ জিডিপি'র অন্তত্পক্ষে ০.৫% এ বৃদ্ধি করা; স্যানিটেশন, নদী খনন, নৌপরিবহন, ও পানি সরবরাহে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে (পিপিপি) উৎসাহিত করতে প্রণোদনা প্রদান; উজানের পানির উন্নততর ও অধিকতর ন্যায্য হিস্যা আদায় বিষয়ে ভারতের সাথে আলোচনা জোরদার করা এবং এই লক্ষ্যে বহুমুখী সুফল প্রদায়ী যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করা, যেখানে পানির হিস্যা আদায় ফলাফল শূন্য হবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারমূলক প্রধান পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে: ব-দ্বীপ আইন, ব-দ্বীপ অনুবিভাগ ও ব-দ্বীপ তহবিলের প্রবর্তন, যা পানি ও পানি-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাজেট, প্রকল্প নির্বাচন, গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সুবিধা প্রদান করবে; এবং স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবহারকারী সমিতি গঠন, যার প্রাথমিক দায়িত্ব হবে সকল স্থানীয় পর্যায়ের পানি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং এগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়ভার বহন। সকল স্থানীয় পানি প্রকল্পসহ এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপকারভোগী কর্তৃক ব্যয়ভার বহন করার নীতি প্রবর্তন করা হবে, যাতে কালের ধারায় পানিসম্পদসহ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রধানত উপকার ভোক্তাদের অর্থায়নে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে পরিচালিত হয়, ফলে তা হবে পুরোপরি টেকসই ব্যবস্থা।

১২.৫.৩ বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাস

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক নীতি পরিচালনায় বাংলাদেশে দু'টি নীতি গ্রহণ করা হবে: (১) উপকারভোগী কর্তৃক ব্যয় পরিশোধ নীতি, এবং (২) দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণের নীতি। পরিচ্ছন্ন বায়ু ও বিশুদ্ধ পানি অংশত সীমিত সরবরাহের কারণে, সেই সাথে ব্যবহারকারীদের দ্বারা অব্যাহতভাবে অপব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে দিন দিন দুর্লভ পরিবেশগত সেবা হয়ে উঠছে। বায়ু ও পানির দূষণ হ্রাসের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পরিশোধের নীতি প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে যে সকল সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হবে, সেগুলো নিম্নরূপ:

জ্বালানি ভর্তুকির অপসারণ: জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি সংস্কার জলবায়ু পরিবর্তন নীতি ও লক্ষ্যের জন্য সহায়ক। "অভীপ্সিত জাতীয়ভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবদান" (আইএনডিসি) বাস্তবায়ন প্যাকেজের অংশ হিসেবে এটি অভিহিত হতে পারে, কেননা ভর্তুকি সংস্কার একদিকে যেমন কার্বন নিঃসরণ কমাবে, তেমনি অপরদিকে তা টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থায় বিনিয়োগের জন্য সম্পদ অবমুক্ত করবে।

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর "সবুজ কর" প্রবর্তন: প্রবৃদ্ধি কৌশলে পরিবেশগত বিবেচনাসমূহের একাঙ্গীভবনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর সবুজ কর (কার্বন ট্যাক্স) ধার্য করা একটি দারুন রকমের সহায়ক নীতি হবে; কেননা এটি শুধু কার্বন (সিওটু) নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করবে না, সেই সাথে রাজস্ব সম্পদের এক আকর্ষণীয় উৎস তৈরি হবে, যা পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও অন্যান্য পরিবেশগত কর্মসূচিতে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানিতে সবুজ কর দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পরিশোধ নীতিরও একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ ২০২০ বর্ষ থেকে কার্বন ট্যাক্স বাস্তবায়ন চালু করবে।

শিল্প কারখানা হতে নিঃসরণের ওপর কর আরোপ: ইট তৈরির ভাটা থেকে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নীতিমালা প্রবর্তন করেছে। অন্যান্য দূষণকারী শিল্প কারখানা থেকে নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্যও নীতিমালা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বায়ুর গুণগত মান পরিমাপের মানদণ্ডনির্ধারণ করেছে, তবে উপযুক্ত পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি ও তথ্যভান্ডারের অভাবে শিল্প কারখানা হতে নিঃসরণের পরিবীক্ষণ করা কঠিন। তথ্য ও পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতি সুবিধা তৈরি হবার সাথে সাথেই বায়ু দূষণ কর ব্যবস্থা চালু করা হবে, যা পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি গ্রহণে শিল্পপতিদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করবে।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিদূষণ রোধ: এ কথা মানতেই হবে যে, বাংলাদেশে সব চাইতে তীব্র ও জটিল পরিবেশগত সমস্যাবলির মধ্যে অন্যতম হলো মানব ও শিল্প বর্জ্যের অপরিকল্পিত অপসারণের কারণে সংঘটিত পানি দূষণ। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধানের পাশাপাশি দূষণকারীর নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি প্রয়োগ করা হবে, যা ভূ-পৃষ্ঠের পানিসম্পদে শিল্প, বাণিজ্য ও খানাসমূহের বর্জ্যের অবৈধ নিক্ষেপণের বিরুদ্ধে একটি প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করবে। একই সাথে, ভূ-পৃষ্ঠের পানি পরিচ্ছন্ন অভিযান চালুর জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে উন্মুক্ত জলাশয়ে মিশ্রিত

হবার পূর্বে অবশ্যই ড্রেইনেজ ও পয়ঃনিষ্কাশন পানি শোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ। শতভাগ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এনজিওসমূহের অংশীদারিত্বে বিভিন্ন মুদ্রণ ও ভিডিও মাধ্যম ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে অভিযান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের জন্য শিক্ষা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১২.৫.৪ বন সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত অর্থবহ ও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। গোরাই নদীর পুনরুদ্ধার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা সুন্দরবন ম্যাংগ্রোভ বনাঞ্চলে একদিকে যেমন মিঠা পানির সরবরাহ পুনরুদ্ধার করবে, তেমনি অপরদিকে লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধ করবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে জাহাজের টুকরা স্তূপীকরণসহ জাহাজ হতে উপচে-পড়া তেলের ব্যবস্থা করা। উপচানো তেলের দূষণ এবং শব্দ দূষণ থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে এবং বন্যপ্রাণি নিধনের ঝুঁকি কমাতে "বিশেষ পরিবীক্ষণ ও রিপোটিং টুলস" (স্মার্ট) কার্যক্রম সুন্দরবনের সর্বত্র অব্যাহত থাকবে। করিডর মডেলিং-এর মাধ্যমে একটি সোপান-ধর্মী পদ্ধতি বাস্তবায়ন দ্বারা সকল সংরক্ষিত এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বন্যপ্রাণি অবাধ চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাস্তুসংস্থানগত করিডর স্থাপন করা হবে। অন্যত্র পুনর্বাসনের মাধ্যমে সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে জনবসতি কমিয়ে এনে বন্য প্রাণিকুলের স্বাভাবিক আবাসের খণ্ডীকরণ ও অবৈধ অনুপ্রবেশ যথাসম্ভব হ্রাস করা হবে। ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের জন্য এই বিষয়টিতে প্রাধান্য প্রদান গুরুত্বপূর্ণ এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সকল অবস্থা ও ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণসহ একটি পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

নীতির দিক থেকে যাই হোক, উচ্চ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক চাপের কারণে বন এলাকার সম্প্রসারণ করা এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষ নিবারণ করা সবচেয়ে বড় সমস্যা। বনাঞ্চলের নিকটবর্তী বিশেষ করে সুন্দরবন ম্যাংগ্রোভ বন, শালবন এলাকা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকা নিশ্চিত করাও আংশিক সমস্যা বটে। তবে জনবল ঘাটতির কারণে বন বিভাগের বিদ্যমান মানবসম্পদ-সক্ষমতা দ্বারা বন সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাও কম বড় সমস্যা নয়। বনভূমি ও বনসম্পদ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ করে বন বিভাগকে শক্তিশালী করা হবে। বনভূমি ও বনসম্পদ রক্ষার জন্য প্রচলিত আইনের জরিমানার বিধান বৃদ্ধি করে আইন ভঙ্গ রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় লোকজনকে সরাসরি বড় আকারে বন ব্যবস্থাপনায় জড়িত করা হবে। উপযুক্ত ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতির চারায় নানা ধরনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের সরকারি বনভূমি বৃক্ষছায়া তলে নিয়ে আসা হবে। সদ্য অধিকৃত চরভূমিসহ সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। কাঠের অপচয় কমাতে এবং কাষ্ঠ-বর্জ্যের পুনঃব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য কাষ্ঠভিত্তিক শিল্পকে আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করা হবে। বিভিন্ন এনজিও এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক গ্রুপের অংশীদারিত্বে বনের ওপর নির্ভরশীল গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ বিকাশের কৌশলের পাশাপাশি সকল বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ আইন, বিধিমালা ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নসহ বন সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য বন বিভাগের সক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শক্তিশালী করা হবে। ফ্যাক্টরি গেটে "লগিং ট্যাক্স" আরোপের বিষয়ও বিবেচনায় রাখা হবে। প্রাকৃতিক বন থেকে বনজ পণ্য আহরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে। অবৈধভাবে গাছ কাটাসহ বন সংশ্লিষ্ট সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের অর্থদণ্ডসহ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় রেড+ (বন নিধন ও বন অবক্ষয় থেকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস) কৌশল (২০১৬-২০৩০) এ জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক কনভেনশনের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কৌশলে দেখানো হয়েছে কীভাবে বনের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে হয়, কোথায় সংরক্ষণ করা দরকার এবং বনের আওতা বাড়ানো দরকার। বাংলাদেশ জাতীয় রেড+ কৌশল (২০১৬-২০৩০) বন খাতের একটি বিশদ কৌশল, এতে সন্নিবেশিত হয়েছে বন নিধন ও বন অবক্ষয় থেকে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা হ্রাসের পাশাপাশি দেশে বনজ কার্বন মওজুদ বৃদ্ধির নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা। এই কৌশল সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

১২.৫.৫ পরিবেশগত প্রতিষ্ঠানসহ পরিবেশগত সমন্বয় শক্তিশালী করা

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এজেন্ডার উচ্চ গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে, সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং অর্থ, পরিকল্পনা, পরিবেশ ও বন, ভূমি, কৃষি, পানি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, আইন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, শিল্প ও পরিবহন মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধিবর্গ সমন্বয়ে একটি জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনইএমসি) গঠন করা হবে। এই কাউন্সিলের প্রধান কাজ

হবে উন্নয়ন এজেন্ডায় পরিবেশগত উৎকণ্ঠার সঠিক সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বন অধিদপ্তর এই কাউন্সিলে সাচিবিক সেবা প্রদান করবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় শক্তিশালী করা: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে এই মন্ত্রণালয় যাতে তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেজন্য এর সক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে শক্তিশালী করা হবে। সক্ষমতা বিনির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪১ এ জিডিপি'র ০.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এখানে কারিগরিভাবে দক্ষ পেশাজীবীসহ উন্নততর জনবলের সমাবেশ ঘটানো হবে, একটি তথ্য ভাণ্ডারের ভিত্তিতে পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদকৃত হবে এবং একটি শক্তিশালী ডিজিটাল "ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিস" (এমআইএস) স্থাপন করা হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বেসরকারি খাত, এনজিও, গবেষণা কমিউনিটির সাথে বাধ্যবাধকতা পরিবীক্ষণ ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনাসহ উপাত্ত সংগ্রহ ও নীতি গবেষণার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে। নীতি বাস্তবায়ন ও বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতি উন্নত করতে গণশুনানি ও অংশগ্রহণমূলক নীতি উন্নয়নসহ অংশীজনের সঙ্গে নিয়মিত মতামত বিনিময় করা হবে। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে, প্রতি দু'বছর অন্তর "বাংলাদেশের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত প্রতিবেদন" প্রণয়ন করা হবে, যেখানে মাইলফলক স্পর্শের জন্য কর্মপরিকল্পনাসহ পরিবেশের অবস্থা ও অগ্রগতির সর্বশেষ তথ্যাবলি সন্নিবেশিত হবে। এই প্রতিবেদন বিভিন্ন অংশীজনের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটেও অন্তর্ভুক্ত হবে। একটি জলবায়ু তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে এবং পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাত ও সরকারি সংস্থাসমূহের সাহায্যের জন্য এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণায় সহায়তা দানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে সকলের ব্যবহারের সুবিধার্থে ওয়েব-সাইটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরিবেশগত সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়িত্বের যুক্তিযুক্ত বিভাজন কী ভাবে করা যায় তদ্বিষয়ে বাংলাদেশ উত্তম কর্মপদ্ধতি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের পরিবেশগত সংস্থাসমূহের মধ্যে সাংঘর্ষিক সম্ভাবনা পরিহারসহ সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে, একটি আনুষ্ঠানিক সমন্বয়মূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণমূলক কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনসহ সকল স্থানীয় বিষয়ে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করবে।

পরিকল্পনা ও বাজেটে পরিবেশগত বিবেচনায় প্রাধান্য প্রদান: বাজেট ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজন সবুজ হিসাবরক্ষণ, সংগ্রহণ ও নিরীক্ষণের দিক হতে সবুজ সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা। প্রকল্প বাছাইয়ের সময় সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত অবক্ষয়ের পূর্ণ হিসাব গ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। ইতোমধ্যেই পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছে। এটিকে মূলধারায় নিয়ে এসে শক্তিশালী করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ উপলব্ধি করে যে, সবুজ সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অঙ্গীভবনের এজেন্ডা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা এবং এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি দৃঢ় সংকল্প, সম্পদ ও প্রচেষ্টা। এই লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে।

১২.৫.৬ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড শক্তিশালী করা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি, ২০০৯) বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব বাজেট সম্পদ হতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) গঠন করে। এই ফান্ড ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১০ এ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন জারি করা হয়। বিগত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই তহবিলে মোট ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়। এ যাবৎ আনুমানিক ৪০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে মোট ৬২৫টি প্রকল্প গৃহীত হয়, যার মধ্যে অনুরূপ প্রকল্পের প্রায় ২৮২টি ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। এটি বহুসংখ্যক জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন কর্মসূচির পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নে একটি অত্যন্ত সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রশমন কার্যাবলিও গৃহীত হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ সিসিটিএফ এর সাফল্যকে এগিয়ে নেবে এবং উদ্ভাবনমূলক অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচিসমূহের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে এই ফান্ডকে আরো শক্তিশালী করবে। জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুক্তিযুক্তভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা ব্যবহৃত হবে।

১২.৫.৭ একটি সবল পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়ন কৌশল গ্রহণ

প্রবৃদ্ধি কৌশলের সাথে পরিবেশগত সুরক্ষার পূর্ণ অঙ্গীভবন নিশ্চিত করতে প্রাক্কলন অনুযায়ী যে বিনিয়োগ চাহিদা প্রয়োজন হবে তা জিডিপি'র প্রায় ৪.৫%, বর্তমানে যা মাত্র ১%। পরিবেশ বৈশিষ্ট্যগতভাবে যদিও সরাসরি জনকল্যাণমূলক বিষয়, তথাপি একা সরকারি খাতের পক্ষে এর অর্থায়ন সম্ভব হতে পারে না। তাই সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অর্থায়ন বিকল্পের একটি অর্থবহ বিভাজন নিশ্চিত করতে উদ্ভাবনমূলক সমাধান খুঁজে বের করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থায়ন বিকল্পের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে:

বেসরকারি অর্থায়ন বিকল্পসমূহ: পরিবেশের জন্য বেসরকারি অর্থায়ন উদ্দীপ্ত করতে তিনটি প্রধান হাতিয়ার বিদ্যমান। প্রথমত, বেশ কিছু ক্ষেত্রে, যেমন-কাঠ, মৎস্য চাষ, ইকো-পর্যটন, পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বন খাতে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নির্ধারণসহ বেসরকারি সরবরাহ উৎসাহিত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ সুরক্ষায় বেসরকারি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ উৎসাহিত করে এমন আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ব্যবহার করা। উল্লেখযোগ্য উদাহরণের মাঝে রয়েছে শিল্প কারখানায় পরিচ্ছন্ন বায়ু প্রযুক্তির ব্যবহার, শিল্প কারখানা ও হাসপাতালগুলোতে ইটিপি স্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকা সংস্থান সুবিধা দান করে জুম চাষ নিষিদ্ধকরণসহ উপযুক্ত চাষাবাদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করা। তৃতীয়ত, সরকারি খাত বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে অংশীদারিত্বসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একগুচ্ছ পরিবেশগত সেবায় যৌথ অর্থায়ন ব্যবস্থা সূত্রপাত করতে পারে। যেমন- কমিউনিটির সাথে আংশিক ব্যয়ভার বহনের মাধ্যমে এবং বেসরকারি সরবরাহকারীদের সরকারি ভর্তুকি দানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, স্নানসহ বিভিন্ন খানার সামগ্রী পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত গ্রামীণ পুকুরগুলো পরিষ্কার করা, গণ শৌচাগার ও স্নানাগার সুবিধা কর্মসূচিগুলোর সবগুলোই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ সক্রিয়ভাবে এই বিকল্পগুলো অনুসরণ করবে।

সরকারি অর্থায়ন নীতিমালা: পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বর্তমানে পানিসম্পদ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট হতে জিডিপি'র প্রায় ১% বরাদ্দ রাখা হয়। কর থেকে আরো অর্থায়নের জন্য জিডিপি'র ২% এর কাছাকাছি বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। বিশ্বে বাংলাদেশের কর ও মোট দেশজ আয়ের অনুপাত এখন সর্বনিম্ন এবং ২০৪১ অর্থবছরে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে-অতিরিক্ত কর- জিডিপির অনুপাত ৫% বৃদ্ধির বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে তা হতে এই অতিরিক্ত অর্থায়ন সম্ভব হবে। উপকারভোক্তাদের ব্যয় পরিশোধ নীতি (ব্যয় পুনর্ভরণ) ও দূষণকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়ের নীতি (সবুজ কর) প্রয়োগের মাধ্যমে জিডিপির ০.৫% অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন সমাবেশ করা হবে। গ্রিন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) হ্রাসের উপায় হিসেবে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ জলবায়ু পরিবর্তনকে তীব্র করে, কার্বন কর প্রবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লা, ফার্নেস অয়েল, পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিরুৎসাহিত হবে। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে ব্যয় পুনর্ভরণের বিশাল সুযোগ রয়েছে। ওয়াসা ও পৌরসভাগুলোর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা থেকে বর্তমানে ব্যয় পুনর্ভরণ অতি সামান্যই হয়। শুধুমাত্র পরিচালন ব্যয়ের আংশিক পুনর্ভরণের ভিত্তিতে এই ব্যয় পুনর্ভরণ আদায় করা হয়। পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং সেই সাথে নতুন বিনিয়োগের জন্য তহবিল সমাবেশের জন্য এই মূল্য নির্ধারণ নীতি বদলানো হবে। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন মূল্য নির্ধারণ নীতিতে পরিবর্তন এনে ২০২০ এর মধ্যে পূর্ণ পরিচালন ব্যয় পুনর্ভরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১০০% মূলধন ব্যয় পুনর্ভরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সবুজ কর প্রসঙ্গে, বায়ু ও পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পানি দূষণকারী খানাগুলোর ওপর জীবাশ্ম জ্বালানি কর ও দূষণ কর সমন্বয়ে যে পর্যাপ্ত রাজস্ব সম্পদ আহরিত হবে, তা দিয়ে পরিবেশ সুরক্ষাসহ নগরাঞ্চলগুলোর জন্য গণ চলাচল কর্মসূচি যেমন বিআরটি, এলআরটি এবং মেট্রোরেলে অর্থায়ন করা হবে।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) সুবিধা গ্রহণ: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রশমন ও অভিযোজন তৎপরতা উন্নয়নে সহায়তা দিতে জলবায়ু অর্থায়ন সমাবেশের লক্ষ্যে ২০০৯ এ জিসিএফ গঠন করা হয়। প্রাথমিকভাবে জিসিএফ-এ জলবায়ু অর্থায়নের ১০.২ বিলিয়ন ডলার সমাবেশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়; তবে ২০১৬ জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী এর মধ্যে ৫.৯ বিলিয়ন ডলার অনুসমর্থন পায়। ২০১৪ এর প্যারিস চুক্তিতে জিসিএফ পরিচালনার জন্য কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। যোগ্যতার নিরিখে, বাংলাদেশ জিসিএফ থেকে সম্পদ সহায়তা আহরণের জন্য একটি চমৎকার অবস্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হলো জিসিএফ-এর কর্মনির্দেশিকা অনুসরণ করে এই সম্পদ সংগ্রহ করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

জিসিএফ সুবিধায় অভিগম্যতার জন্য কতকগুলো মাপকাঠি ও মানদণ্ডপূরণ করে গ্রহীতা দেশগুলোকে নিজস্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হয়। সঙ্গত কারণেই, দেশগুলোকে তহবিল পরিচালনার জন্য একটি "জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ" (এনডিএ) এবং নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে তহবিল সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন সত্তা (এনআইই), বহুপাক্ষিক বাস্তবায়ন সত্তা (এমআইই) নিয়োগ সম্পন্ন করতে হয়। বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে এনডিএ হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে। এনআইই প্রসঙ্গে, মাত্র দু'টি জাতীয় সত্তা ইডকল ও পিকেএসএফ-কে জিসিএফ এর সাথে অংশ নেয়ার জন্য এনআইই হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। জিসিএফ তহবিল সুবিধা দ্রুত প্রাপ্তির সক্ষমতা বাড়াতে আরো বেশি এনআইই এর অনুকূলে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অন্যান্য বৈশ্বিক তহবিল থেকে সম্পদ সমাবেশ: অন্যান্য বৈশ্বিক কর্মসূচি যেমন অভিযোজন তহবিল, এলডিসিএফ, সিআইএফ, এফআইপি, জিইএফ, আরইডিডি, এনএএমএ প্রভৃতি থেকে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হবে। এ ধরনের অন্যান্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির কার্যাবলি দক্ষভাবে সমন্বয়ের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) একটি দায়িত্বশীল অনুবিভাগ স্থাপন করা হবে।

১২.৬ সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচন

বাংলাদেশের জন্য সমুদ্রে উন্মুক্ত অধিকার বিশাল সুযোগ যা শুধু আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিস্তারই সুগম করে না, সেই সাথে সামুদ্রিক সম্পদের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যেও তার অধিকার প্রশস্ততর হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র-সীমাকে ঘিরে বিরোধ নিষ্পত্তির সাথে আমাদের এলাকাভুক্ত সমুদ্রের অংশ এখন বাংলাদেশে "উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র" রূপে গণ্য হয়ে থাকে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে যথোপযুক্ত নীতিমালা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে টেকসই উপায়ে সুনীল অর্থনীতির যথার্থ সম্ভাবনা উন্মোচনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সাথে যথাক্রমে ২০১২ ও ২০১৪ সালে সমুদ্র-সীমা বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শেষে বাংলাদেশ তার এলাকাভুক্ত সমুদ্রের অংশ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান সমন্বয়ে বঙ্গোপসাগরের ১১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর তার স্বত্বাধিকার লাভ করে। অগভীর মহীসোপান ও সমুদ্রের অংশ যথাক্রমে প্রায় ২০% ও ৩৫% এবং বাকি ৪৫% গভীর সমুদ্র।

সাগর, মহাসাগর ও উপকূলে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালিত কার্যাবলির সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সুনীল অর্থনীতির তৎপরতা। পাশাপাশি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তথা সার্বিক কল্যাণ সমুদ্রের সুরক্ষণে সহায়ক । এতে অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলির মাঝে রয়েছে সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, সমুদ্র ও উপকূলীয় স্থানের যথোপযুক্ত ব্যবহার, সামুদ্রিক পণ্যের ব্যবহার, সামুদ্রিক কর্মতৎপরতার সমর্থনে পণ্য ও সেবা সহায়তা দান এবং সামুদ্রিক পরিবেশের সুরক্ষা। সুনীল অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন হবে এই সকল কার্যাবলির নীতি, নিয়ন্ত্রণ, বিধি, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন কাঠামো বা কাঠামোসমূহের মৌলিক ও সার্বিক পরিবর্তন সাধন এবং বিভিন্ন সামুদ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ।

১২.৭ সুনীল অর্থনীতি ঘিরে সাম্প্রতিক অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সরকার সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন কাজ শুরু করে। সমুদ্র বন্দর খাতের উন্নয়ন শুরু হয়েছে এবং পটুয়াখালীতে (পায়রা সমুদ্র বন্দর) একটি বন্দরের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে; আশা করা যায় ২০২০ এর শেষ প্রান্তে এটি পুরোপুরিভাবে চালু করা যাবে। সামুদ্রিক মৎস্য খাতে বিশেষ করে টেকসই আহরণ ও সংরক্ষণের দিকগুলোতে অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজও গ্রহণ করা হয়েছে। সমুদ্র তলদেশের মৎস্য মজুদের ওপর চাপ কমানো, সমুদ্রতলের জলজ সম্পদের ক্ষয়হ্রাস এবং মধ্যবর্তী পানির মৎস্য আহরণ সুবিধার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক 'বটম-ট্রল'-কে 'মিডওয়াটার-ট্রল'- এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এখন হতে বেশ কয়েক বছর আগে থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মাছের, বিশেষ করে ইলিশ মাছের বাছাই ও প্রজনন সুবিধার জন্য মাছ ধরার ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হচ্ছে। নিয়মিতভাবে মৎস্য মজুদ নিরূপণ কাজ পরিচালনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে একটি জরিপ-জলযান ক্রয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, অচিরেই মজুদ-নিরূপণ জরিপ কাজ শুরু হবে।

বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর অধীনে তিমি, ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, হাঙ্গরসহ অপরাপর সামুদ্রিক প্রজাতির সুরক্ষা দানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' (সমুদ্রের তলবিহীন অংশ) কে দেশের প্রথম সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছে। প্রায় ৬৭২ বর্গমাইল বিস্তৃত (১,৭৩৮ বর্গকিলোমিটার) আয়তন ও ৯০০ এরও বেশি মিটার গভীরতাযুক্ত 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে'র সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় অন্তর্ভুক্ত সাবমেরিন ক্যানিয়নের মাথায় গভীর জলরাশি এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যাংগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন থেকে সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে উপকূলীয় জলধারা। সেট ব্যাগ নেটের মতো মাছ ধরার সরঞ্জামসহ ধ্বংসাত্মক মৎস্য আহরণ পদ্ধতির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনাগত উদ্দেশ্যে মৎস্য আহরণের যানসমূহের সমুদ্রে চলাচল পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যায়ক্রমে এই যানগুলোতে স্যাটেলাইট যোগাযোগ সংযোগসহ 'ভেসেল ট্র্যাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম' (ভিটিএমএস) স্থাপন করা হবে।

পরিবেশ খাতে জীববৈচিত্র্য, সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রজনন ও সংরক্ষণ এবং ম্যাংগ্রোভ পুনরুদ্ধার ও পুনবর্ধনসহ নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিজাতের আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উপকূলীয় ইকো-পরিবেশে কয়েকটি 'পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা' বলবৎ করা হয়েছে। বেশ কয়েক দশক যাবৎ জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সদ্য জেগে ওঠা জমিতে ম্যাংগ্রোভ বনায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক গবেষণার জন্য সম্প্রতি জাতীয় সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এনওআরআই) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, বঙ্গোপসাগরে জলবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জরিপে নেতৃত্বদানসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে চিফ হাইড্রোগ্রাফার মর্যাদার একটি অফিসার পদ তৈরি করা হয়েছে।

সুনীল অর্থনীতির জন্য জ্ঞান ও কৌশল শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বও গড়ে তোলা হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সহযোগিতা এবং সমুদ্রভিত্তিক সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নসহ ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য কর্মপন্থা নিরূপণকল্পে নিবিড়ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ২০১৭ এর জুনে ভারতের সাথে একটি সমঝোতা-স্মারকপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার জন্য চীন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে আলোচনাও এগিয়ে চলেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ এবং এর যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার ২২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এই কমিটির সমন্বয়ক। সম্প্রতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ওপর সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে একটি 'সুনীল অর্থনীতি সেল' স্থাপিত হয়েছে এবং এই সেলে একজন মহাপরিচালকও নিযুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া, সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা উন্মোচনের পথে বেশ কিছু অন্তরায় আছে যেগুলোর আশু সমাধান প্রয়োজন। এগুলো হলো: বিনিয়োগের অভাব; বেসরকারি খাতের ভূমিকায় অপর্যাপ্ততা; সামুদ্রিক সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ ও জ্ঞানের অভাব; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় উন্নয়ন নীতি কাঠামোর অনুপস্থিতি; এবং মানব সম্পদের অভাব। সুনীল অর্থনীতির বিকাশকে অবারিত করার জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশলে এই সমস্যাবলির সমাধান করা হবে।

১২.৮ সুনীল অর্থনীতির জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কৌশল

এই কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

- সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা আহরণের জন্য একটি সবল নীতিকাঠামো গঠন করা প্রয়োজন। এই কাজ সম্পাদনের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। 'সামুদ্রিক ও উপকূলীয় উন্নয়নের জন্য নীতি কাঠামো' শিরোনামে এই খসড়া নীতিকাঠামো অনুমোদনের জন্য ২০২০ এর জুন মাসে মন্ত্রিপরিষদের নিকট পেশ করা হবে।
- সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নকল্পে বিনিয়োগের বেশির ভাগই আসবে বেসরকারি খাত থেকে। নীতিকাঠামোর সুপারিশের ভিত্তিতে সুনীল অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য যথোপযুক্ত প্রণোদনা ও

নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ আনয়নের জন্য এফডিআই-এর ভূমিকা বিস্তৃত করা হবে। ক্ষুদ্র ঐতিহ্যগত মৎস্যজীবীদের জন্য সামুদ্রিক সম্পদে পূর্ণ অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সমুদ্রে মাছ ধরার বংশপরম্পরাগত নৌকার বিশাল বহরগুলোর জন্য একটি পরিবীক্ষণ, নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ব্যয়সাশ্রয়ী ও ঝামেলামুক্ত নিবন্ধন ও অনুমতিপত্র সংগ্রহ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও সামুদ্রিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে ক্ষুদ্র ঐতিহ্যগত মৎস্যজীবী সমবায় গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করা সহ বিভিন্ন সুবিধা দানেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- সামুদ্রিক সম্পদের পরিমাণগত ধারণা ও জ্ঞানের ঘাটতি পূরণের জন্য একটি দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করা হবে। দেশজ ক্ষেত্রে, নেভি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি সহায়তা নিয়ে সমুদ্রে জরিপকাজ পরিচালনার অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এ ধরনের কাজে দক্ষতা সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নিকট হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা থেকে জ্ঞান ও সম্পদ সমাবেশ উভয়ই সমৃদ্ধ হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে সুনীল অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও যৌথ বিনিয়োগ অবারিত করতে ভারত, চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে চলমান উদ্যোগসমূহ বেগবান করা হবে।

- সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কয়েকটি উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত সময়-নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাঝে রয়েছে: ২০২০ এর মধ্যে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে যেমন চকোরিয়া সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ইকোসিস্টেমের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; ২০২০ এর মধ্যে, সামুদ্রিক মাছের মজুদ নির্ধারণসহ নিবিড় মাঠ অনুসন্ধানপূর্বক সর্বোচ্চ টেকসই ফলন (এমএসওয়াই) নিরূপণের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের জন্য টেকসই ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্য অর্জন; ২০২৫ এর মধ্যে বাংলাদেশে সামুদ্রিক বর্জ্য অপসারণসহ ভোগ্য পণ্য ও অন্যান্য শিল্প বর্জ্য দ্বারা মাইক্রো-প্লাস্টিক দূষণ এবং জাহাজ-নিঃসৃত পানি ও ক্ষতিকারক জলজ প্রজাতি সংঘটিত জাহাজভিত্তিক দূষণ হ্রাস পরিবীক্ষণ ও জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন সম্পন্ন করা।

- সুনীল অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষ কর্মী প্রয়োজন যাদের মধ্যে রয়েছে দক্ষ উপকূলীয় ও অফ-শোর প্রকৌশলী, নাবিক, বাণিজ্যিক নাবিক, মৎস্য প্রযুক্তিবিদ, জৈবপ্রযুক্তিবিদ এবং সামুদ্রিক সম্পদ জরিপকারী। বাংলাদেশের ১৮টি সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে জাহাজবাহিত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা গেলে সমুদ্র ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট কর্মসুযোগ সৃষ্টির অপরিমেয় সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক গবেষণার জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ সামুদ্রিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিওআরআই) স্থাপিত হয়েছে। প্রধান প্রধান জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আলোচনাক্রমে নাবিক, মৎস্য প্রযুক্তিবিদ, জৈবপ্রযুক্তিবিদ ও সামুদ্রিক সম্পদ জরিপকারীদের প্রাধান্য প্রদান করে অধিকতর অগ্রগতির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

- বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে সামুদ্রিক-উদ্ভিদ (সী-উইড) এর সম্ভাবনা আহরণের ওপর। এটি মানব খাদ্য, ঔষধ, সার ও জৈব সার এবং শিল্পে ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং এর বহুমুখী ব্যবহারও রয়েছে। তাছাড়া এর ভালো রপ্তানি সম্ভাবনাও রয়েছে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ইতোমধ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদ চাষ বিস্তারের জন্য অধিকতর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

- দীর্ঘমেয়াদে মাছের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যেমন: সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' ঘিরে ঘোষিত এলাকার অনুরূপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত অঞ্চল স্থাপন; প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণ; আন্তর্জাতিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে অংশগ্রহণ; দক্ষ বর্জ্য হ্রাস ব্যবস্থা ও কলাকৌশল প্রবর্ধন এবং গবেষণা ও সমীক্ষণ শক্তিশালীকরণ।

- বেশ কিছু কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করে উপকূলীয় পর্যটন শিল্পের বিকাশ করা হবে, যেমন: কিছু দিন পর পর দেশজ ও আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রচারণা পরিচালনা করা; প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যৌথ উপকূলীয় পর্যটন কর্মসূচি গড়ে তোলা; সকল মৌসুমের উপযোগী পর্যটন নৌকার বহর উন্নয়ন; ডলফিন ও সামুদ্রিক তিমি দেখার ভ্রমণ প্যাকেজ প্রবর্তন; কর্পোরেট ও সরকারি অফিসগুলোতে ভালো পরিকৃতি অর্জনকারীদের পুরস্কার / প্রণোদনা হিসেবে পর্যটনকে জনপ্রিয় করা; পর্যটনের অংশ হিসেবে ইকো-পর্যটন বিকাশ; পর্যটন-ব্যবস্থাপক/পরিচালক ও আয়োজকদের কর-প্রণোদনাসহ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান; এবং পেশাগতভাবে দক্ষ পর্যটন গাইড তৈরি।
- পরিশেষে, দূরবর্তী সমুদ্র অঞ্চলে খনন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্বালানির একটি উৎস হিসেবে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে যুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

রচনাপঞ্জি

Ahmed, S. (2017). Evidence Based Policy Making in Bangladesh: Selected Case Studies. Policy Research Institue, Dhaka.

General Economics Division. (2017). Bangldesh Delta Plan 2100., Bangladesh Planning Commision, Government of Bangladesh, Dhaka.

General Economics Division (2011). 6th Five Year Plan. Bangladesh Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka.

General Economics Division (2015). 7th Five Year Plan. Bangladesh Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka.

General Economics Division (2018). Final Assessment Review of the Sixth FYP. Bangladesh Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka.

General Economics Division (2018). The Final Implementation Review of the 6th Five Year Plan. Bangladesh Planning Commission, Government of Bangladesh, Dhaka.

Global Trade Review (GTR) (2015). Global Trade Review Plus, London.

Government of Bangladesh (2011). National Skill Development Policy. Bangladesh Ministry of Labour and Employment, Dhaka.

Government of Bangladesh (2017). Action Plan : Bangladesh Education and Technology Sector. Cabinet Division & General Economics Division, Dhaka.

International Labour Organization (2015). Improving working conditions in the ready made garment industry: Progress and achievements, Dhaka.

International Monetary Fund (2018). World Economic Outlook Report, Washington DC.

Jahan, S. (2018). Developing Transportation and Quality Infrastructure to Support Sustained Rapid Growth and Economic Transportation . General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Dhaka

Mansur, A. (2018). Power Sector Strategy for the Perspective Plan. General Economic Division, Bangladesh Planning Commission, Dhaka.

North, D. C. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives, 97-112.

Osmani, S. (2017). Eradicating Poverty and Minimizing Inequality for Ensuring Shared Prosperity in Bangladesh. General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Dhaka.

Rüßmann, M. L. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, The Boston Consulting Group.

Subramanian & Kessler. (2013). The Hyperglobalization of Trade and Its Future. Global Citizen Foundation.

Spence, M. (2015). The rise of emerging economies is again upending global trade flows—and altering the very notion of value. (J. Manyika, Interviewer) McKinsey & Company.

World Bank (2007). Global Economic Prospects, Washington DC

World Bank (2012). Bangladesh: Towards Accelerated, Inclusive and Sustainable Growth—Opportunities and Challenges, Dhaka.

World Bank (2018). World Wide Governance Indicator, Washington DC.

World Trade Organization (2017). World Trade Statistical Review, Geneva.

ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি'র তালিকা

এই দলিল প্রণয়নে ৬টি ভলিউমে প্রকাশিত ১৬টি স্টাডি ব্যবহৃত হয়েছে

1. Good governance, democratization, decentralization of power and capacity building for institutions compatible with a transforming economy.
2. Employment and labor market policies for a maturing economy.
3. 21st century Trade and Industry strategy for sustained rapid growth and job creation.
4. Reducing cost of doing business to spur domestic and foreign investment.
5. Sustainable power and energy strategy for meeting the demands of a high growing economy.
6. Evolving Pattern of global trade in goods and services and world market integration.
7. Strategies for a paradigm shift in agriculture, aquaculture, animal husbandry and forestry for food security and nutrition.
8. Education, skills and human development for Vision 2041.
9. Science, technology, ICT and information highway for a rapidly transformational economy.
10. Health and population management for sustained human development.
11. Empowerment of children, women and youth to strengthen social inclusion and support shared prosperity.
12. Developing transportation and quality infrastructure to support sustained rapid growth (roads and highways, ports, railways, aviation and water transport).
13. Addressing climate change, green growth environment and water resources for sustaining shared prosperity.
14. Addressing climate change, green growth environment and water resources for sustaining shared prosperity.
15. Service sector development to support high growth in a transforming economy.
16. Eradicating poverty and minimizing income inequality for ensuring shared prosperity.

২০০৯ থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

1	Policy Study on Financing Growth and Poverty Reduction: Policy Challenges and Options in Bangladesh (May 2009).
2	Policy Study on Responding to the Millennium Development Challenge Through Private Sectors Involvement in Bangladesh (May 2009).
3	Policy Study on The Probable Impacts of Climate Change on Poverty and Economic Growth and the Options of Coping with Adverse Effect of Climate Change in Bangladesh (May 2009).
4	Steps Towards Change: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (Revised) FY 2009 -11 (December 2009).
5	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2009 (2009).
6	Millennium Development Goals: Needs Assessment and Costing 2009-2015 Bangladesh (July 2009).
7	এমডিজি কর্ম-পরিকল্পনা (৫১টি উপজেলা) (জানুয়ারি-জুন ২০১০)।
8	MDG Action Plan (51 Upazillas) (January 2011).
9	MDG Financing Strategy for Bangladesh (April 2011).
10	SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2011 (August 2011).
11	Background Papers of the Sixth Five Year Plan (Volume 1-4) (September 2011).
12	6^{th} Five Year Plan (FY 2011-FY 2015) (December 2011).
13	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2011 (February 2012).
14	Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021: Making Vision 2021 a Reality (April 2012).
15	Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review (October 2012).
16	Development of Results Framework for Private Sectors Development in Bangladesh (2012).
17	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) বাংলা অনুবাদ (অক্টোবর ২০১২)।
18	Climate Fiscal Framework (October 2012).
19	Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh CPEIR 2012.
20	First Implementation Review of the Sixth Five year Plan -2012 (January 2013).
21	বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৩)।
22	National Sustainable Development Strategy (2010-2021) (May 2013).
23	জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) [মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত] (মে ২০১৩)।
24	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2012 (June 2013).
25	Post 2015 Development Agenda: Bangladesh Proposal to UN (June 2013).
26	National Policy Dialogue on Population Dynamics, Demographic Dividend, Ageing Population & Capacity Building of GED [UNFPA Supported GED Project Output1] (December 2013).
27	Capacity Building Strategy for Climate Mainstreaming: A Strategy for Public Sector Planning Professionals (2013).
28	Revealing Changes: An Impact Assessment of Training on Poverty-Environment Climate-Disaster Nexus (January 2014).
29	Towards Resilient Development: Scope for Mainstreaming Poverty, Environment, Climate Change and Disaster in Development Projects (January 2014).
30	An Indicator Framework for Inclusive and Resilient Development (January 2014).
27	Capacity Building Strategy for Climate Mainstreaming: A Strategy for Public Sector Planning Professionals (2013).

28	Revealing Changes: An Impact Assessment of Training on Poverty-Environment Climate-Disaster Nexus (January 2014).
29	Towards Resilient Development: Scope for Mainstreaming Poverty, Environment, Climate Change and Disaster in Development Projects (January 2014).
30	An Indicator Framework for Inclusive and Resilient Development (January 2014).
31	Manual of Instructions for Preparation of Development Project Proposal/Performa Part-1 & Part 2 (March 2014).
32	SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2013 (June 2014).
33	The Mid Term-Implementation Review of the Sixth Five Year Plan 2014 (July 2014).
34	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2013 (August 2014).
35	Population Management Issues: Monograph-2 (March 2015).
36	GED Policy Papers and Manuals (Volume 1-4) (June 2015).
37	National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh (July 2015).
38	MDGs to Sustainable Development Transforming our World: SDG Agenda for Global Action (2015-2030)- A Brief for Bangladesh Delegation UNGA 70th Session, 2015 (September 2015)
39	7th Five Year Plan (2015/16-2019/20) (December 2015).
40	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০ (ইংরেজি থেকে বাংলা অনূদিত) (অক্টোবর ২০১৬)।
41	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (অক্টোবর ২০১৬)।
42	Population Management Issues: Monograph-3 (March 2016).
43	Bangladesh ICPD 1994-2014 Country Report (March 2016).
44	Policy Coherence: Mainstreaming SDGs into National Plan and Implementation (Prepared for Bangladesh Delegation to 71st UNGA session, 2016) (September 2016).
45	Millennium Development Goals: End- period Stocktaking and Final Evaluation Report (2000-2015) (September 2016).
46	A Handbook on Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) (September 2016).
47	Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (January 2017).
48	Environment and Climate Change Policy Gap Analysis in Haor Areas (February 2017).
49	Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (February 2017).
50	Banking ATLAS (February 2017).
51	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত) (এপ্রিল ২০১৭)।
52	EXPLORING THE EVIDENCE : Background Research Papers for Preparing the National Social Security Strategy of Bangladesh (June 2017).
53	Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017 : Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world, (June 2017).
54	SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective (June 2017).
55	A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (June 2017).
56	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 01: Macro Economic Management & Poverty Issues (June 2017).
57	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 02: Socio-Economic Issues (June 2017).
58	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 03: Infrastructure, Manufacturing & Service Sector (June 2017).

59	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 04: Agriculture, Water & Climate Change (June 2017).
60	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 05: Governance, Gender & Urban Development (June 2017).
61	Education Sector Strategy and Actions for Implementation of the 7th Five Year Plan (FY2016-20).
62	GED Policy Study: Effective Use of Human Resources for Inclusive Economic Growth and Income Distribution-An Application of National Transfer Accounts (February 2018).
63	Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (March 2018).
64	National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the implementation of Sustainable Development Goals (June 2018).
65	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 1: Water Resources Management (June 2018).
66	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 2: Disaster and Environmental Management (June 2018).
67	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 3: Land use and Infrastructure Development (June 2018).
68	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 4: Agriculture, Food Security and Nutrition (June 2018).
69	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 5: Socio-economic Aspects of the Bangladesh (June 2018).
70	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 6: Governance and Institutional Development(June 2018).
71	Journey with SDGs, Bangladesh is Marching Forward (Prepared for 73rd UNGA Session 2018) (September 2018)
72	এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৮)।
73	Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 1: Strategy (October 2018).
74	Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 2: Investment Plan (October 2018).
75	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ) (অক্টোবর ২০১৮).
76	Bangladesh Delta Plan 2100: Bangladesh in the 21st Century (Abridged Version) (October 2018).
77	Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018).
78	Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018).
79	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টঃ বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ (ইংরেজি থেকে অনূদিত) (এপ্রিল ২০১৯)।
80	Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh (May 2019).
81	Implementation Review of the Sixth Five Year Plan (FY 2011-FY 2015) and its Attainments (May 2019).
82	Mid-term Implementation Review of the Seventh Five Year Plan (FY 2016-FY 2020) May 2019.
83	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-1 June 2019 .
84	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-2 June 2019.
85	Empowering people: ensuring inclusiveness and equality For Bangladesh Delegation to HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2019 (July, 2019).
86	Implementation Review of the perspective plan 2010-2021 (September 2019).

87	Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 74th UNGA session 2019) (September 2019).
88.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)।
89	Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG Targets in Bangladesh (Global Partnership in Attainment of the SDGs) (September 2019).
90	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-3 October 2019.
91	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-4 October 2019.
92	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-5 October 2019.
93	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-6 October 2019.
94	Monograph 4: Population Management Issues (December 2019).
95	Monograph 5: Population Management Issues (December 2019).
96	Consultation on Private Sector Engagement (PSE) in attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond. Proceedings (January 2020).
97	Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh (March 2020).
98	Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041 (March 2020).
99	বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ (মার্চ ২০২০)।